C.U.L-H01915-124-P36

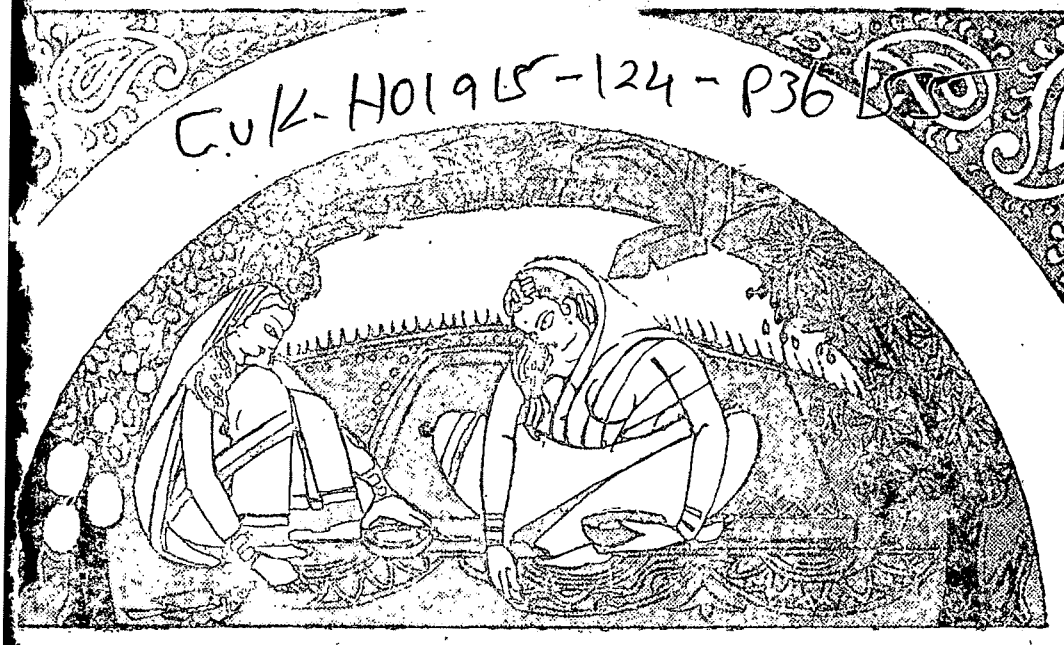

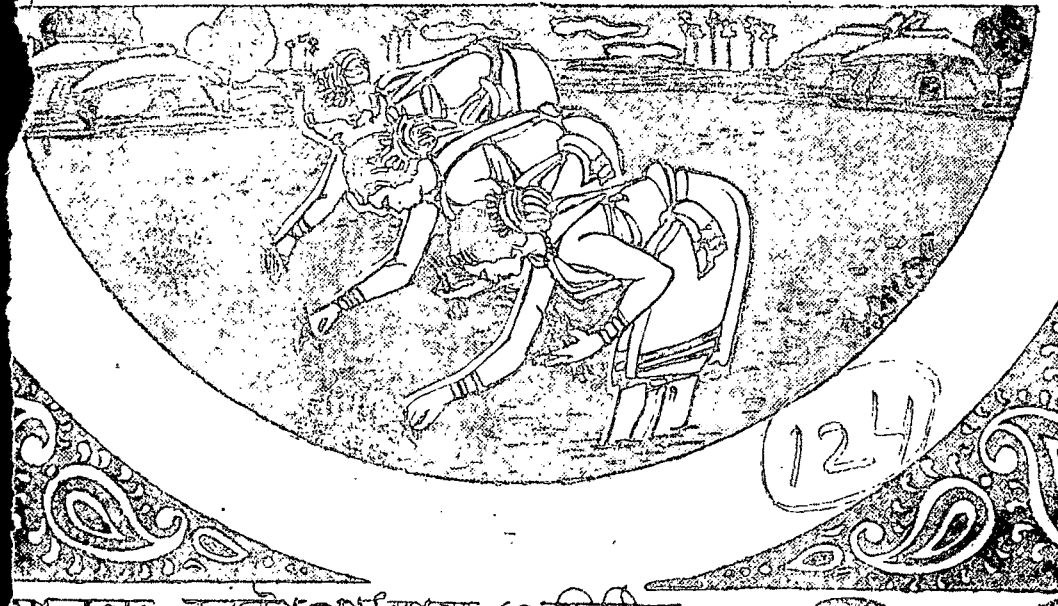

124

আনন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত—

প্রবাসী

সম্পাদকক—অশোক চট্টোপাধ্যায়

কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ-পৌষ—১৩৮৬

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

প্রবাসী—১৩৮৬

সূচীপত্র

শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন

বিবিধ প্রসঙ্গ— ১১
দেশবিদেশের নারী পুলিশ—জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য ৯৫
বর্ষারাণী—কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ৯৭
অন্ধ আর খঞ্জ - প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায় ৯৭
সাবাস বাঙ্গালী যোগেশ মজুমদার
হিজ্ মাষ্টার্'স্ ভয়েস্—অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—বিভূতিভূষণ বসু ১
চিরঅমৃত বাণী—অসীমকুমার দাস
টগর দিব্যেন্দু মিনতি ও আরো অনেকে—গৌরমোহন দাস দে ১৫
রহস্যাবৃত মঙ্গলগ্রহ—সন্তোষকুমার দে ১৫
শ্রীধাম বৃন্দাবন কথা—ক্যানইলাল দত্ত ১৫
ছায়াসর্প শান্তনু দে সরকার ১০
একটী বাস্তব ঘটনা—লীলা ভট্টাচার্য্য ১৭
কতটুকু জানি—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ৯৮
সাময়িকী— ১৮
পঞ্চশস্য— ১৯

প্রবাসী

"সত্যম শিবম সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেনলভ্য"

P 36,155

৮০তম ভাগ | কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ—১৩৮৬ | ১ম, ২য়, ৩য় সংখ্যা
দ্বিতীয় খণ্ড

বিবিধ প্রসঙ্গ

জনতা সরকার মন্ত্রীত্বে আসার পর অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, এই সরকার যদি অন্ততঃ দশ-বছর সময় থায় তবে দেশের অবস্থার প্রভূত উন্নতি করতে সমর্থ হবে। সুতরাং এই দশটি বছর তাদের যেন দেওয়া হয়। তাঁরা সহজ ভাবেই বুঝেছিলেন যে এই সময়টুকু দেওয়া না দেওয়া নির্ভর করছে বিরোধী পক্ষ এবং দেশের জন-সাধারণের ওপর। কিন্তু অবস্থা এখন এমনই যে এই সময়টুকু নিজেদের ক্ষমতায় থাকা না থাকা নির্ভর করছে সম্পূর্ণ ভাবেই জনতা সরকারের নিজেদের দলীয় একতার ওপর। মাত্র অল্প সময়ে গঠিত সরকার যদি নিজেদের সদস্যদের একতাবদ্ধভাবে বিশেষ আদর্শের অনুসারী করতে না পারে, তবে সেটা খুবই দুঃখের বিষয়।

উন্নয়নশীল ভারতে এখন উন্নতির স্রোত অবিচ্ছিন্নধারায় প্রবাহিত হওয়া প্রয়োজন একথা আজ অতি সাধারণ মানুষও স্বীকার করবে। আর তারই প্রয়োজনে নির্ব্বাচিত সদস্যদের

নিয়ে সরকার গঠন। কিন্তু সদস্যরা আজ যদি সেকথা ভুলে পদাধিকারের জন্য সময় ও ক্ষমতার অপচয় করেন, তবে সাধারণের সান্ত্বনা কোথায়? কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি প্রায় প্রতি পদেই ত' আজ কার্য্যকরি ব্যবস্থার আশু প্রয়োজন। এখানে মতবাদ বা আদর্শ নিয়ে বিরোধের পরিসর কতটুকু? যে দেশের মানুষের এক বিপুল অংশ দারিদ্র্য-পীড়িত সেখানে অন্ন-বস্ত্র সমস্যার সমাধানের পথ কি এতই বিভিন্ন যে দলের সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়ে ক্ষমতার বিরোধ উপস্থিত হবে?

আসলে গলদ নেতৃত্বের মধ্যেই। সরকারে আসার আগে বর্ত্তমান নেতারা প্রাক্তন সরকারকে সরানোর কথাটা যতটা ভেবেছিলেন, সরকারকে সরানোর পরের কথাটা ততটা ভাবেন নি বলেই মনে হয়। ফলে ইন্দিরা সরকারের পতনের পর জনতা সরকারের ক্ষমতায় আসায় নেতৃত্বের পরিবর্ত্তন হলেও আদর্শের পরিবর্ত্তন হয়নি।

দেশ বিদেশের নারী পুলিশ

জয়ন্ত ভট্টাচার্য

পুলিশ বিভাগে নারীর প্রবেশ ঘটেছে পৃথিবীর কয়েকটি বড় বড় দেশে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। নারী এবং শিশু অপরাধীদের নিয়ে কাজ করার জন্যে নারী পুলিশের প্রয়োজনীয়তা বেশ কিছু সভ্য দেশই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই অনুভব করেছে। গ্রেট ব্রিটেনে ১৯০৭ সালেই প্রথম মহিলা মিস ম্যাকডুগ্যাল পুলিশ বাহিনীতে নিযুক্ত হন। তাঁর কাজ ছিল দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা লাঞ্ছিত নারীদের কাছে জবানবন্দী আদায় করা। তাঁকে কিন্তু গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ক্ল্যারা হোমস নিযুক্ত হন উত্তর ইংলণ্ডের পুলিশ বিভাগে। তাঁকে পুরুষ পুলিশদের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল বিশেষ করে নারী ও কিশোর অপরাধীদের নিয়ে কাজ করার পদ্ধতি। সেকালে পুলিশ বিভাগে নারীর স্থান করে দেবার জন্যে নারী সমিতিগুলি আন্দোলনে মেতে উঠেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পুলিশ বাহিনীর বহু লোক যুদ্ধে চলে যায়। পুলিশের কাজে সহায়তা করার জন্যে বহুসংখ্যক মহিলা পুলিশ নিযুক্ত করতে হয়েছিল। প্যাটেল দেওয়ার জন্য তাঁরা ভালই করেছিলেন। কিন্তু গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা নারী পুলিশের হাতে তখনও দেওয়া হয় নি। আর বেতন গ্রহণ করার সময় তাঁদের পেনসানও দেওয়া হত না। পুরুষ পুলিশেরা সে যুগে নারী পুলিশদের বিরুদ্ধে লেগে পড়ে লেগে যান। তাঁদের মতে পুলিশ বাহিনীতে নারী পুলিশ নিয়োগ ঘোরতর অন্যায়। ইংলণ্ডের পুলিশ ফেডারেশন তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলল। পুলিশ বাহিনীতে নারী প্রবেশ করার ফলে পুরুষ পুলিশদের ভয়ানক ক্ষতি হবে এ ছিল ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড এবং ওয়েলসের পুলিশ ফেডারেশনের অভিমত। পুলিশ বাহিনীর কিছু কিছু কল্যাণমূলক কাজে শুধু মহিলাদের নিযুক্ত করা যেতে পারে, কিন্তু কখনও গ্রেপ্তার করার কাজ তাঁদের হাতে দেওয়া ঠিক হবে না। ১৯২২ সালের এক রিপোর্টে সরকারের মনোভাব ব্যক্ত হ'ল: পুলিশ খাতে খরচ কমাবার ওজুহাতে নারী নিয়োগ বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনীতে নিযুক্ত মহিলাদের স্বার্থে এগিয়ে এলেন আন্তর্জাতিক নারী পুলিশ সমিতির লেডী এস্টর। এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট লেফ্‌টেন্যান্ট মিনা ভ্যান্ উইংকল অ্যামেরিকা থেকে লণ্ডন ছুটে এলেন মহিলা পুলিশ বিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে। ফলে ১৯২৩ সালে গ্রেট ব্রিটেনের হোম সেক্রেটারী পুলিশ বাহিনীতে মহিলাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করলেন—তাঁদের হাতে গ্রেপ্তার করবার ক্ষমতাও ন্যস্ত করা হ'ল। ১৯২৪ সালেই লণ্ডন নগরীর পুলিশ বাহিনীতে অন্ততঃ পঞ্চাশ জন নারী পুলিশ নিযুক্ত করা হল। পুরুষ পুলিশদের মতই নারী পুলিশদের শিক্ষা ও পদমর্যাদা দেওয়া হল। মিস ডি. ও. নিউকে কমিশনারস স্টাফ পদে নিযুক্ত করা হল। তিনি নারী বাহিনীর প্রধানার দায়িত্ব পেলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে নারী পুলিশের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত হল। বৃটেন অধিকৃত জার্মান এলাকায় এবং অন্য সকল ইংরেজ শাসিত অঞ্চলেও ইংরেজ নারী পুলিশের দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করা হল।

১৯৭১ সালের মধ্যে ব্রিটেনের ১,০১,০০০ পুলিশের

মধ্যে ৪,৪০০ জন নারী পুলিশ নিযুক্ত হলেন, উচ্চ এবং দায়িত্বপূর্ণ পদে তাঁদের উন্নীত করা হল। ১৯৭৪ সালে নারী ও পুরুষ পুলিশের বেতনের মধ্যে যে তারতম্য ছিল তা দূর করা হল। আইন পাশ করা হল যাতে নারী পুলিশেরাও পুরুষ পুলিশদের সমান বেতন ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন।

পশ্চিম জারমানি :—

ষ্ট্রাট গার্ট জারমানিতে ১৯০৩ সালেই নারী পুলিশ নিযুক্ত করা হয়। পৃথিবীর আর কোথাও এর আগে নারীদের পুলিশ পদে নিযুক্ত করা হয় নি। সেই থেকে জারমানির পুলিশ পদে নারীদের স্থান পাকাপাকি ভাবে স্থির হয়ে গেল। হিটলারের শাসনকালে অবশ্য এই নিয়ম ভেঙে দিয়ে নারীদের রান্নাঘরে বা সূতিকাগারে ফিরে যেতে বলা হল। কিন্তু হিটলার যুগের অবসানে নারীরা আবার ফিরে পেলেন তাঁদের পূর্বলব্ধ অধিকার। পুরুষ পুলিশের মতই জারমানিতে নারী পুলিশদের মর্যাদা, পদোন্নতি এবং বেতন প্রভৃতি চালু হল।

পোলাণ্ড—

পুলিশ বাহিনীর ইতিহাসে নারীদের উপযোগিতা ও অবদান বিশেষ ভাবে স্বীকৃত। ১৯২৫ সালে মহাযুদ্ধের পরই সেখানে নারী পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। নারীদের ও কিশোর কিশোরীদের সৎপথে রাখার কাজে পোলিশ নারী পুলিশদের অবদানের তুলনা নেই।

ফ্রান্স—

ফরাসীরা পুলিশবাহিনীতে নারীদের প্রবেশ কখনও ভালো চোখে দেখেন নি। ফলতঃ ১৯৬৯ সালে সারা ফরাসী দেশে মাত্র ৫৯ জন নারী পুলিশ ছিলেন। কিন্তু কখনও তাঁদের পুলিশের কাজ দেওয়া হয় নি। তাঁদের কাজ ছিল সমাজ সেবা করা। একজন মহিলা শুধু এ-নিয়ম ভঙ্গ করে প্রকৃত পুলিশের কাজে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু পুলিশ কিংবা দুষ্কৃতকারী কেউই তাঁকে গুরুত্ব দেয় নি। কিন্তু তিনি যখন গুরুত্বপূর্ণ গ্রেপ্তারের কাজ করলেন অপ্রত্যাশিতভাবে তখন সবাই বিস্মিত হলেন। তাঁর নাম হচ্ছে মহিলা পুলিশ ডানিয়েল থিরেবী।

জাপান—

জাপানে নারী পুলিশ বাহিনীর স্থান খুব গুরুত্বপূ ১৯৪৬ সালে টকিওর পুলিশ বিভাগে প্রথম ৬৩ জন মহি নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সুস্থ সবল এবং দক্ষ মানুষের যে অভাব দেখা দিল তাতেই পুলিশ বিভাগে নারী নিয়োগের উৎসাহ যোগাল জাপান সরকারের। সারা জাপানেই পুলিশ বিভাগে মহিলাদের স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেল। ফলে ১৯৫৩ সালের মধ্যেই ১,২০০ নারী পুলিশ নিযুক্ত হলেন সেখানে। মহিলা পুলিশদের বেতন, পদ মর্যাদা, ও ক্ষমতা সকল বিষয়েই পুরুষ পুলিশদের সমা বলে স্বীকৃতি পেল। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারেও মহি পুলিশেরা সমান ক্ষমতার অধিকারিনী। পুরুষ পুলি মতই তাঁরা পেট্রল করছেন, অপরাধ-দমন, অনুস অপ্রাপ্তবয়স্কদের সমস্যা নিয়ে কাজ করছেন। তা সমগ্র জাপানে কিণ্ডার গার্টেন স্কুলে ছেলে-মেয়েদের পদে পথ চলতে শিক্ষা দিয়ে বিশেষ সাফল্য অর্জন মহিলা পুলিশেরা। বর্তমানে (অর্থাৎ ১৯৭৫ সালে) জাপানে ১৫০০ মহিলা পুলিশ দক্ষতার সঙ্গে কাজ যাচ্ছেন।

গায়েনা—

১৯৭০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রী গায়নায় ৭৬০ হাজার লোকের বাস। সেখানে প্রজাতন্ত্র প্রতি আগে থেকেই বস্তুতঃ ১৯৫৩ সালেই পুলিশ বাহিনী ১২ জন মহিলা নিযুক্ত হয়েছিলেন। বর্তমানে পুলিশ বাহিনীর ৭.৫% পদ মহিলাদের দখলে রয়েছে। পুরু পুলিশদের মত মহিলা পুলিশেরা সেখানে ক্ষমতা, সুযোগ সুবিধা ও পদমর্যাদার অধিকারিনী।

সুইডেন—

সুইডেনে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই মহি পুলিশের কাজে সহায়তা করতে সুযোগ দেওয়া হয়েছে কিন্তু ১৯৫৭ সালের আগে পুলিশ বাহিনীতে মহিলাদিগকে

যথারীতি নিযুক্ত করা হয় নি। ১৯৭০-৭১ সালে মহিলারা পুলিশ বিভাগে পুরুষ পুলিশদের সমান মর্যাদা পেতে সুরু করেন। বর্তমানে (১৯৭৫) সুইডেনের ১৫,০০০ পুলিশ অফিসারের মধ্যে ৩০০ মহিলা অফিসার আছেন। তাঁদের বেতন মর্যাদা ও ক্ষমতা পুরুষ পুলিশদেরই সমান।

নরওয়ে—

নরওয়েতে পুলিশ বিভাগে নারীর স্থান খুবই সীমিত। বর্তমানে সেখানে ৫,৫০০ পুলিশ বাহিনীতে ১০০ জন মহিলা পুলিশ আছেন। তাঁরা পুরুষ পুলিশদের মতই ক্ষমতাসম্পন্ন এবং দায়িত্বশীল পদে নিয়োগের যোগ্য। কিন্তু যেখানে বলপ্রয়োগের প্রয়োজন সেখানে তাঁদের নিযুক্ত করা হচ্ছে না।

নিউজিল্যাণ্ড—

১৯৪২ সাল থেকে নিউজিল্যাণ্ডের পুলিশ বাহিনীতে মহিলাগণ যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে আসছেন। সেখানে পুলিশের কাজের নিয়োগের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের মাপ-কাঠি দিয়ে নারী ও পুরুষ প্রার্থীদের বিচার করা হয়ে থাকে। পুরুষ প্রার্থীদের উচ্চতা যেখানে কমসেকম পাঁচ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি দরকার সেখানে মহিলাদের ক্ষেত্রে পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি হলেই চলবে। পুরুষদের বয়ঃসীমা ১৯ থেকে ৩৫। নারীদের ২০ থেকে ৩৩। অন্য সকল বিষয়ে নারী ও পুরুষের যোগ্যতা একই রকম ভাবে নির্ণয় করা হয়ে থাকে। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত এখান-কার নারী পুলিশ বাহিনী আলাদা ভাবে কাজ করছিল। সেই বাহিনী শুধু নারী ও শিশু নিয়ে কাজ করত। ১৯৭৩ সালের এক সমীক্ষার ফলে স্থির হল নারীদেরও পুরুষদের মতই বেতন, ক্ষমতা ও মর্যাদা দিতে হবে। এতে একটা পার্থক্য এখনও রয়েছে। রাত্রি ১১টা থেকে পরদিন সকাল ৭টা পর্যন্ত কোন মহিলা পুলিশকে কাজ করতে হয় না।

বর্তমানে নিউজিল্যাণ্ডের ২.৪% পুলিশই মহিলা। তাঁরা পুরুষদের মতই বেতন, মর্যাদা, পদোন্নতি, ক্ষমতা এবং সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন।

ইজরায়েল—

ইজরায়েলের পুলিশ বাহিনীতে মহিলারা ১৯৬০-সালেই স্থান করে নিয়েছেন। পুলিশদের সকল কাজেই সেখানে মহিলাদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে রাজপথে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইজরায়েলী মহিলাদের দান প্রশংসার দাবী রাখে। বস্তুতঃ ট্রাফিক পুলিশের ৯০% পদ এখন মহিলাদের দ্বারা অধিকৃত। তা ছাড়া রাজপথে টহল দেওয়া বা সীমান্ত রক্ষাতেও মহিলা পুলিশদের কৃতিত্ব কিছু কম নয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র—

অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ-বাহিনীতে মহিলাদের সাহায্য নানা কাজে বিশেষ করে গোয়েন্দা বিভাগে বহুদিন থেকেই নেওয়া হচ্ছে। তবে সর্বপ্রথম ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে অ্যামেরিকান ফিমেল সোসাইটির চেষ্টায় নিউইয়র্ক সহরের জেলখানায় ম্যাট্রন নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৭০ থেকে ১৮৮৮ সালের মধ্যে মহিলা সমিতির আন্দোলনের ফলে প্রতিটি সহরের (যেখানে ২০,০০০ এর বেশী লোক বাস করেন) জেলখানার নারী বন্দিনীদের নিয়ে কাজ করার জন্য ম্যাট্রন নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। ১৯১০ সালে লস এনজেলেসে একজন নারী পুলিশ যথাযথ ভাবে নিযুক্ত হলেন। তিনি হলেন মিসেস এলিস ষ্টেবিনস ওয়েলস। ১৯৩০ সালের ডলারের মূল্যমান কমে যাওয়ার ফলে পুলিশে নারী নিয়োগ একেবারে থেমে গেল। ১৯৪৩ সালে কনেকটিকাটে একজন মহিলা পুলিশ নিযুক্ত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে অনেক সহরের পুলিশ বিভাগে মহিলা নিয়োগ করা হয়েছিল।

বর্তমান কালে অর্থাৎ ১৯৭০-৭৫ সালে সমগ্র যুক্ত-রাষ্ট্রে মহিলা পুলিশের উপযোগিতা স্বীকৃত হয়েছে। এখন ফেডরেল ব্যুরো অব ইনভেষ্টিগেশানের ৮,৫০০ জন কর্মীর মধ্যে ৩০ জন মহিলা।

এরপরে অন্যান্য রাজ্যেও মহিলা পুলিশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। এমনকি পিনকারটনের ৩,৬০০ জন রক্ষকের মধ্যে ৪০০ মহিলা কর্মী রয়েছেন। ১৯৬৮ সালে ইণ্ডিয়ানা পলিশ নগরেই সর্বপ্রথম দুইজন

মহিলা পুলিশকে রাস্তায় টহল দেওয়ার কাজে নিযুক্ত করা হয়। বর্তমানে সহরে সহরে নিযুক্ত নারী পুলিশের সংখ্যা নিম্নরূপ—

সহর	মোট পুলিশের সংখ্যা	নারী পুলিশের সংখ্যা
ইণ্ডিয়ানা পোলিশ	১,১৪৯	৭৪
পিওরিয়া	২০৯	১১
মিয়ামি	৭৫৫	২৯
নিউইয়র্ক	৩১,০০০	৭৩৫
ওয়াশিংটন	৫,১০০	৩০০
সেণ্ট লুই	৫৫০	২২

পুলিশ বিভাগে কাজের দায়িত্ব বিপদ প্রভৃতি সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের এক মহিলা পুলিশ বলেছেন—

পুলিশের কাজে আমার জীবন পুরুষ পুলিশদের মতই বিপদের মধ্যেই কাটছে। আমাকে অবশ্যই পুরুষ পুলিশের মত বারংবার রাস্তায় ছুটে যেতে হচ্ছে না, কিন্তু তথাপি আমি যখন মাঝে মধ্যে কোর্টে যাই তখনই কোন বদমাস অপরাধী যাকে আগে আমি গ্রেপ্তার করে এনেছিলুম, আমার ক্ষতি করার জন্যে আমার পিছু নিতে পারে। ইতিমধ্যেই আমি টেলিফোনে অনেক শাসানি শুনেছি।

আমাকে দুষ্কৃতকারীরা যে কোন মুহূর্তে গুলি করতে পারে। আমি রেডিও কারে করে প্রায়ই ঘুরি আমি ষ্টেশানের বাইরেও চলে যাই। একবার আমার সঙ্গে এক মার্কিয়া সদস্যের ষ্টেশানেই দেখা হয়েছিল। সে আমার গাড়ীটা চেনে আমাকে চেনে। বুঝতেই পারছেন সে আমাকে ভালভাবেই চেনে। এখন আমার বেঁচে থাকাটাই একটা কঠিন সমস্যা। ওরা যদি ভেবে থাকে এই নারী পুলিশই তাদের লাঞ্ছনার জন্যে দায়ী, আমার পিছু নেবে ওরা। ষ্টেশানে বসে থাকলেও যে আমি নিরাপদে আছি তা মনে করবার কোনও কারণ নেই। যে কোন মুহূর্তে ষ্টেশানে বোম পড়তে পারে, ষ্টেশান আক্রান্ত হতে পারে। যে কোনও ডিটেকটিভ পুলিশ মার্ডার কেস্ নিয়ে যাকে দিবারাত্র বাইরে ঘুরতে হচ্ছে আমার মত নারী পুরুষের প্রতি হিংসা অনুভব করতে পারেন। আমার মত কত পুরুষ পুলিশও তো রয়েছেন ষ্টেশানে, তাঁদের প্রতি তো তেমন হিংসা বা ঈর্ষা কারও দেখা যায় না। নারী পুলিশদের প্রতি পুরুষ পুলিশদের এ-ধরণের ঈর্ষা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। পুরুষ-পুলিশদের সমান বেতনই দেওয়া উচিত মহিলা পুলিশদেরও।

অদ্যও আমেরিকান নারী পুলিশেরা পুরুষ পুলিশদের সমান বেতন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নারী পুলিশদের অনেক ক্ষেত্রেই কেরানী, টাইপিষ্ট রূপে খাটানো হয়—তাই পুরুষ পুলিশদের সমান বেতনাদি নারী পুলিশদের দেওয়া হচ্ছে না। যে ক্ষেত্রে নারী পুলিশেরা পুরুষ পুলিশদের সমান কাজ করে সেখানেও সমান বেতন পায় না। এই রকম পক্ষপাত মূলক আচরণের বিপক্ষে সকল নারী পুলিশই মনে মনে ক্ষুব্ধ।

পুলিশেই হোক কিংবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেই হোক কোন কোন নিয়োগকর্তার মনে নারী নিয়োগ সম্পর্কে বেশ বিরূপভাব দেখা গিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও। তাঁদের মত হচ্ছে: মেয়েরা বেশী কামাই করে। এ-ধারণা যে সম্পূর্ণ অমূলক তা ১৯৬৯ সালে পাবলিক হেলথ সারভিস বিভাগের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে গড়ে প্রতিটি পুরুষ কর্মী বছরে ৫.৯ দিন কামাই করে। সেই স্থলে মহিলা কর্মী ৫.৬ দিন মাত্র নষ্ট করে। মহিলাদের ক্ষেত্রে সন্তান ধারণ ও প্রসব প্রভৃতির জন্য যে সময় নষ্ট হয় সে সকল যোগ করেই এই হিসাব করা হয়েছে। যদিও দেখা গেছে মেয়েরা বেশী অসুস্থতার জন্যে ছুটি নিয়ে থাকেন কিন্তু পুরুষ কর্মীরা একবার অসুস্থতার জন্যে ছুটি নিলে সে ছুটি কেবল বাড়িয়ে যেতে চান।

শিল্প ক্ষেত্রে দেখা গেছে পুরুষেরা যতটা ভাল চাকুরীর জন্য কাজ ছেড়ে চলে যান, মহিলারা পারিবারিক কারণে প্রায় ততটাই চাকুরী ছাড়েন।

১৯৬৪ সালের সিভিল রাইটস এ্যাকট, ১৯৭২ সালের এ্যামেণ্ডমেণ্ট কাজে নারী পুরুষের বৈষম্য বহুলাংশে দূর করেছে। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে কোনও বিশেষ জাত অর্থাৎ নারী বা পুরুষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা চলে।

যেমন—(১) কোনও কাজ বিশেষ দক্ষতা ও গুণের

জন্য যথা অভিনেত্রী, অভিনেতা বা মডেল প্রভৃতির ক্ষেত্রে।

(২) নৈতিক গুণ বিচারে, যেমন বিশ্রামাগারের পরিচারক অথবা আণ্ডারক্লোদিং বিক্রেয়র ক্ষেত্রে।

(৩) আনন্দ পরিবেশনের ক্ষেত্রে যেখানে মনসিজ-আবেদন বিশেষ বিবেচ্য।

নিম্নকথিত ক্ষেত্রে কোনও ওজুহাতে নারী পুরুষে ভেদাভেদ মানা চলবে না।

(১) কোনও জাতি অর্থাৎ নারী বা পুরুষ এ কাজে অসমর্থ বা ইচ্ছুক নয়।

(২) খরিদদার বা সহকর্মীরা এ জাতি অর্থাৎ নারী বা পুরুষকে পছন্দ করছেন না।

(৩) সামাজিক প্রথা অনুসারে একাজ শুধু পুরুষ বা নারীরাই করে আসছে।

(৪) এ-কাজে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়, প্রচুর দক্ষতা প্রয়োজন, অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করতে হয়।

(৫) বিপরীত জাতি অর্থাৎ নারী বা পুরুষের সঙ্গে ভ্রমন করে ঘুরতে হয়।

(৬) অপর জাতির অর্থাৎ নারী কিংবা পুরুষের কাজের যোগ্য সুযোগ-সুবিধা নেই।

(৭) এ-কাজে বিশেষ ব্যক্তিগত চতুরতা, আকর্ষণ বা আক্রমণাত্মক ব্যক্তিত্ব প্রয়োজন।

তথাপি মহিলা পুলিশদের চাকুরীর অবস্থা এখনও আমেরিকায় সম্পূর্ণরূপে সাম্যের ভিত্তিতে স্থাপিত হয় নি। সম্প্রতিকালে এক মহিলা পুলিশ কর্তব্যরত অবস্থায় নিহত হয়েছিল কালিফর্ণিয়ার পথে, তাঁর স্বামী বা পরিবারের লোকজন কোন ক্ষতিপূরণ পান নি। অথচ কোনও পুরুষ পুলিশ এরূপ অবস্থায় মারা গেলে তাঁর স্ত্রী বা পরিবারের লোকজনদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে। এরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার যে প্রতিবিধান প্রয়োজন তা সকলেই স্বীকার করছেন।

আইন বিষয়ক একটি পত্রিকায় সম্প্রতি পার্লণ্টন লিখেছেন—মহিলা পুলিশেরা সাধারণতঃ পুরুষ পুলিশদের চেয়ে অনেক বেশী শিক্ষিত। এদের মধ্যে অনেকেরই সমাজ কল্যাণ বিভাগে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাঁদের পক্ষেই অপরাধ নিবারণ, জনগনকে উপদেশ দেওয়া ও সাহায্য করার কাজ ভালভাবে, আন্তরিকতার সঙ্গে করা সম্ভব। পুরুষ পুলিশেরা অপরাধ নিবারণ করে শান্তি-রক্ষার কাজ করার পক্ষে যথেষ্ট যোগ্যতা দেখাতে পারছেন না। পুরুষ পুলিশেরা সচরাচর অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার দিকেই মন দিয়ে থাকেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার দিকে মন দেওয়ার তাদের সময় নেই। তাই পৃথিবীর সব দেশেই পুলিশ বাহিনীতে যোগ্য মহিলাদের স্থান করে দেওয়া প্রয়োজন।

পৃথিবীর সব দেশে নারীদের পুলিশ বিভাগে স্থান হয় নি এখনও। অবশ্য আজকাল ডেনমার্ক, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে অল্প সংখ্যক নারী পুলিশ বিভাগে নিযুক্ত করা হচ্ছে। বর্তমানে ভারতবর্ষেও নারীদের পুলিশ বিভগে নিযুক্ত করা হচ্ছে। তাঁদের সংখ্যা কত তা জানা সহজ নয়। কারণ অনেকেরই হয়ত জানা আছে।

বর্ষারাণী

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

আজকে মেঘে জল ধরেনা
ঝরছে ধারা যন্ত্রে তাই—
উধাও ধাওয়া দমকা হাওয়া
হুর্মাক হানে সর্বদাই।
(মন মানে না ঘরের কোণে
কোথাও যাই,—কোথায় যাই)?
মেঘের মেঘে ঘাঁতার মত
ঘর্ঘারিয়ে পিষছে কে?
জলের ধারা লক্ষ্যহারা
এমন ধারা ছুঁড়ছে কে?
(কাহার পরে কিসের তরে
তীরের মত তূণ থেকে?)
মুহুর্মুহু ছুটছে মেঘের
পাল তুলে নৌ সেনানী
ঝঞ্ঝাবাতে বাদলা রাতের
দর্পে কাঁপে পরানী।
তড়িৎ খেলে চক্‌মকিয়ে
চক্‌মকি বা ঠুকছে কে?
তোপের মুখে আগুন দিয়ে
ডঙ্কা বাজায় দূর থেকে।
শিরীষ শিশু দেবদারু শাল
পলাশ নাচে ঘাড় নেড়ে
সায় দিয়ে যায় তরুণ তমাল
রসাল হাসে তায় হেরে।
মুচকি হেসে মাধবী চায়
মল্লিকারে নিরিখিয়ে—
চাঁপার কলি ফুটবে বলি
তাকিয়ে আছে দিগ্বিদিক্।
কদম্বেরি ঝুমকো কানে
নীলাম্বরী লুটছে পায়
কাজল কালো মেঘের পানে
যুক্তকরে মুক্তি চায়।

কে ঐ বালা যূথীর মালা
বকের সারি কণ্ঠে যার—
মুক্তাধারা আঁখির কোণে
নির্ঝরিণী মুক্তধার।
ঝর্ ঝরানির অফুট বাণীর
ঐকতানে সুর দিয়ে—
তরল তালে কল্লোলিনীর
কলধ্বনি মুরছিয়ে—
নৃত্য করে দিগ্‌বালারা
কেতন তুলে কলাপীর
খোঁপায় গুঁজে কৃষ্ণচূড়া
গলায় মালা মালতীর।
মল্লারে ও মেঘের মালা
মন্ত্র পড়ে আনলে কে?
নিপুণ করে নৌকা চালা
তুফান আসে ঐ ডেকে।
আসছে কে সে মহাব্রত
স্তোত্র শত উচ্চারি
তাপস ভগীরথের মত
অসংকুচে উদ্ধারি।
আলোছায়ার চিত্ররেণু
চয়ন করে মায়াবী
বয়ন করে ইন্দ্রধনু
ঊর্ণা দিয়ে ঊর্ণাভি।
আকাশ-পটে ছায়ার তুলী
মায়ার তুলী বুলায় কে?
স্বাতীর জলে সাগর তলে
মুক্তামণি ফলায় কে?
আজকে তারে দেখবো বলে
ওৎ পেতেছি কান্তারে
মেঘবরণী বর্ষারাণী
মেঘের প্রিয় কান্তারে।।

অন্ধ আর খঞ্জ

প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়

অন্ধ আর খঞ্জ পথ দিয়ে যাচ্ছে। খঞ্জ চলেছে অন্ধের কাঁধে ভর দিয়ে। অন্ধকে পথের কথা জানিয়ে দিচ্ছে, খানা, খন্দ, উঁচু, নিচু, টিপির সম্বন্ধে সাবধান করে দিচ্ছে। আর অন্ধ খঞ্জের প্রায় সমুদয় ভার তার নিজের কাঁধের ওপর রেখে বলিষ্ঠ পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। দৃশ্যটা বড় করুণ।

দেখতে দেখতে হঠাৎ যেন চোখের ওপর থেকে একটা পর্দা সরে গেল। অফিসের কথাটা মনে পড়ল। ঘোষ সাহেব, হরিশবাবু আর জনসন সাহেব না থাকলে কোম্পানী কবে লাটে উঠত। এঁদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর বিচক্ষণতার প্রশংসা যে করে না বুঝতে হবে সে আমাদের অফিসের লোকই নয়। অথচ সেবার স্ট্রাইকের সময় এঁরা তিনজনই বিমূঢ় হয়ে বসে গিয়েছিলেন, প্রডাক্‌সন একেবারে নীলের কোঠায়।

আসলে এঁরা তিনজন হচ্ছেন খোঁড়া, এঁরা বুদ্ধি-বিচক্ষণতা যোগাতে পারেন, কিন্তু কোম্পানীকে চালু রাখতে হলে কর্মক্ষম লোকের দরকার। আবার এঁদের তিন-জনের মধ্যে যখন ঘোষ সাহেব, জনসন সাহেবের সঙ্গে বিলেতে পাড়ি জমিয়েছিলেন, হরিশবাবুর ওপর কোম্পানীর সব ভার দিয়ে, আর হরিশবাবুও বিধির বিধানে হঠাৎ পড়লেন অসুখে, তখন বাকি ছোট-বড় সাহেবদের মধ্যে সে কি মতবিরোধ, কোম্পানীর বদনামের একশেষ। শেষে এঁনারা একে একে ফিরে এসে হাল ধরতে তবে কর্মীরা নিশ্চিন্ত হ'ল। দোষ কাউকেই দেওয়া যায় না। এঁদের তিনজনের পরিচালন ক্ষমতা অদ্ভুত। কোম্পানীর মালিক ঘোষ সাহেবের মত পরিচালন ক্ষমতা বিরল, আর সাথী যে দুজন পেয়েছেন, তাতে সোনায় সোহাগা। কিন্তু হলে কি হবে? সেই স্ট্রাইকের সময় কয়েকজনের বাড়ী বাড়ী গিয়ে এঁদের ফয়সালা করতে হ'ল। লোক ত চাই, কারখানা চলবে কাদের দিয়ে?

লোকেরা সব কানার দলে! বোঝার কিছু দরকার নেই, পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে যে যেমন প্ল্যান-মাফিক কাজ করে যাও, তা' হলেই কোম্পানী চলবে।

দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ। দেখি কয়েকটি ছেলে —'সরস্বতী পুজো'র চাঁদা।

এদেরও এই ব্যাপার। অনুষ্ঠানে, টুর্ণামেণ্টে, সবেতেই আছে, একদল কানা, আর একদল খোঁড়া। একদল মাথা ঘামায়, বুদ্ধি জোগায়, কিন্তু এগোতে পারে না। আর এক-দল ব্যাপারটা বুঝে নিয়েই চটপট এগিয়ে যায়, হাতে কলমে কাজে পটু। কিন্তু তারপর কি করা যাবে, সেটা প্রথম দল বুঝবে। এই আর কি? দু'টো একসঙ্গে পাওয়া শক্ত।

চিন্তা আর কাজ, প্রজ্ঞা আর তার বাস্তব অনুশীলন পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। একটার অভাবে আর একটা অকেজো। হাজার হাজার পরিকল্পনা করা হয়ত সোজা, কিন্তু তাকে রূপায়িত করা সে আর এক ব্যাপার। আবার গায়ে-পতরে খাটার লোক আছে, এরা এলোমেলো ভাবে কাজ করছে কিন্তু পরিপূর্ণতা পাচ্ছে না একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাবে। একজন শুধু চলবে, আর একজন তাকে পথ দেখাবে। এই নীতিতেই ব্যাপার বৃহৎ চলছে।

রাষ্ট্রীয় শাসনে দেখা যায় পরিকল্পনা সুন্দর, কিন্তু সেই অনুসারে কাজ ঠিকমত না হ'লে বিশৃঙ্খলা। আবার পরিকল্পনার অভাবে লোকবল আর সম্পদের অপচয়। কাকে ছেড়ে কাকে রাখা? উপায় নেই, দুয়েরই সমন্বয় চাই। প্রবীণ, বিজ্ঞ, দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন মানুষ চাই, আর চাই সংঘবদ্ধ, শৃঙ্খলাপরায়ণ সমাজ। তবেই শান্তি,

প্রগতি।

কানা বলিষ্ঠ পায়ে চলতে পারে, কিন্তু দেখতে পায় না কিছুই, খোঁড়া আবার কানার সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না, কিন্তু দেখতে পায় অনেক দূর পর্য্যন্ত। খোঁড়ার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটলেই কানা-খোঁড়া দু জনেরই বিপদ। আবার একই বিপদ কানার পা ফসকালে।

নেতার গলা ফাটান বক্তৃতার সঙ্গে চাই এই দূরদর্শিতা, নইলে আন্দোলনকারীদের সমূহ বিপদ। কারণ ওরা কানা, অত শত বোঝে না। নেতৃত্বের দূরদর্শিতার অভাবে কত অনাসৃষ্টিই না ঘটে গেছে। আবার উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে কত আন্দোলন, কত পরিবর্তন প্রকাশের অপেক্ষায় নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেছে। আবার উপযুক্ত নেতার আবির্ভাবে শক্তির প্রকাশ দেখিয়েছে।

পরিবারের মধ্যে কর্ত্তা আর গৃহিনী। এঁদের একজন কানা আর একজন খোঁড়া। তবে কে কোনটা ঠিক নেই। কোন পরিবারে কর্ত্তা খোঁড়া, গিন্নি কানা, আবার কোন পরিবারে বিপরীত। কর্ত্তা খোঁড়া হলে, পরিবার পুরুষ-প্রধান, গিন্নি খোঁড়া হ'লে পরিবার নারী-প্রধান। সেখানে কর্ত্তার প্রভাব কম। কোন ধরণের পরিবারের সংখ্যা বেশী বলা শক্ত, সেটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। ভেতরে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসতে হয়। কারণ এ সব ব্যাপার সব সময়ে স্থূলভাবে প্রকাশ পায় না। কানা নিজের কানাত্বকে কায়দা করে ঢাকতে চায়, আর বুদ্ধিমান খোঁড়া নিজেকে আধকানা করে প্রকাশ করে পাছে কলহের সৃষ্টি হয়।

বিজ্ঞান কানা—অবিরাম তার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—আনবিক অস্ত্র, দুরারোগ্য ব্যাধির মহৌষধ, টি, ভি, ফ্রিজ আরও কত কি। কোনটা ধ্বংসের, কোনটা প্রয়োজনের, আবার কোনটা আরামের। ওতে ওর বিরাম নেই। ধর্ম্ম-নীতি, বিবেক-বুদ্ধি কানা নয়, কিন্তু খোঁড়া। এ বিজ্ঞানকে সাবধান করছে, এটা ভাল, ওটা খারাপ, এটা কর, ওটা করো না। কিন্তু করার মালিক বিজ্ঞান, বিবেকজ্ঞান নয়। বিজ্ঞানের ভাল-মন্দের বিবেচনা করার সময় সুযোগ কম, আপন গতিতে সে সচল। বিবেক জ্ঞানকে তার সাহায্য নিয়ে চলতে হয় তারই সঙ্গে সঙ্গে, উপায় নেই। আবার বিবেকজ্ঞানকে মেনে না চললে বিজ্ঞানেরও বিপদ, তবে হয়ত যেত সব ধ্বংস হয়ে।

ব্যক্তি মানুষের ভেতরও এই দুটির সমন্বয় দু'টি প্রবৃত্তির সহাবস্থান। একটি অন্ধের মত কর্ম্ম-প্রবণতার ভেতর ছুটে যেতে চায়, আর একটি ভাল-মন্দের বিচার-বিবেচনা নিয়ে খঞ্জের মত অসহায়। দু'য়ের সমন্বয় হলেই জাগে তার সংগ্রাম প্রচেষ্টা। এই দুই প্রবৃত্তির তারতম্যে প্রকাশ পায় তার ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব। কোন চরিত্রে পাই লক্ষ্যহীন কর্ম্মক্ষমতার প্রাচুর্য্য, কোন চরিত্রে পাই নিশ্চেষ্ট কর্ম্মহীন কল্পনা বিলাস। যে চরিত্রে এই দুয়ের পরিমাণ-মত সমন্বয় সেই চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ দেখি।

প্রজ্ঞা পথ চেয়ে বসে থাকে খঞ্জের মত, কর্ম্ম-চঞ্চল মানুষের সাহায্যের অপেক্ষায়, আর কর্ম্মচঞ্চল মানুষ দিশেহারা হয়ে আপন অজ্ঞাতে অন্ধের মত খুঁজে বেড়ায় এক নেতৃত্ব।

গাঁয়ের লোকসংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না, আর তারা খাটতেও পারত বেশ। কিন্তু বেচারীদের সংস্থান বিশেষ কিছু ছিল না। সামান্য চাষ-আবাদ, আর দূর সহরে অল্প-স্বল্প মজুরি খাটা। এই নিয়েই চলছিল ওরা। তারপর সে গাঁয়ে এল এক ব্যবসায়ী কিসের যেন কল বসাল, আর দেখতে দেখতে গাঁয়ের চেহারা পাল্টে গেল। লোকগুলোর কাজ হ'ল, অবস্থা ফিরল, লোকবসতি বাড়ল, দোকান বাজার আরও কত কি।

কত বৈজ্ঞানিক নীতি বাস্তবে পরীক্ষিত হবার জন্যে যুগ যুগ অপেক্ষা করেছে, আর পরবর্ত্তী যুগে পরীক্ষায় ভুল বা নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আইনষ্টাইনের বহু সূত্র হয়ত 'নভচারী' যুগের অপেক্ষায় বসে আছে বাস্তবে পরীক্ষিত হবার জন্যে।

এখানে খোঁড়া কানার অপেক্ষায় বসে থাকছে পথ চলার আশায়।

আবার পুরোন যুগে যখন মানুষ কুসংস্কারের বসে চলত, ভূত প্রেত তাড়িয়ে রোগ ভাল করত তখন তাকে থাকতে হয়েছিল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অপেক্ষায়।

এখানে আবার কানা, খোঁড়ার আশায় বসে দিন গুনছে।

আসলে সৃষ্টির আদি কোনটা? চিন্তা না কর্ম্ম? অবশ্য সৃষ্টি বলতে এখানে পৃথিবী বা জগৎ-সৃষ্টির কথা ধরা হচ্ছে না। সৃষ্টি বলতে এখানে মনুষ্য-সৃষ্ট বিষয়ের কথাই ধরা হচ্ছে। তারই আদি অর্থাৎ কোন কিছু একটা ওঠার মূলে থাকে কোনটা? অবশ্যই চিন্তা। চিন্তাই নিয়ে আসে পরিকল্পনা, সেই পরিকল্পনাই তৈরী করে কর্ম্মের প্রয়োজনীয় বিষয়, আর সেই প্রয়োজনের সমাধান ক'রে সৃষ্টির পথে এগিয়ে যায়। চিন্তা মানসোদ্ভূত, আর তার প্রকাশ বাস্তব পার্থিব বস্তুতে, শ্রমে। বিরাট এক সৃষ্টির পেছনে রয়েছে এক বিরাট চিন্তা, আর তার বিপুল বাস্তবায়িত প্রকাশ কর্ম্মের মাধ্যমে।

বিরাট চিন্তা আর তার বিপুল প্রকাশ আবার ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত। বিরাট চিন্তা খণ্ড খণ্ড হয়ে বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ছে, আর তারই সাহায্যে বিরাট সৃষ্টি খণ্ড খণ্ড ভাবে আংশিক রূপ লাভ করছে। এই আংশিক রূপগুলির সমন্বয়েই বিরাট তার পূর্ণতা লাভ করছে।

আজকের পৃথিবীর দিকে তাকালে মনে হয় যেন কানাদের কলরোলটাই বেশী। পথের সন্ধান কেউই সার্ব্বজনীন ভাবে দিতে পারছে না। বিশ্বযুদ্ধের হুমকি, হরি সংকীর্ত্তন, সাম্যবাদের প্রচার, সব কিছুই চলেছে। এর মধ্যে কোনটা যে শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াবে বলা শক্ত। কিন্তু কোনটাই নয়। যে আসবে, সে আগে আপন চোখে দেখবে পথ, আর জগৎকে সেই পথেই চালাবে।

সাবাস বাঙ্গালী

(গল্প)

যোগেশ মজুমদার

একান্ত বশংবদ মুসলিম লীগকে খুসী করতে বিদায়ী ইংরাজ সরকার ভারতকে করে যান দ্বিখণ্ডিত। তাই তো ১৯৪৭ সনের রক্তধারা খণ্ডিত স্বাধীনতা ভারতবাসীর পক্ষে স্বস্তি না হয়েছে সুখের, তার বাড়া হয়েছে শোকের। দ্বিধাবিভক্ত পাঞ্জাব ও বাংলার পক্ষে এই স্বাধীনতা হল মূর্তিমান অভিশাপ। পাঞ্জাবে লোকাপসারণ মেনে নিয়েছিলেন। ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী হিন্দুরা কিন্তু দেশ ছেড়ে যেতে রাজী নয়। তাদের সাত পুরুষের অধ্যুষিত বাস্তুভিটায় ঘুঘু চরবে এটা যে অসহ্য। তাছাড়া স্বাধীনতার জন্য সর্বাধিক লাঞ্ছনা ও ত্যাগ স্বীকার করেও স্বাধীনতা লাভের পর প্রিয় মাতৃভূমিতে তাদের স্থান হবে না, এ কথা যে চিন্তাও করা যায় না। হিন্দুদের যাই হোক স্বাধীনতার পর বাঙ্গালী মুসলমানদেরও অবস্থা হয়ে উঠে বড় করুণ ; আরো শোচনীয়।

ইংরাজের অনুকম্পায় দান এই ফোকটসে পাওয়া পাকিস্থান। এর জন্য অপরিনামদর্শী বাঙ্গালী মুসলমানরাও আহ্লাদে আটখান, গর্বে স্ফীত। ভাগ্যের কি পরিহাস—স্বাধীনতা উৎসবের রোশনাই স্তিমিত হতে না হতে তাদের সুখের পাকিস্থানের খোয়াব যায় টুটে। হতাশ বাঙ্গালী মুসলমানরা দেখল যে, তারা নিজেদের দেশেই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। এখানে বিহারী, পাঞ্জাবী মুসলমানদেরই একচেটিয়া কর্তৃত্ব। ভগ্নহৃদয় বাঙ্গালী মুসলমান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে সুরু করে, 'হে আল্লা ! শেষ পর্যন্ত আমাদের দশাও হিন্দুদের মতই শোচনীয় হবে ?"

বাঙ্গালী জাতি স্বভাবত শান্ত ও শান্তিপ্রিয়। কিন্তু আত্মমর্যাদায় আঘাত দিলে আহত বিষধরের মত গর্জে উঠে তারা শত্রুকে ঘায়েল করবেই। রুদ্রমূর্তি বাঙ্গালী বজ্রের মত কঠোর আর নিয়তির মত দুর্বার। ক্রুদ্ধ বাঙ্গালীদের নিষ্ঠুর আঘাতের খবর জানতেন দিল্লীর অত্যাচারী শাহানশাহরা ; আর তাদের অবার্থ লক্ষ্যের স্বাদ পেয়েছেন ইংরাজ শাসকরা। সেদিন ১৯৭১ সালে প্রাদেশিকতাদুষ্ট বীর খান সেনারাও হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন,—বাঙ্গালী কি কঠিন চিজ। তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, —বাঙ্গালীরা ভেতো হলেও, ভীত নয় মোটেই।

খান গোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারিতায় উত্যক্ত আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতি হঠাৎ আত্মসচেতন হয়ে হুংকার দিয়ে উঠে, —'আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে আমরা বিদেশীর পদানত হতে দেব না। এই জান কবুল।' বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে সাড়ে সাত কোটি পূর্ব-পাকিস্থানের হিন্দু-মুসলমান শপথ গ্রহণ করে, 'আমরা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করব ; আমাদের দেশের নাম হবে বাংলা দেশ, আমাদের ভাষা হবে বাংলা। আর—, আর আমাদের জাতীয় ধ্বনি হবে, 'জয় বাংলা !'

বাস, দেখতে দেখতে ঝড়ের বেগে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে জাতীয় ধ্বনি 'জয় বাংলা'। সহরে, গাঁয়ে, গঞ্জে, মাঠে, হাটে, বাটে সবার মুখে নতুন ধ্বনি 'জয় বাংলা' ! পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত হলে অভিবাদন 'জয় বাংলা'। মিছিলের ধ্বনি, 'জয় বাংলা !' সভা-সমিতির আদি-অন্ত-মধ্য ধ্বনি আকাশ বিদীর্ণকারী 'জয় বাংলা' ! শুধু বাংলা দেশেই নয় এই সুমধুর ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। পাকিস্থানের তক্তাউসে বসে জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ হঠাৎ আঁৎকে উঠেন, "আঁ—? 'জয় বাংলা ? সে আবার কি ?"

মোসাহেব বলেন, হুজুর। "শুধুই 'জয় বাংলা' ?

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা দেশ, তার ভাষাও হবে উর্দু নয়, কেবল বাংলা। শোনেন নি বুঝি ?"

মদ্যপ জেনারেলের স্বাভাবিক রক্তচক্ষু এ হেন বেয়াদপির কথা শুনে আরো লাল। চঞ্চল ভাবে একটু নাড়া চাড়া দিয়ে বসে বলেন সামরিক শাসক, 'বটে ? কাফের বাঙ্গালীগুলিকে এমন শিক্ষা দিতে হবে, যেন কোন দিনও পাকিস্থানের বিরুদ্ধে একটি কথা বলতেও সাহস না পায়। শা—, বুরবক কাঁহাকার !..... সেনাপতি টিক্কা খাঁ ?'

টিক্কা খাঁ সামনে এসে কুর্ণিশ করে দাঁড়াতেই সুরু করেন ক্রোধান্ধ প্রেসিডেন্ট, 'বাংলা মুল্লুকের খবর শুনেছ, সেনাপতি ? ওরা আমাদের বলিষ্ঠ পাকিস্থানের সংহতি ধ্বংস করতে উদ্যত। শুনেছি কাফের মুজিবুরটাই সমস্ত নষ্টের গোড়া। ইলেকশনের রেজাল্ট দেখে আমিও স্তম্ভিত। পৃথিবীর আর কোথাও বিরোধী নেতার এত বেশী জনপ্রিয়তা আছে বলে আমার তো জানা নেই। তা-হোক, ওই শয়তানটাকে দমন করতেই হবে। পারবে না টিক্কা খাঁ ?'

টিক্কা খাঁ—'হুঁজুরের ফরমাশ পেলে আমি কাফের মুজিবকে পিঁপড়ের মত পিষে মারতে পারি। তামাম বাংলা দেশকে ঠোঙ্গিয়ে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে তছনছ করতে এক সপ্তাহও সময় নোব না। তবে একটু চিন্তার কথা। খবর পেয়েছি যে, পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত হিন্দুরা মুজিবকে সাহায্য করছে, আর ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীও আড়াল হতে তাকে উসকাচ্ছেন। সুতরাং খুব হিসেব করে আমাদের কাজে নামতে হবে।"

সেনাপতি টিক্কা খাঁর আদেশে হিংস্র খান সেনারা নিরস্ত্র বাঙ্গালীদের উপর সর্বাত্মক আক্রমণ চালায়। সুরু হয় নৃসংশ অত্যাচার—হত্যা, গৃহদাহ, ধর্ষণ, লুঠতরাজ, নারী অপহরণ ! নিরীহ বাঙ্গালীর করুণ আর্তনাদে জেগে উঠে ঘুমন্ত সিংহ। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দলে দলে এগিয়ে আসে বাংলার দামাল ছেলেরা ; গঠিত হয় মুক্তি-বাহিনী ; সুরু হয় জীবনপণ স্বাধীনতা সংগ্রাম। একদিকে চীন ও আমেরিকার আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত সুশিক্ষিত পাকসেনাদল, অপর দিকে অতি সাধারণ হাতিয়ার সম্বল করে এগিয়ে চলে বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা। একমাত্র দেশ-মাতৃকার করুণ আহ্বানই তাদের প্রেরণা। এই ছিল ন্যায়ের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতার, মানবিকতার বিরুদ্ধে পাশবিকতার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ঔপনিবেসিকতার ও দুর্বলের বিরুদ্ধে ক্ষমতাগর্বীর লড়াই। এই বিস্ময়কর অসমান বামন-দৈত্যের যুদ্ধ দেখে সমগ্র বিশ্ব স্তম্ভিত।

আমাদের দেশকে যে ভূ-ভারত বলা হয়, তা এতটুকুও অতিশয়োক্তি নয়। শুধু প্রাকৃতিক, আধ্যাত্মিক, বা সহস্র রকমের ভাষা, পোষাক ও চালচলনেই নয়, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেও ভারত বিচিত্রময়। এদেশে বীর পৃথ্বিরাজের বিপক্ষে দেশ-বৈরী জয়চাঁদ, স্বাধীনচেতা নবাব সিরাজ-দৌল্লার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহী মীরজাফর উমীচাঁদেরদল যুগে যুগে আবির্ভূত ! —বেহেশতের পাশেই দোজখ ! ইহাও কি কম বিচিত্র ? বিশ্বের আজবখানা এ দেশ !

বাংলার পবিত্র মাটি স্পর্শ করে শপথ নিল মুক্তি-যোদ্ধারা, 'আমাদের মা-বোনদের উপর পাশবিক অত্যাচারের প্রতিশোধ নোব। চাই—রক্তের বদলে রক্ত !' কাতারে কাতারে চলেছে মুক্তিবাহিনী অত্যাচারী বিদেশী আক্রমণ-কারীর সাথে যুদ্ধ করতে। ঠিক তাদেরই পেছনে পা টিপে টিপে সচকিতে যাচ্ছে বিশ্বাসঘাতক মুসলিম লীগ, রাজাকর ও আলবদরের পাণ্ডারা। দেশপ্রেমিকদের গতি-বিধি শত্রু পক্ষকে জানাতে পারলেই দেশদ্রোহিতার মোটা পুরস্কার। মানব চরিত্র বড় দুর্বোধ্য। কেউ বীরের মত মরে অমর হয়, কেউ বেছে নেয় মরে-বাঁচার ঘৃণিত পথ !

চা-দোকানে বসে গুলতান করছে জনাকয়েক লীগের পাণ্ডা ও রাজাকর।

"ওয়ামী লীগওয়ালাদের খান সেনারা যেভাবে খতম করতে সুরু করে দিয়েছে, আর হপ্তা—দু হপ্তার মধ্যেই শালারা সব নির্মূল হয়ে যাবে। যত সব গোঁয়ার ও আকাট মূর্খের দল। হাতে অস্ত্র নেই, শস্ত্র নেই ; নিধিরাম সর্দার। লাঠি বল্লম নিয়ে শত্রুর কামান বন্দুকের সামনে গিয়ে প্রাণ দিলেই কি দেশ স্বাধীন হবে ? সব কচু-কাটা হবে।"

এ হেন আলোচনা খান সেনার দালালদের কাছে স্বভাবতই মুখরোচক। খান সেনাদের নিষ্ঠুরতায় ওরা কত খুসী। অদূরে বসে চা খাচ্ছিল মীরকাসেম। ওদের মন্তব্য শুনে সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। নিজেকে সামলাতে না পেরে সে বলে, 'খান সেনাদের নির্বিচার হত্যা, লুণ্ঠন ও বাঙ্গালী নারী নির্যাতনে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ব্যথিত ও মর্মাহত। আর তোমরা তার তারিফ করছ? মনে হয় যেন, এ ধ্বংস, এ নারী নির্যাতন, এই সর্বনাশ বাংলার হচ্ছে না, হচ্ছে অপর কোন শত্রুর, তাই তোমরা সবাই খুসীতে ডগমগ!'

মুসলিম লীগের স্থানীয় ছাত্রনেতা খলিল ব্যঙ্গ করে বলে মীরকাসেমকে,—'হাতি-ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল? তোদের গোঁয়ার নেতা মুজীবকে তো প্রেসিডেণ্ট য়াহিয়া কৌশলে খাঁচায় পুরেছেন। আর তোরা চুনোপুঁটিরা কি করবি, শুনি? আরে গাধারা! পাকিস্থান বাঁচলে তো তোদের বাংলাদেশ। বাংলাদেশ পৃথক হয়ে গেলে পাকিস্থান দুর্বল হয়ে পড়বে না? তখন হিন্দুস্থান আমাদের কেয়ার করবে?'

আকণ্ঠ সাম্প্রদায়িক বিষদুষ্ট মুসলিম লীগের চেলার কাছে এর বাড়া আর ভাল কি উত্তর আশা করা যেতে পারে? ওদের নেতাই না বলেছেন, 'আগে চাই আমার পাকিস্থান, তারপর দেশের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করব?

গভর্ণর আম্বাবাসে বলে কাসেম, 'মুক্তিযুদ্ধ যখন সুরু হয়েছে, মুক্ত আমরা হবোই। স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হওয়ার নজির হাতহাসে নেই।'

ঘণ্টার চা-দোকান হতে বেরিয়ে পড়ে কাসেম। দেশদ্রোহী পঞ্চম-বাহিনীর লোকদের সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয়ের সময় কোথায়? বিপন্না দেশমাতা যেন কাতর কণ্ঠে ডাকছেন, 'ওরে আমার দামাল ছেলেরা। যে যেখানে আছিস রুদ্র মূর্তি ধরে ছুটে আয়। শত্রুকে বুঝিয়ে দে,—তোরা ক্ষুদিরাম, সূর্যসেনেরই দেশের সন্তান।"

পথ চলতে চলতে চিন্তা করে কাসেম—দেশের এই দুর্দিনে আর একদিনও হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা ঠিক হবে না। গুপ্ত আড্ডায় গিয়ে মুক্তি-বাহিনীর ট্রেনিং নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী, আমার সেই মৃত্যু হোক শহীদের আত্মত্যাগ!.....আজ আর বাড়ী ফিরব না। আমার কথা শুনে আম্মা কেঁদে পাড়া জড়ো করবেন নির্ঘাত।.....ঐ-তো সামনেই প্রমীলাদের বাড়ী। রাতটা সেখানেই কাটাব, আর প্রমিলাকেও এ-সুযোগে একটু পরীক্ষা করে দেখা যাবে। অনেকেই তো তলে তলে খান সেনাদের গুপ্তচরের কাজ করছে।

ধীরে ধীরে গাছের আড়ালে ডুবে যায় দিনের সূর্য। পৃথিবীর বুকে নেমে আসে বিষণ্ণবদনা কাল-রাত্রী। রাতের আঁধারে সুরু হয় দেশদ্রোহী নিশাচরদের খেল। লীগের লোকেরা খান সেনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় হিন্দুদের এবং ওয়ামীলীগের লোকের বাড়ী বাড়ী। সুরু হয় সিংস্র খান সেনাদের হত্যা, লুণ্ঠন ও ধর্ষণ। সেজন্য অনেক গৃহস্থই রাত্রে ঘরছাড়া। অনেক গাঁয়ে সাঁঝের বাতিও জ্বলে না। সন্ধ্যার সাথে সাথে নেমে আসে নিশুতি রাতের স্তব্ধতা। এ যেন গাঁ নয়, মহাশ্মশান। প্রমীলাদের বৃহৎ দোতলা বাড়ীও অন্ধকারে আত্মগোপন করে আছে। বাড়ীর সামনে এসে থমকে দাঁড়ায় কাসেম,—বাড়ীতে 'টু' শব্দটিও নেই কেন? ভয়ে সবাই বাড়ী-ঘর ছেড়ে জঙ্গলে লুকিয়েছে? ক্ষণেক থেমে কড়া নাড়া দিতে দিতে সে ডাক দিল, 'প্রমীলা, দরজা খোল, আমি কাসেম।"

পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে প্রদীপ হাতে নীচে নেমে আসে প্রমীলা। দরজা খুলে প্রদীপটা উঁচিয়ে চকিতে আগন্তুকের মুখ ভঙ্গীটা দেখে নিল সে,—এই অরাজকতার ডামাডোলে কোথায় কে কি মতলবে ঘুরে, তা কি বলা যায়? মৃদু হেসে সে স্বাগত জানায় কাসেমকে। 'ভেতরে এসে বোস, আমি তো প্রথমটায় ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলাম, না জানি খান সেনাদের নিয়ে মুসলিম লীগের বা আলবদর রাজা করদের কেউ এসে গিয়েছে। বাড়ীটা একটু ভেতরে বলে আজও আমরা নিরাপদে আছি। তারপর, কি মনে করে এ অসময়ে গরীবের বাড়ীতে?'

শুধু খান সেনা কেন? এ সময়ে যে কোন লোককে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে, প্রমীলা। তোমার মনে

পড়ে, সে দিন কলেজে খলিল সীমার তারাই সবার আগে কারণ শরিফ স্পর্শ করে শপথ নিয়েছিল যে, তারা দেশের জন্য প্রাণ দেবে? আর আজ তারা সব্বাই পঞ্চমবাহিনী; একটু থেমে আবার বলে কাসেম, 'যে যা খুসী করুক। তাতে আমাদের কি করণীয় থাকতে পারে?.....আমি চলেছি মুক্তি বাহিনীতে নাম লিখাতে। বাড়ীতে গেলে মা আমায় ছাড়বেন না। তাই তোমাদের এখানে রাতটা কাটিয়ে ভোরের দিকে রওনা হব চুয়াডাঙ্গা। তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না তো?'

হেসে উত্তর দেয় প্রমীলা, 'বাঃ—রে, শত অসুবিধা হলেও বাড়ীতে অতিথি এলে কেউ কি তাড়িয়ে দেয়? তুমি স্বচ্ছন্দে থাক। তবে খাওয়ার একটু কষ্ট হবে আর কি।'

কাসেম—'খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হবার কি আছে? তোমাদের বাড়ীতে কতইতো খেয়েছি। ভাবলাম, গতিকে তোমার সঙ্গে একটু দেখা করেই যাই। হয় তো জীবনে এই-ই শেষ দেখা।'

অস্বাভাবিক গম্ভীর প্রমীলার মুখ। রুক্ষ স্বরে সে বলে, 'যুদ্ধে মরতে যাওয়ার সখ কেন? পাখা গজিয়েছে বুঝি?'

পাখা গজালে এমন লোভনীয় স্ফূর্তিজের সঙ্গে মিলিত হবার ক্ষুদ্র পিপিলীকার সুযোগ কোথায়? ক্ষুদি কানাই, সত্যেন, বাঘা যতীন,—বাংলার এ সব দামাল যুবকেরা আগুন নিয়ে খেলতেই তো বেশী ভালবাসতেন। আমরাও তো তাদেরই দেশবাসী।'

প্রমীলা—'খলিল, সীমার তারা সভায় বাহবাও কুড়িয়েছে আবার তলে তলে নিজের ঘরও গুছাচ্ছে। তুমিই বা বোকার মত উল্টো পথে যাবে কেন?'

'কারণ, স্বদেশ প্রেম লাভ-লোকসানের হিসেব কষে হয় না। প্রাণের আবেগে স্বতঃস্ফূর্ত আত্মাহুতিতেই তার স্বার্থকতা। অবশ্য ঘর-মুখো স্বার্থান্ধদের চোখে শহীদের আত্মদান একটু 'বোকা বোকা' ঠেকে বইকি।'

প্রমীলা—'বড় বড় বাত করা যতটা সহজ, শুধু সেণ্টিমেণ্ট দিয়ে যুদ্ধে জয় করা ততটা সহজসাধ্য কাজ নয় বন্ধু! তোমাদের আছে কি?'

আমাদের আছে সজীব প্রাণ, আর তাজা খুন। স্বদেশ-প্রেম বজ্রানল। তার সামনে গোলাগুলির আগুন যে অতি তুচ্ছ। ভাড়াটে সৈনিক আর স্বাধীনতা সংগ্রামীতে যে আসমান-জমিন ফারাক।'

প্রমীলা—'বটে? তোমার ওই বুকের পাটা খান সেনার গোলার খোরাক যোগাবে, আর কোন ফয়দা হবে না তাতে।'

'ওই-তো যথেষ্ট। মরতে শিখলেই আমরা বাঁচতে পারব, প্রমীলা। শহীদের আত্মত্যাগ কখনো ব্যর্থ হয় না। শত শত লোককে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে, সহস্র সহস্র নরনারীকে জেলে, দ্বীপান্তরে পাঠিয়েও কি পেয়েছিল ইংরেজ এদেশে থাকতে? স্বদেশ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ জাতিকে পদানত করে রাখবার শক্তি জগতে কারোর নেই। তোমাদের পাকিস্থান তো অতি তুচ্ছ।' তবে হাঁ, সওদা করতে গেলে দ্রব্যমূল্য দিতে হয় বই কি। স্বাধীনতা অর্জন করতে হলেও বিনিময়ে কিছু প্রাণ বলিদান দিতে হবে। সে জন্য ভাবনা করলে চলবে কেন?'

প্রমীলা সতীর্থ কাসেমের জন্য ভূরিভোজের আয়োজন করেছে। কাসেম তৃপ্তি সহকারে খাচ্ছে। এ কথা সে কথার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে প্রমীলা, 'তাহলে সত্যিই তুমি দেশোদ্ধারে যাচ্ছ?'

প্রমীলার কটাক্ষ কাসেমের আত্মসম্মানে আঘাত হানে। গম্ভীর হয়ে সে উত্তর দেয়, 'দেশের এহেন দুর্দিনেও যে কর্তব্যে উদাসীন থাকবে, সে নিশ্চয়ই দেশের সুসন্তান নয়। দেশ তাদের কোনদিনও ক্ষমা করবে না। তাছাড়া-দেশ-সেবার প্রতিশ্রুতি বড়লোকদের কাছে শুধুই বাত-কে-বাত হলেও গরীবদের পক্ষে সে প্রতিশ্রুতি অবশ্য পালনীয়।'

বলাই বাহুল্য যে কাসেম বড়লোক বলে প্রমীলাকেই 'ডাইরেকট হিট' করে। এতক্ষণের কৃত্রিম অভিনয়ের মুখোস খুলে ফেলে সোৎসাহে বলে প্রমীলা, 'সাবাস, ভাই কাসেম। তোমার ঐতিহাসিক নামেরও সার্থক। বন্ধুদের অনেকেই দেশ ও জাতিকে 'বিট্রে' করছে। সেজন্য

তোমাকে একটু বাজিয়ে নিলেম। মনে কিছু করো না যেন। শুনে নিশ্চয়ই খুসী হবে যে, সেদিন কলেজে শপথ নেওয়ার পর হতে আমরা ছাত্রীরাও চুপ করে বসে নেই। রাজিনা, সাকিনা ও শেফালীসহ আমরাও গুপ্ত নারী বাহিনী গঠন করেছি। ছলে-বলে-কৌশলে দেশ-বৈরীদের চিনে নিয়ে তাদের খতম করাই হবে আমাদের আসল কাজ।'

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনে হতভম্ব মীরকাসেম! বিমূঢ় হয়ে তাকায় প্রমীলার মুখের দিকে। সে পবিত্র মুখে শুধু জ্বলন্ত স্বদেশানুরাগ ছাড়া আর কিছুই লক্ষ্য করা গেল না। খাওয়া ফেলে দাঁড়িয়ে পড়ে কাসেম। সোৎসাহে বলে, 'এই তো সাহিত্যিকের মহাকাব্যের নায়িকা বীরাঙ্গনার যোগ্য কাজ। প্রমীলা, আমাদের পেছনে আমাদের মা-বোনেরাও আছেন জানতে পারলে এক একজন মুক্তিযোদ্ধা শত খান সেনাকেও পরোয়া করি না।'

বিহগ-কূজন-মুখরিত বাংলার প্রভাত কাল। ওই দূরের পূব আকাশে আলোর ছটা চিকচিক করছে। ইতিমধ্যেই গৃহিনীরা গৃহকর্ম লেগে গেছেন। মীরকাসেমের ঘুম ভেঙেছে। প্রমীলাও এসে গিয়েছে সহপাঠী বন্ধুকে বিদায় দিতে।

'তবে আসি ভাই! আর দেখা নাও হতে পারে। আমি বিশ্বাস করি, দেশের বিপদে সমস্ত মা-বোনেরাই নিজ নিজ কর্তব্য করে যাবেন।'

মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিতা প্রমীলা গদগদ কণ্ঠে বলে, 'তোমার বিদায়ের বেলা কিভাবে অভিনন্দন জানাব, বুঝতে পারছি না, কি যে বলব, সে ভাষাও খুঁজে পাই না। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর শুভ আশীর্বাদ তোমার শিরে বর্ষিত হউক। তুমি শত্রু ধ্বংস করে দিগ্বিজয়ী হয়ে ফিরে এসো; মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল কর। আর—,আর, আমার হাতের অঙ্গুরী তোমায় পরিয়ে দিচ্ছি। এটা যোগাবে তোমার শ্রান্ত মনে প্রেরণা। স্মরণে রেখো—হয় বাংলার মুক্তি-সাধন, নয় তো শরীর পতন। মুক্তিকামীর সামনে দ্বিতীয় কোন বিকল্প নেই, বন্ধু। বিশ্বাস করতে পার, হানাদারদের দেশ হতে বিতাড়িত না করে আমরা মেয়েরাও ক্ষান্ত হব না।'

বিস্ময়-বিমূঢ় মীরকাসেম। এতটা নাটকীয় পরিস্থিতির জন্য সে যে প্রস্তুত ছিল না। বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াবার কথা যে তার কল্পনারও অতীত। তাই তো নির্বাক বিস্ময়ে সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে প্রমীলার তেজোদীপ্ত সুন্দর মুখখানার দিকে। প্রমীলা বলে 'এতে অবাক হবার মত কিছু নেই, ভাই! এত পাশাপাশি থেকেও আমরা হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে স্নেহ, ভালবাসার ডোরে বাঁধতে পারি নি বলেই দেশে এত হানাহানি, এত অবিশ্বাস। আমরা সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী ভাই-বোন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে হুংকার দিয়ে উঠলে লক্ষাধিক হানাদার তো তুচ্ছ কথা, তাদের মদতদাতা ক্ষমতাগর্বী চীন-আমেরিকাও ভয়ে আঁৎকে উঠবে। আর আঁৎটির কথা ভাবছ,—তা কি করে সম্ভব? না? আমরা গোঁড়া, বিচ্ছেদকামী মোল্লা-পুরুতের ফতোয়া তো মানব না। পাতি দিতে এলে বলব, 'হুজুর! বর্বর খান সেনারা যে আপনাদের ঘরের মা-বোনদের জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, আগে তাদের ব্যবস্থা করে পরে আসবেন আমাদের খুঁত ধরতে।'

মুখচোরা সতীর্থার তেজ দেখে তাজ্জব বনে যায় কাসেম। সোচ্চারে বলে, 'তোমার মধ্যে এত আগুন? এ যে অবিশ্বাস্য বাড়বানল!'

"কেন? বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈর কথা জান না? সাম্রাজ্যবাদী ডালহৌসীর হুমকিতে ভারতের বড় ছোট আর সব রাজারা নপুংসকের মত কাজ করলেন। নিজ নিজ রাজ্য সঁপে দিলেন তাঁর পদতলে। ক্ষুদে ঝান্সী রাজ্য অধিকার করতে এলে দাম্ভিক ডালহৌসীর মুখের উপর রাণী লক্ষ্মীবাঈ বলে দিলেন "মেরী ঝান্সী নেহি দিউঙ্গী! এবারকার স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রমাণ করব যে, আমরা তাঁরই সুযোগ্যা বংশধর।'

মীরকাসেম আরো বিস্মিত! প্রমীলা বলে 'যাও ভাই, এগিয়ে চলো। প্রয়োজন হলে দেশমাতৃকার পবিত্র বেদীমূলে প্রাণ দেবে, ভীরুর মত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। তোমার বীরত্বকে স্বাগত জানাতে অধীর প্রতীক্ষায় থাকব। বিজয়ী হলে তোমার স্থান হবে আমার এই বক্ষে। আর—আর শহীদ হলে তোমার কবরের উপর ঝরে পড়বে আমার হৃদয় নিংড়ানো দুফোটা উষ্ণ অশ্রু, বিদায়—জয় বাংলা।'

হিজ্ মাষ্টার্'স্ ভয়েস্

অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

কুকুরটা বসে ছিল ঘরের বাইরে, দরজার মুখেই। ভারতীদেবী বললেন, এই যে কুকুরটা দেখছেন, এটা আমার বাবার আমলের।

—তাই নাকি? আশ্চর্য হয়ে বললাম, সেই কুকুরটার এই হাল হয়েছে? এই রকম নির্জীব?

ভারতীদেবী একটু খুশীর হাসি হেসে বললেন, হ্যাঁ, আমারই শাসনে ও এখন শান্ত হয়েছে।

আগে যখন কুকুরটাকে দেখেছি, তখন ওর স্বাস্থ্য ছিল যেমন সুন্দর, স্বভাব ছিল তেমনি তেজী। তখন এমন সজাগ দৃষ্টি ছিল এই কুকুরটার যে, অচেনা লোকের কথা ছেড়েই দিলাম, বাইরে থেকে একটা পিঁপড়েরও ক্ষমতা ছিল না এই বাড়ীতে ঢোকবার।

বললাম, ভারতীদেবী, আপনার মনে আছে কিনা জানি না, আপনার বাবার আমলে একবার একসঙ্গে পাঁচটা চোর ঢুকেছিল এই বাড়ীতে, সেদিন এই কুকুরটা একাই পাঁচ-জনকে জখম করেছিল।

—হ্যাঁ, সে-ঘটনা মনে আছে আমার। ভারতীদেবী বললেন, ওর সেই ভয়ঙ্কর শক্তি আর তেজস্বিতাই সেদিন আমার সবচেয়ে বড় ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সাংবাদিক মশায়।

—বলেন কি? কুকুরের তেজস্বিতায় আপনি ভয় পেলেন? আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, কুকুরটা তো আপনারই জিনিস? ওকে ভয় করবার কি আছে?

ভারতীদেবী একটু হাসলেন, বললেন, আপনার মতো যারা রাজনীতি বোঝে না, তারা আমার ভয়ের কারণটা বুঝবে কি করে?

বললাম, তবু আপনি বুঝিয়ে দিলে হয় তো বুঝতে পারবো।

ভারতীদেবী বললেন, দেখুন, বাবার আমল থেকে কুকুরটার দাবি-দাওয়া এতো বেড়ে যাচ্ছিলো যে তা পূরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, একটা গৃহস্থ কুকুরের কী এমন দাবী থাকতে পারে যা ভারতীদেবীর কাছে অসহ্য মনে হলো?

ভারতীদেবী অত্যন্ত জ্ঞানী মহিলা বলে পরিচিত। আমার মনের কথাটা বুঝতে পেরে জবাব দিলেন, কুকুরটা ব্যক্তি-স্বাধীনতা চাইছিল। তাছাড়া আমার গাড়ীতে উঠে বেড়াতে যাবে, আমার ঘরে ঢুকবে, আমার বিছানায় শোবে। বলে, আইনের চক্ষে আমরা দুজনেই নাকি সমান!

বললাম, এরকম আবদার তো সব কুকুরেই করে থাকে ভারতীদেবী। একটা গৃহস্থ কুকুরের এ তো ন্যূনতম দাবী। এই সামান্য গণতান্ত্রিক অধিকারটুকু ওকে আপনি দিতে চাইছেন না কেন?

—দিতে চাইছি না, একথা বললে ভুল সাংবাদিক মশায়, কারণ আমি চিরদিন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। ভারতী-দেবী বললেন, কিন্তু কুকুরকে তার গণতান্ত্রিক অধিকার ততক্ষণই দেওয়া যেতে পারে যতক্ষণ সে আমাকে প্রভু বলে মানবে। সে যদি অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চায়, যদি আমার বদলে এ-বাড়ীর অন্য কাউকে প্রভুত্ব দিতে চায়, তবে সেই গণতন্ত্রের কোনো মূল্য আছে বলে আমি মনে করি না।

—সে রকম পরিবর্তনের সম্ভাবনা কি দেখা দিয়েছিল?

—দিয়েছিল বইকি। ভারতীদেবী কুকুরটার ওপর একবার অগ্নিদৃষ্টি বুলিয়ে রুক্ষ কণ্ঠে বললেন, শুধু কি

তাই? কুকুরটা শেষে আন্দোলনে নামবার আয়োজন করছিল। কদিন ধরে আমার নামে 'মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ' বলে খুব চেঁচিয়েছে। সেই জন্যেই তো আমাকে এই কঠোর ব্যবস্থা নিতে হল।

কুকুরটা ভারতীদেবীর মুখের দিকে জুল জুল করে তাকিয়ে চুপচাপ বসেছিল। তার জরাজীর্ণ শরীরটা থুকছে। চোখ দুটো ঢুকে গেছে কোটরে। এ যেন মৃত্যু-যন্ত্রণার চেয়েও ভয়ঙ্কর।

বললাম, কুকুরটার দুচোখ দিয়ে জল পড়ছে, ভারতী-

পড়ুক। ভারতীদেবী বললেন, তবু প্রতিবাদ করতে দেবো না। ঘেউ ঘেউ করে চেঁচালেই ওই লোহার খাঁচায় বন্দী করে রাখবো।

—ভারি জব্দ করেছেন তো আপনি কুকুরটাকে?

—আপনি বলছেন?

—বলবার দরকার হয় না, চোখেই দেখা যাচ্ছে।

ভারতীদেবী আমার কথায় খুশী হয়ে বললেন, বাছাধনকে এমন শিক্ষা দিয়েছি যে এখন আর মুখে রা নেই। সব সময় শান্ত-শিষ্ট হয়ে মুখ বুজে বসে থাকে। আমার ঘরে ঢুকতেও আর সাহস করে না।

—বাঃ, আপনার বুদ্ধি এবং শক্তির তারিফ করতে হয়।

ভারতীদেবী আরো খুশী হয়ে বললেন, আগে এই কুকুরটা ভাল ভাল খাবার খেতে চাইতো। বলতো 'ভেজাল জিনিস খাব না, খাঁটি জিনিস চাই'। তা আবার পেট ভরে খেতে চাইতো। তাই আমি এখন ওর খাদ্যের পরিমাণ একেবারে কমিয়ে দিয়েছি। মাছ, মাংস, ভাত রুটিও প্রায় বন্ধ হয়েছে।

—কী খায় তাহলে কুকুরটা?

—আজকাল ঘাস খেতে দিচ্ছি, তাই খাচ্ছে বিনা প্রতিবাদে।

আমার বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। অবিশ্বাসের সুরে বললাম, আপনি বলছেন কী? কুকুরটা এখন ঘাস খায়? গরু হয়ে গেল নাকি কুকুরটা?

—তা জানিনে। তবে, আমার কথার সত্যতা আগেই প্রমাণিত হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে আপনারা এটাও দেখতে পাবেন যে, এই কুকুরটাকে আমি ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবো বাড়ী থেকে।

আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম। বললাম, সত্যিই আপনার "কুকুর হটাও" আন্দোলন পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। এর জন্যে আপনাকে 'মুক্তি-সূর্য' আখ্যা দেওয়া উচিত। সংসারটাকে আপনি কুকুর-মুক্ত করতে চান।

ভারতীদেবী খিল খিল করে হেসে উঠলেন। বললেন—ভারি রসিক তো আপনি? রাজনীতিও বোঝেন দেখছি।

কিন্তু হঠাৎ একটা কোলাহলে আমাদের দুজনেরই হাসি থেমে গেল। জানালা দিয়ে দেখি, বাড়ীর দরজার মুখে ভীষণ লড়াই চলছে। বাইরের তিনটে লোক জোর করে বাড়ীর ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করছে আর প্রহরী তাদের বাধা দিচ্ছে প্রানপণ শক্তিতে।

আমি চিৎকার করে বললাম, কী সর্বনাশ, বাইরের শত্রু এসে আক্রমণ করেছে আপনার বাড়ী!

ভারতীদেবী বললেন, ভয় নেই, আমার প্রহরী তো লড়ছে।

কিন্তু কিছুক্ষণ লড়াই করার পর প্রহরী লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। তিনজন শত্রু এসে ভারতীদেবীর ঘরের মধ্যে ঢুকলো।

ভারতীদেবী ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর শত্রুদের বললেন, সাবধান আমার কুকুর আছে, সে তোমাদের কামড়ে ছিঁড়ে ফেলবে। ঘর থেকে বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি।—

শত্রুরা তাঁর কথা শুনলো না। ঘরের জিনিসপত্র ভেঙেচুরে তছনছ করতে লাগলো, আর সেই সঙ্গে ব্যাপক লুণ্ঠন।

ভারতীদেবী উদাত্ত কণ্ঠে তাঁর কুকুরটাকে বললেন, টম, তুমি চুপ করে বসে আছ কেন? দেখছো না, ঘরে শত্রু ঢুকেছে?

আমি তখন আমার সাংবাদিকতার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। হঠাৎ টমের গলা শুনে চমকে উঠলাম। কুকুরটা কথা বলছে!

টম বললে, আমার কোনো অধিকার তো নেই দিদিমণি। কথা বলবার অধিকার, আন্দোলন করবার অধিকার, নাগরিক অধিকার—কিছুই নেই। ঘরে ঢোকবার অধিকারটুকুও তো তুমিই কেড়ে নিয়েছ।

ভারতীদেবী বললেন, আমি আবার তোমাকে ঘরে ঢোকবার অধিকার দিচ্ছি, আন্দোলন করবার অধিকার দিচ্ছি। তুমি ঘরে ঢুকে শত্রুদের আক্রমণ কর, টম্।

টম বললো, এ-অধিকার তুমি দিচ্ছ আমার স্বার্থে, না তোমার নিজের স্বার্থে?

ভারতীদেবী অস্থির হয়ে বললেন, তুমি আর তর্ক করো না টম্, আগে শত্রুকে বিদায় করো। তোমার, আমার, সকলের স্বাধীনতা আজ বিপন্ন।

টম একটু হাসলো। বিদ্রূপের হাসি। বললো, কী হবে এই স্বাধীনতা দিয়ে, যে-স্বাধীনতা আমাকে কুকুর থেকে মানুষ হতে দিল না? বরং গরুর পর্যায়ে টেনে নামিয়েছে আমাকে!

ভারতীদেবী অনুনয়ের সুরে বললেন, আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি টম্, মানুষ হবার সব রকম সুযোগ-সুবিধা তোমাকে আমি দেবো। তুমি স্বাধীনতাকে রক্ষা করো, টম্। স্বাধীনতার ইতিহাসে তোমার নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে।

কুকুরটার গলা দিয়ে স্পষ্ট আওয়াজ বেরুচ্ছে না, কোনো রকমে চিঁ-চিঁ করে বললে, স্বাধীনতা সংগ্রামে আমি কেমন করে লড়বো, দিদিমণি? সে-শক্তি আমার কোথায়? ঘাস খাইয়ে খাইয়ে তুমি তো আমাকে আধমরা করে রেখেছ।

—সেজন্যে ভেবো না। ভারতীদেবী বললেন, আমি তোমাকে দেশাত্মবোধক গান শোনাচ্ছি। তাহলেই তুমি তোমার হারানো শক্তি ফিরে পাবে।

ভারতীদেবীর কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠলো কুকুরটা। ভারতীদেবী তাড়াতাড়ি হিজ্ মাস্টার্স ভয়েস-এর একখানা দেশাত্মবোধক গানের রেকর্ড চালিয়ে দিলেন। গাঁ গাঁ করে বাজতে লাগলো লাউড স্পীকার।

একজন শত্রু ততক্ষণে ভারতীদেবীকে মাটিতে ফেলে তাঁর বুকের ওপর চেপে বসেছে। ভারতীদেবী কাতর হয়ে আর্তনাদ করতে লাগলেন, আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, টম্।

কিন্তু সেই আর্তনাদ যেন কানেই গেল না কুকুরের। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে সে আগের মতোই চুপ করে বসে রইলো।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

বিভূতিভূষণ বসু

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর এক বিস্মৃতপ্রায় মনীষি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে যে কয়জন মনীষি জন্মগ্রহণ করে বঙ্গজননীর মুখ উজ্জল করেছিলেন তাঁদের মধ্যে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ অন্যতম ছিলেন। আজ প্রয়োজন হয়েছে তাঁর জীবন, কর্ম ও আদর্শ স্মরণ করার। শিক্ষক, সাংবাদিক, সমাজ-সংস্কারক, দেশহিতব্রতী নেতা রূপে তিনি বাংলা দেশের জনসাধারণের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি চিরকাল আকৃষ্ট করবেন।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল (১২২৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ) মাসে কলকাতার বার মাইল দূরে চাংড়িপোতা গ্রামে (অধুনা সুভাষগ্রাম ষ্টেশনের নিকটে) দ্বারকানাথ জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হরচন্দ্র ভট্টাচার্য ন্যায়রত্ন। কলকাতায় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠী ছিল ও তিনি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদনে সাহায্য করতেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে হরচন্দ্র পুত্রকে গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কলেজ ত্যাগ করেন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম ও প্রধান বৃত্তি পেয়ে তিনি বিদ্যাভূষণ পদবী লাভ করেন। সংস্কৃত কলেজের বার্ষিক বিবরণীতে লেখা আছে :—

"Dwarkanath Vidyabhusan studied for twelve years seven months grammar, belles letters, Rhetoric, Arithmetic, Logic, Theology, Law and English.....On quitting the College he hold a senior scholarship of the first grade. He left the College in January, 1844.

তিনি হিন্দু ল কমিটির প্রশংসাপত্র লাভ করেন। ১৮৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দের কলেজের রিপোর্টে জানা যায় যে ছয়জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়েছিলেন একমাত্র দ্বারকানাথই হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষক মার্শাল্যাণ্ড মন্তব্য করেন—

"I have only recommended Dwarkanath for a diploma."

দ্বারকানাথ প্রথমে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের নবাগত সিভিলিয়ানদের বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। পরে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বরে নীলমাধব শর্মরি মৃত্যু হলে সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষের পদ শূন্য হয়। ৩০ টাকা বেতনে তিনি সে পদে নিযুক্ত হন (১৬ই নভেম্বর, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ)। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাধর তর্কবাগীশের মৃত্যু হলে ১৪ই জানুয়ারী তারিখে পঞ্চাশ টাকা বেতনে দ্বারাকনাথ স্থায়ী পদে ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক হন।

তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেক্রেটারী জে টি মার্শাল, শিক্ষাপরিষদ তারই ওপর অধ্যাপক নির্বাচনের ভার দিয়েছিলেন। তিনি সেক্রেটারী বাবু রসময় দত্তকে লেখেন :—

"Dwarkanath stood first on the list of candidates lately examined for these appointments and in fact answered correctly all the questions submitted on the occasion. I firmly believe no other candidate can produce equal proofs of qualifications and I therefore strongly recommend Dwarkanath Vidyabhusan for the vacancy." (১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী তারিখে লেখা চিঠি হতে উদ্ধৃত)। এই পদে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে পর্যন্ত দ্বারকানাথ কাজ করেন। কলেজের অধ্যাপনা কালে তিনি হিন্দু স্কুলের কৈলাশচন্দ্র বসু নামক জনৈক শিক্ষকের স্বীয় সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞতার বিনিময়ে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করতেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে তারিখে তিনি কলেজের অধ্যক্ষের সহকারী রূপে মাসিক একশত টাকা বেতনে কাজ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যালয় পরিদর্শনে গেলে তার স্থলে সংস্কৃত কলেজের অস্থায়ী ভাবে কাজ চালাবার জন্য দ্বারকানাথ নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১লা ডিসেম্বরে (১৮৫৫ সালে) শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মুর্শিদাবাদে ল অফিসার হলে ৯০ টাকা বেতনে সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপকের পদে তিনি নিযুক্ত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর সম্বন্ধে লেখেন ঃ—

"The latter officer is a man of extensive acquirement and is in my numble opinion fully competant to do justice to the past. He gave satisfactony proofs of his abilities as a teacher while serviny as second Professor of grammar previous to his present employment."

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখে ৫৩ বছর ৩ মাস বয়সে ৬৯ টাকা ১০ আনা পেনসন নিয়ে দ্বারকানাথ অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন স্বাস্থ্যহানির জন্য।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে পিতা হরচন্দ্রের সহায়তায় একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করে স্বরচিত রোমের ইতিহাস ও গ্রীসের ইতিহাস প্রকাশ করেন। তাঁর জীবনের প্রধান কীর্ত্তি সাপ্তাহিক সোমপ্রকাশ পত্রিকা সম্পাদনা। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। মার্জিত রুচি, প্রাঞ্জল ভাষা ও নির্ভীক সমালোচনার জন্য পত্রিকাটি বিশুদ্ধ রাজনীতি ও সুস্থ সাহিত্যের প্রসারে দীর্ঘদিন বাংলার সংবাদপত্র জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল (১৮৫৮-১৮৭৮)। লর্ড লিটনের আফগান নীতি ও পাঞ্জাবের শিক্ষার অব্যবস্থার বিষয়ে লেখার জন্য পত্রিকা কর্তৃপক্ষের কাছে জামানত দাবী করা হয়েছিল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটন বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ করলে তিনি মুচলেকা দিতে অস্বীকার করে সোমপ্রকাশের প্রচার বন্ধ করে দেন। পরে ঐ আইন রদ হলে পত্রিকাটির পুনঃ প্রকাশিত হয়। ₹ 36,155

বাংলার সাপ্তাহিক সংবাদপত্ররূপে সোমপ্রকাশ বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। ১৫ই নভেম্বর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে (১লা অগ্রহায়ণ, ১২৬৫) সোমবার পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ক্যানিং পর্য্যন্ত রেলপথ স্থাপিত হলে সোমপ্রকাশ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে চাংড়িপোতার দ্বারকানাথের নিজস্ব প্রেসে মুদ্রিত হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী তারিখে মোহনলাল বিদ্যাবাগীশের হাতে সম্পাদনা ভার দিয়ে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের Vernacular Press Act রদ হলে ৯ই এপ্রিল, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সোমপ্রকাশ মির্জাপুর দপ্তরি-পাড়ায় কল্পদ্রুম প্রেস হতে প্রতি সোমবার বেরোত। এর অল্প দিন পরেই এটা হস্তান্তরিত হয়।

১২৮৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের অগাষ্ট) হতে কল্পদ্রুম নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে দেবগণের মর্ত্তে আগমন প্রকাশিত হয়েছিল। ৫ বছর চলার পর ১২৯১ সালে এই পত্রিকা বন্ধ হয়।

সাংবাদিক ব্যতীত দ্বারকানাথ নানা জনহিতকর কর্মে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। তখন রাজপুর, হরিনাভী, চাংড়িপোতা ইত্যাদি স্থান সাউথ সুবারবণ মিউনিসিপ্যালিটির অধীন ছিল। সেখানে পাকা রাস্তা ছিল না। বন-জঙ্গল কাটা হতো না। হরিতাভী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ভাগিনেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও উমেশচন্দ্র দত্তের সাহায্যে রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপন করেন। সোমপ্রকাশের জলন্ত ভাষা ও বিদ্যাভূষণের চেষ্টার গুণে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয়। তিনি মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্যাবলী তন্ন তন্ন করে দেখতেন। কমিশনারদের তাঁদের কর্ত্তব্য বুঝিয়ে দিতেন।

হরিনাভী গ্রামে উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন দ্বারকানাথ। তার নাম Harinavi Indo-Sanskrit School, পরে সে বিদ্যালয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বিদ্যালয় রূপে খ্যাত হয়। রাজপুরে ডাকঘর স্থাপন করে দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সোনারপুর হতে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত কুড়ি মাইল রেলপথ স্থাপিত হয়। চাংড়িপোতা জনবহুল স্থান হলেও সেখানে ষ্টেশন ছিল না। হরিনাভি, কোদালিয়া ও চাংড়িপোতার জনসাধারণের সুবিধার্থে সেখানে ষ্টেশন স্থাপিত হয়। দ্বারকানাথের

চেষ্টায়। গ্রামবাসীরা দ্বারকানাথকে দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করেছিলেন। আগে বৈদিক ব্রাহ্মণদের কুলপ্রথানুসারে শিশুসম্বন্ধ হত। তাঁর চেষ্টায় বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজে শিশুসম্বন্ধ রহিত হয়।

শেষজীবনে জব্বলপুরের নিকটে মাতনায় গিয়ে বসবাস করতেন অসুস্থাবস্থায় চিকিৎসার জন্য। সেখানেই ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট তিনি দেহত্যাগ করেন। সমাপ্ত হয় এক কর্মবহুল সৎ জীবনের।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সাংবাদিক রূপে বিখ্যাত হলেও সাহিত্যিক রূপে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি নিম্নলিখিত নয়টি পুস্তক রচনা করেছিলেন

(১) নীতিসার—(৩ খন্ড) ১৮৫৬, ১৮৫৭, ১৮৫৮
(২) রোমরাজ্যের ইতিহাস—১৮৫৭
(৩) গ্রীসদেশের ইতিহাস—১৮৫৭
(৪) সুবুদ্ধির ব্যবহার—১৮৬০
(৫) ভূষণসার ব্যাকরণ—১৮৬৫
(৬) বিশ্বেশ্বর বিলাপ—১৮৭৪
(৭) উপদেশমালা—(২ খন্ড) ১৮৮৩
(৮) সাংখ্য দর্শন—(২ খন্ড) ১৮৩৩ (মৃত্যুর পর প্রকাশিত)
(৯) দেবগণের মর্ত্তে আগমন—১৮৮৩ (মৃত্যুর পর দুর্গাচরণ রায় কর্তৃক প্রকাশিত)

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ পরলোক গমন করার পর প্রায় একশত বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। তিনি সোমপ্রকাশ প্রকাশিত করে দেশের অনেক ইষ্টসাধন করেছিলেন। তাঁর পত্রিকা এতদূর খ্যাতি লাভ করেছিল যে গভর্ণর রিচার্ড টেম্পল তাঁকে ডেকে সোমপ্রকাশ বন্ধ না করার জন্য অনুরোধ করেন ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে।

সোমপ্রকাশের ভাষা শুদ্ধ ও লালিত্যপূর্ণ। এতে মতের উদারতা ও যুক্তিযুক্ততা, তেমনি নীতির উৎকর্ষ ছিল। সংবাদ প্রভাকর ও ভাস্কর বাংলার বাতাস দূষিত করেছিল। তোষামোদের জন্য বিদ্যাভূষণ লেখনী ধারণ করতেন না। যা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন তাই লিখতেন। এর বার্ষিক চাঁদাও অগ্রিম দিয়েছিল। ১৮৬০-৭০ খৃষ্টাব্দে এর প্রভাব ছিল বাংলার সর্বত্র।

বিদ্যাভূষণ ইংরেজী শিক্ষার কুফলের জন্য অনুশোচনা করতেন। তার ছেলে ধর্ম কর্মে মন দেওয়ায় সুখী হন। নিজভবনে হরিসভা করে কথকতা পাঠ, শাস্ত্র ব্যাখ্যা প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন। কাশীতে পাণ্ডাদের মধ্যে ধর্ম ও নীতির দুরবস্থা দেখে দুঃখিত হতেন। তাঁর মৃত্যুতে মনীষি ভূদেব মুখোপাধ্যায় সত্যই বলেছেন :—

"বিদ্যাভূষণ মহাশয় বাংলা সংবাদপত্রের প্রথম শিক্ষা-গুরু। তাহা হইতেই বাংলার সংবাদপত্রের উন্নতি হয়। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই সুপদ্ধতিতে বাংলার সংবাদপত্র পরিচালনের প্রকৃত পথ প্রদর্শন করেন। রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে আন্দোলন কিরূপে করিতে হয় তিনিই তাহা বাংলা সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে দেখাইয়া দেন। এক্ষনে পূর্বাপেক্ষা বাংলা সংবাদপত্রসমূহে অনেক উন্নতি হইয়াছে বটে কিন্তু সোমপ্রকাশ সংবাদপত্রই যে এ উন্নতির মূল ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।"

সোমপ্রকাশ পত্রিকা তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে লিখেছিলেন "দ্বারকানাথ বড় দয়ালু প্রকৃতির লোক ছিলেন। প্রকৃত দুরবস্থায় পড়িলে দেশ তাঁহার সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইত না। তিনি মিতব্যয়ী, পরিশ্রমী, অধ্যবসায়-শীল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। কখনও কেহ তাহাকে মিথ্যা কথা বলিতে শোনে নাই। অথবা কোন বিষয় গোপন করিতে দেখে নাই। তিনি সত্য-প্রিয়তার বড় আদর করিতেন। মিথ্যাবাদীকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। কপটতা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তেজস্বিতা দ্বারকানাথের গুণরাজির শিরোভূষণ ছিল। তিনি কখনও কাহারও আরাধনা করেন নাই। তাঁহার স্বদেশবাৎসল্য এত প্রবল ছিল যে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও তিনি স্বদেশবাসীর উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

এই প্রবন্ধ রচনার সময় নিম্নলিখিত পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে :—

(১) দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—সাহিত্য সাধক চরিতমালা
(২) জীবনী কোষ

(৩) ভারত কোষ
(৪) জীবনী অভিধান—এম সি সরকার প্রকাশিত
(৫) Freedom movement in Bengal—government of West Bengal প্রকাশিত
(৬) সরল বাংলা অভিধান—সুবল মিত্র
(৭) নূতন বাংলা অভিধান—ঐ
(৮) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী
(৯) আত্মচরিত—ঐ
(১০) Imperial Gazette—১৮৮৫

চিরঅমৃত বাণী

অসীমকুমার দাস

প্রিয় গুলু,

তোমার এই নাম লোক-প্রকাশিত নয়। ঘরোয়া আদরের নাম। যে লোক-প্রকাশিত নামে সকলেই তোমায় চেনে, সেই নাম ধরে ডাকতে বা স্মরণ করতে আদৌ আমার অভিলাষ নেই, বা কোন নতুন নামকরণ করে সেই নাম ধরে ডাকতে তেমন কোন অভিপ্রায় নেই। ওই ঘরোয়া নাম ধরে ডাকতে বা ওই নাম স্মরণ করে কিছু স্বপ্ন দেখতে চিত্ত হয়ে ওঠে চঞ্চল ও হৃদয়ের গভীরের অনুভূতিতে কি এক পুলকের শিহরণ আমায় উন্মাদনায় ভরিয়ে তোলে।

আমি ভাবপ্রবণ হতে পারি কিন্তু তাই বলে কল্পনায় তোমায় পেতে চাই না। আমার প্রতীক্ষার ফল যদি হয়ে ওঠে তোমার কাছে অমূলক সেখানেই ফুলেন বাগানে সাজানো গোছানো সেই শ্যামল সজীব লাবণ্যের মতো ভালবাসা হয়ে ওঠে বিড়ম্বিত। সেটাই আমার জীবনে দুর্ভাবনার ভাবনা।

তুমি রূপবতী এটা আমার কাছে স্বীকার্য। ভবিতব্য বলে মানতে হবে সেটা মানতে রাজী নই। বিধাতার অতুল সৃষ্টির উপর আমরা কৃতার্থ হতে পারি কিন্তু তাই বলে ভালো পেলেই অভিমানি হয়ে উঠবে, মন্দ হলে জীবন ব্যর্থ ভাববে এই চিত্তসুলভ বা চিত্তচাঞ্চল্য সংশয় দোলায় দুলতে আমার ইচ্ছা নেই।

তুমি তিলোত্তমা, অপ্সরী, সৌন্দর্য্যের ডালি, অনুপমা

এইসব শব্দযুক্ত নাম দিয়ে কৃত্রিম বিলাসে তোমার মন জয় করে কৃত্রিমতার ভালবাসার দাঁড় দিয়ে তোমায় বাঁধতে চাই না। আমি মানব তুমি মানবী। মানব মানবীর পরস্পর সুখের মিলনে পৃথিবীতে যুগ যুগান্তরের সেই সৃষ্টি এখনও অব্যাহত। কিন্তু যে কোন মানবীর হাত ধরলেই যে আমি ঈপ্সিত বাসনায় বা সৃষ্টির রসণায় পূর্ণ বা তৃপ্ত হয়ে উঠব তা মেনে নিতে মোটেই রাজী নই।

তোমার হরিণীর মতো আয়ত মন দুচোখের তারায় আমার দৃষ্টি গেছে থেমে, তোমার মুখাবয়ব থেকে আশ্চর্য একটা সৌন্দর্য্য খুঁজে পাই। জনারণ্যে হারিয়ে গেলেও ঠিক তোমায় চিনে নিতে পারি। সবচেয়ে আমার জীবনের বড় আলোড়ন তুমি যদি একবার আমার সামনে এসে দাঁড়াও তখন আমি আমিত্বে নেই। বুকে শুরু হয়ে যায় গুরু গুরু মেঘের গম্ভীর গর্জন, অদ্ভুত এক শিহরণ, আরও কাছে পাবার তীব্র বাসনা, বুকের ভিতর সুখের ঝরণা তোলপাড় বা তোমার স্পর্শে ভিতরটা দাবানলের মতো দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা এত সুপরিকল্পিত চিন্তার মধ্যেও একটা কি সদাই সোচ্চার হয়ে ওঠে, তুমি আমার চিরজীবনের সুখ-দুঃখের, জন্ম-মৃত্যুর, আনন্দ-বেদনার সাথী তো? এটাই আমার বড় দুশ্চিন্তা।

কর্মহীন অবসরে তোমার শূণ্যতায় তোমার কথা ভাবি যখন তখন মনে হয় আমার হৃদয়ের বাগানে তুমিই আমার সার্থক ফুল। তুমি চির নবীন চির লাবণ্যের এক সুগন্ধি ফুল। বাগান ব্যাপী তুমি বেড়ে বেড়ে একাকার হয়ে ছেয়ে গেছ। চাঁদের মতো সুস্নিগ্ধ এক অম্লান সৌন্দর্য্যের আলো আমার হৃদয় বাগানে ছড়িয়ে দিয়েছ, মধুর সৌরভে সৌরভে আমায় করেছ মদির আর উতলা। রসে রসে আমার তৃষ্ণার্ত বুকে এনে দিয়েছ সুধার স্বাদ। কিন্তু সহসা যখন আমার উৎসব মুখরিত বাগানে শোনা যায় মধুর বাতাসের অলক্ষ্যে হেমন্তের আহ্বান তখন তুমি যেন পলাতক হরিণীর মতো উদগ্রীব, বিশীর্ণ ফুলের মতো লাবণ্যহীণ, অস্তগামী সূর্যের মতো পাণ্ডুর, বিবর্ণ, মলিন। তখন আমার বুকে শূণ্য প্রান্তরে দুঃখী রাখালের করুণ বাঁশির মতো এলোমেলো বেদনার সুর বেজে ওঠে। তখনি জেগে ওঠে তোমাকে হারাবার বড় ভয় আর আমার বিশাল বুকে তোমার স্মৃতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ভয়ে বুকে কল-রোল তোলে গভীর এক নিঃসহায় কান্না।

সত্য হারিয়ে যায় অসত্যের ঘড় ঘড় শকটের টানে। তখন জগতের লাবণ্যময় চিরশোভিত সেই চিত্র যন্ত্রনার যূপকাষ্ঠে, বিদ্রূপ আর নিষ্ঠুরতার খড়্গে বলি হয়ে দৃষ্টির সামনে ফুটে ওঠে বিকৃত, মলিন।

মহাবিশ্বতলে তোমার অস্তিত্ব আঁকড়ে ধরার তীব্র প্রয়াসের আকাঙ্ক্ষায়, প্রলয় দুঃখের আবর্তনে ঘুরপাক খেতে খেতে তলিয়ে যায়। নিঃসীম বেদনা নিভৃত হৃদয়কন্দরে পুষ্পরেণুর মতো ফুটে ওঠে। বিলাসের অহংকারে শায়িত হয়ে শুভবুদ্ধির সূক্ষ্ম বিচারে আমার কোমল বিকশিত ভালবাসার বুকে নখদন্তে দানব মূর্তির রূপ ধারণ করে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেললে। জগতের কল্যাণময় পরিব্যাপ্ত বিশাল ভূখণ্ডে আমার আনন্দের সমস্ত অনুভূতি তোমার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হেমন্তের বাতাসে নিঃশেষে ঝরে ঝরে যায়। বিশ্ব-মানব কেন্দ্রে তোমার মহামানবতাবোধ বরং সহজেই ফুটে ওঠে। প্রচণ্ড আবেগে উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে ওঠো খুশীর আনন্দে। ধরার বুকে রূপের ছটায় অনন্যা তুমি এক উজ্জল ধ্রুবতারা।

মানব সভ্যতার পদতলে আমি অনিশ্চয়তার কাল। তোমার সংশয় আর বিশ্বাসের দোলায় দুলতে দুলতে অন্তিম কালের চাকায় পিণ্ট, রক্তাক্ত, জর্জরিত হয়ে যাই। তোমার ইচ্ছার প্রবল তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে আমার স্বপ্নময় সাধনার বেলাভূমি ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মহাকালের মহাযাত্রায় তলিয়ে যায়।

নিখিলের আলোয় তোমার ভবিষ্যতের পুণ্যদিনে তোমার অগ্রগতির পথ পূর্ব আকাশে রক্তরাগ আলোয় ভরে গেছে। আপনজন তোমার জীবনের সাথীকে নাও চিনে, নাও কাছে টেনে। ঝেড়ে ফেলে দাও অবসান রাত্রির সমস্ত কালীমা। অম্লান, পবিত্র যা আছে তোমার অন্তর অলক্ষ্যে অলিখিত লিপি আপন বীণায় বাজাও নিবিড় স্নিগ্ধ সুখের ছায়াতলে বসে।

তোমার বসন্তের বাগানে উদভ্রান্ত সমীরের আনা-

গোনা। জানি এখন তোমার নব নব রূপে সাজার পালা। আম্র শাখায় সুখের কোকিল মধুর সুরে ডেকে ডেকে তোমার হৃদয়-দিগন্তকে করেছে উতলা, অস্থির উন্মাদনায় শৈশবের দিনগুলো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে যৌবনের মশাল হাতে নিয়ে উদিত সূর্যের মতো নব জ্যোতির ন্যায় প্রজ্জলিত। তোমার বসন্তের বাগানে সৌরভে আমোদিত, সৌন্দর্য্যের নয়নাভিরাম শোভায় স্বর্গের দেবাদিদেব আকৃষ্ট। আশীর্বাদের ন্যায় পুষ্পবৃষ্টি বরিষণ ধারে ঝরে ঝরে পড়ছে। আকাশের পথ বেয়ে বেয়ে অমৃতধারা দুগ্ধফেনা ঝরণা ধারায় তোমার হৃদয় মাটিতে প্লাবিত। ভোরের শিশু-সূর্য তোমার দিগন্তকে করেছে উন্মোচন। তোমার রূপের বনানী নবীন অরুণ আলোর স্পর্শে শরৎ প্রকৃতির মতো লাবণ্যময়, মনোমুগ্ধকর। অনাবিল শুভ্রতায় পবিত্র বসনে নৃত্যে-গীতে মুখরিত। নির্ঝরের ঝংকার কমনীয় পৃথিবীর বুকে, সজীব গাছের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে যায়। তোমার সুখের পাখি তোমার সুখের অবগাহনে জেগে উঠে উড়তে শুরু করে দিয়েছে। বহন করে নিয়ে যায় প্রেমের মন্দিরে, সুখের মেলায়, শিশিরে ভেজা সিক্ত তৃণে তৃণে বসুন্ধরার বুকে। তোমার খুশীতে আমোদিত হয়ে গাছের প্রাণে এসেছে জোয়ার। পাতায়-ফুলে-ফলে সম্ভার হয়ে উঠছে। উপছে পড়েছে ধরণীর বুকে। আনন্দের বান ছুটে যায় বিশ্বব্যাপী মহামিলন তীর্থক্ষেত্রে।

ভালবাসায় প্রলুব্ধ করে তুমি আমার সারথি হয়ে ভালবাসার রথে চড়ালে। তোমার রূপের ছটায় যখন আমি তোমার চিন্তায় স্বপ্নময় জগতে চলে গেছি সেই সময় আমারই অলক্ষ্যে কুরুক্ষেত্রে কর্ণের রথের চাকার মতো দিলে পুঁতে। তখন তোমার নিঃস্বার্থ ত্যাগ আর অনুরাগ প্রেম নিঃশেষ হয়ে নিষ্ঠুর, নির্দয় ভাবটাই ফুটে উঠছে। তখন তুমি যেন এক ছদ্মবেশী যোদ্ধা। বিষাক্ত তীর দিয়ে পিঞ্জর ভেদ করলে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। মৃত্যুযন্ত্রনার উৎকট চীৎকার বের হয়ে এল আমার বুক বিদীর্ণ করে। সাজানো গোছানো হৃদয়-বাগান রক্তে ভেসে গেল। কৌরব সভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রাহরণের মতো আমার ভালবাসাকে নির্যাতিত করে দুর্যোধন-দুঃশাসনের মতো কপট হা-হা-শব্দে হাসলে তোমার প্রিয়জনদের সামনে। দ্রিুপের রক্ষণ ব্যূহ তৈরী করে ইন্দ্রিয়ের সপ্তরথী দিয়ে ঘিরে বীর শিশু অভিমন্যুর মতো আমার পরম ভালবাসাকে টেনে এনে নির্বিবাদে হত্যা করলে। যৌবনের মত আকাঙ্ক্ষাকে ধৈর্য্য প্রতীক্ষায় দাঁড় করিয়ে শবরীর মতো বার্ধক্যে টেনে আনলে। নীড় বাঁধার স্বপ্ন দেখিয়ে হাত ধরে নিয়ে গেলে তোমার বিলাসপূর্ণ ঘরে। তোমার নিরিড় সোহাগে আমি সুখের গভীরে ঢলে পড়লুম। তারপর কপটতার আশ্রয় নিয়ে, কৌরবদের কূট অভিসন্ধির মতো পঞ্চপাণ্ডবদের শয়ন করানো সেই জতুগৃহের মতো আগুন জ্বালিয়ে আমার অস্তিত্বকে তোমার হৃদয় থেকে ভস্মীভূত করে ফেলতে চাইলে। কিন্তু কেন? এইসব অভিসন্ধির তো প্রয়োজন নেই। কুমারী মা কুন্তীর মতো নবজাত শিশুর জন্ম দিয়ে সতীত্ব রক্ষার মতো আমার ভালবাসাকে যদি ভাসিয়ে দিতে চাও আমি অবাধে ভেসে যাব। বিশীর্ণ ফুলের মতো ঝরিয়ে দিতে চাও ঝরে যাব, অন্ধকারে নিক্ষেপ করতে চাও তলিয়ে যাব। আমি তোমায় ভালবাসি সেজন্য আমার কোন অভিযোগ নেই, দাবী নেই। আমার অধিকার তোমার ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখের উপরে।

স্বপ্ন আমার গেছে ভেঙে। শান্তির দূত থেকে থেকে গেল চলে। অবিশ্বাসী হয়ে উঠলুম তোমার চোখে। আমার চরিত্রের সাধুতা ও সততা সব হয়ে গেল তোমার কাছে ফাঁকি। যৌবনের ডাগর সেই দীপ্ত দুটি চোখ অন্ধ হয়ে গেল। আমার বিদ্যা ও বুদ্ধি লোপ পেতে শুরু করল। আনন্দের পাতাগুলো আস্তে আস্তে ঝরতে শুরু করেছে। হৃদয়শাখা রিক্ত, নিঃস্ব, উলঙ্গ। শুধু বের হয়ে আসে নীরব দীর্ঘশ্বাস।

আমার হৃদয়াকাশে আস্তে আস্তে মেঘ জমতে শুরু করেছে। আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন। বাতাসে ঝড়ের উন্মাদনা। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলক আর গুরু গুরু মেঘের গম্ভীর গর্জন। ঝির ঝির করে কেঁপে কেঁপে উঠছে অঙ্গের পাতাগুলো। বিভীষিকায় গা ছম ছম করছে। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি। আকাশ-পাতাল শুরু হয়েছে মন্থন। ভ্রূকুটি কুটিল দুর্যোগে পৃথিবীর

চির সৌন্দর্য্যের চিত্র আমার দৃষ্টিকোণে ম্লান হয়ে উঠছে।

অথচ বিগত রজনীতে পৃথিবীতে কি অপূর্ব মায়াজাল সৃষ্টি করেছিল। শুক্লপক্ষের চাঁদের আলোয় পৃথিবী শুভ্রবসনায় সুন্দরী রমনীর মতো অপরূপ হয়ে উঠছিল। গাছের পাতায় পাতায় তরল রূপালী ঝরণা। মিঠে মিঠে বাতাসে জানা-অজানা ফুলের গন্ধ ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। চির পুরাতনের পৃথিবী চির উজ্জল নব নব ধারায় শোভিত। নব যৌবনের অম্লান প্রতীক অবগুণ্ঠনহীন দাঁড়িয়ে থাকে। ঘুম ভাঙা রাতে এমন অপরূপ শোভা দেখতে দেখতে স্মৃতির মন্দিরে ঢুকে তোমার লাবণ্যে মাখা মিষ্টি মুখখানা দেখতে পেয়েছিলুম। যেন সদ্য ফোটা সতেজ, সুগন্ধ, সৌন্দর্য্যময় একগুচ্ছ রজনীগন্ধা।

আজ নতুন করে স্বপ্ন দেখে সুখ ভোগ করার প্রলোভন নেই। পৃথিবীর যত বন্ধন শিথিল হয়ে আসছে। বিরহ যন্ত্রণায়, দুঃখের বোঝায় আমার স্পন্দন থেমে আসছে। শিথিল শীর্ণকায় হাত দুখানা বার বার অস্থির হয়ে উঠছে আঁকড়ে ধরার জন্য জগতের চেনা বিশাল বুকখানা।

অস্তগামী সূর্যের ক্ষীণ রশ্মিধারা মেঘের আড়ালে মিশে গেছে। চাঁদের ক্ষীণ আলো, মিটি মিটি নক্ষত্রের আলো অন্ধকারের আবিলতায় বিলীন। ঝড়ের দাপটে পাতার আড়াল থেকে জোনাকিগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

হায়, সমস্ত প্রলোভন আর ভালবাসার বাইরে আমার মন ছুটে যাচ্ছে। সৃষ্টির এই জগতে সৃষ্টিময় মানব ও চেতন-প্রাণী বেঁচে আছে ভালবাসার টানে। প্রথম মানুষের মুখে যে ভাষা বের হয়ে এসে মানুষকে বেঁচে থাকার তীব্র প্রেরণা জুগিয়েছিল তা অমর, অম্লান, অবিনশ্বর।

তীব্র চীৎকার করে সেই অমৃত বাণী উচ্চারণ করতে উন্মুখ হয়ে উঠল আমার কণ্ঠ। কিন্তু আমি অজ্ঞান, আড়ষ্টে ডুবে যাচ্ছি। অনুভূতি লোপ পাচ্ছে। চেনা জগতের চির সৌন্দর্য্য আমার দৃষ্টিকোণে কালীমায় ভরে উঠছে। স্মরণশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে। জল পিপাসায় কাতর। মৃত্যুর বিভীষিকা জমাট অন্ধকার নিয়ে ছুটে আসছে।

তবুও একবার মৃত্যুর দরজায় পেঁছে যাবার আগে তোমায় আলিঙ্গন করতে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি কামনা করছি। একবার শুধু তোমার বুকে মুখ রেখে সেই আদি অনন্ত, বেদ উপনিষদ, রামায়ণ মহাভারত থেকে সেই যে চির-অমৃতবাণী মধুর মিলনের প্রথম সম্ভাষণ "আমি তোমায় ভালবাসি" বলতে চাই। ওগো প্রিয়তমা, ঝেড়ে ফেলে দাও মনের সমস্ত সংশয়, দূর করে দাও যত দ্বন্দ্ব আর ক্রোধ। মনটাকে করো সাগরের মতো উদার, ফুলের মতো দান আর অমলিন ভৈরবীর মতো ত্যাগী। যুগ যুগ ধরে শ্যামল সুস্নিগ্ধ বসুন্ধরায় বয়ে যাওয়া সেই চির জাজ্বল্যমান, চিরশাশ্বত অমর প্রেমকে স্বীকার করে একবার শুধু তোমার মধুর সুললিত সুরে বলো, "আমি তোমায় ভালবাসি! আমি তোমায় ভালবাসি!! আমি তোমায় ভালবাসি!!!"

ইতি

তোমার জানা অজানা ইচ্ছানুযায়ী

মুমূর্ষুগত

অসীম

টগর, দিব্যেন্দু, মিনতি ও আরো অনেকে

গৌরমোহন দাস দে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

"আজ একটা মজা হয়েছে। পার্টিতে গিয়ে আজ একটা মেয়ের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। মেয়েটী এম.এ পাশ—দেখতেও বেশ সুন্দরী। আসছে রবিবার তার ওখানে আমার নেমতন্ন। আমাদেরও একদিন তাকে আর তার ভাইকে নেমতন্ন না করলে ভাল দেখায় না। সেদিন কিন্তু তোমায় ভাল করে রেঁধে তাদের খাওয়াতে হবে। আগে থেকেই তোমায় বলে রাখলাম।"

টগরকে চুপ করে চলে যেতে দেখে সে বলে ওঠে, "তোমার আবার কি হ'ল? বাড়ীতে আবার কিছু হয়েছে নাকি?"

টগর মৃদু হেসে বললে, "না, কিছু হয় নি। আপনি আপনার ঘরে যান, অনেক রাত হয়েছে।" বলে সে নিজের ঘরে চলে গেল।

দিব্যেন্দু গুণ-গুণ করে গান গাইতে গাইতে ওপরে উঠতে থাকে। ঘরের মধ্যে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে টগর গুমরে গুমরে কেঁদে ওঠে। দিব্যেন্দু তাহলে তাকে ভালবাসে না? শুধু তার কাছ থেকে কাজ নেবার জন্যেই সে তাকে মিষ্টি কথায় ভোলায়? সে আর ভাবতে পারে না। বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করতে করতে ভোরের দিকে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

টগর মরণদাসকে টাকা পাঠাতে না চাইলেও মল্লিকসাহেব নিজে থেকে তার মাসিক পাঠানো টাকা বন্ধ করতে পারলেন না। মানি অর্ডারে যেমন টাকা পাঠাতেন তেমনি ভাবেই টাকাটা পাঠিয়ে দিলেন। টাকা পাঠানোর বারোদিন পরে মানি অর্ডার ফেরত এল। মরণদাস বলে কোন লোক ওখানে এখন থাকে না। তিনি বিডিওকে টেলিফোন করে জানতে পারলেন যে সে বাড়ীর চাবি তাঁর চাকরের হাতে দিয়ে বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গেছে তা তিনি জানেন না। মনে একটা ভয়ানক আঘাত যে সে পেয়েছে সেটা তিনি বুঝতে পারলেন।

টগরকে তিনি সে কথাটা জানিয়ে দিলেন। টগর ওঁর কথা শুনে কোন মন্তব্য না করে নিজের কাজে চলে গেল।

রমাপতি কথাটা বড় সাহেবের কাছে শুনে ওকে সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে বেশ অপমানিত হয়ে ফিরে এল।

মল্লিক সাহেব টগরের ব্যবহারে মনে খুব কষ্ট পেলেন। মরণদাসের বিবাগী হওয়ার কথা শুনেও টগরের মনে কোন রেখাপাত করলো না দেখে তিনি খুব মুসড়ে পড়লেন। স্বামীকে যে এইভাবে ত্যাগ করে দিতে পারে তাকে তো কোনমতেই বিশ্বাস করা যায় না। তিনি এখন বুঝতে পারছেন যে ঝি রাঁধুনির সঙ্গে এইভাবে মেলামেশা করাটা তাঁর উচিত হয় নি। দিব্যেন্দু ওকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে আগ্রহ দেখালো আর তিনিও তাকে উৎসাহভাবে লেখাপড়া শেখালেন। এখন একে নিয়ে তিনি কি করবেন তা চিন্তা করে কিছুই ঠিক করতে পারলেন না।

আজকাল কথায় কথায় টগর দিব্যেন্দুর ওপর রাগ করে। হঠাৎ একদিন একটা সামান্য কারণে দিব্যেন্দুকে সে বলে বসলো যে সে রাঁধতে পারবে না। সে যেন বাইরে থেকে কিনে কিছু খেয়ে নেয়। দিব্যেন্দু অবাক হয়ে যায়। মনে মনে ভাবে টগরকে একবার ডাক্তার দেখানো উচিত। অফিসে যাবার জন্যে সে যেই ব্যাগ হাতে করে রমাপতিকে গ্যারেজটা খুলতে বললে তখনই টগর ছুটে এসে হাতের ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে বললে, "ছোট সাহেবের আর রাগ করতে হবে না। খেতে বসুন। আমার রান্না অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। আজকাল লোকের বাড়ীতে, অফিসের ক্যানটিনে খেতে ভাল লাগে, না? অসুখ বিসুখ হলে তখন কে দেখবে?"

দিব্যেন্দু হাসতে হাসতে টেবিলে গিয়ে বসে পড়ে। কিছুক্ষণ বাদে টেবিলে সে খাবারগুলো গরম করে ওর সামনে ধরে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রমাপতি গ্যারেজের দরজা খুলে দিয়ে বাড়ীর মধ্যে এসে দেখে যে টগর ছোট সাহেবকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়াচ্ছে। সে একটু হেসে বাইরে চলে যায়। এই সময়ে হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে ওঠে। টগর তাড়াতাড়ি টেলিফোন তুলে একজন মেয়ের গলা শুনে ক্ষেপে উঠলো। সে রাগতভাবে জিজ্ঞাসা করে, "কাকে চান?" ওদিক থেকে কথা ভেসে আসে। টগর উত্তর দেয়, উনি এখন খেতে বসেছেন। ঘণ্টাখানেক পরে ফোন করবেন। "……কি বড্ড জরুরী? না, তিনি খেতে খেতে উঠতে পারবেন না।"

দিব্যেন্দু ওর টেলিফোনের উত্তর দেওয়া শুনে বুঝতে পারে যে তার অফিস থেকে হয়তো কেউ ফোন করছে। তাই সে একটু হেসে নিয়ে খেয়ে যেতে লাগলো। টগর যে এখন ভাল ভাবেই টেলিফোনে কথার উত্তর দিতে পারে সে তা বুঝতে পারে। সে ভাবে পূর্ব্বেকার টগর আর এখনকার টগরের অনেক তফাৎ।

টগর এদিকে টেলিফোনে কথা বলে চলেছে, "কি বলছেন? নাম বলবেন? বলতে পারেন। কিন্তু নাম বললেও ওঁনাকে খাওয়া ছেড়ে উঠতে দেওয়া হবে না। কি নাম বললেন? মিনতি বোস? আচ্ছা ওঁনাকে বলবো এখন।" বলেই টেলিফোনটা সে কেটে দিলে।

মিনতি-ফিনতি এ বাড়ীতে চলবে না। মিনতির নাম শুনে ওর গাটা রি রি করে ওঠে। ও ভাবে পার্টির সেই মেয়েটা হয়তো। ওর সব উত্তর দিব্যেন্দুর কানে গেছে। সে টেবিল ছেড়ে উঠে টগরকে টেলিফোনটা কাটতে বারণ করে। কিন্তু টগর ইচ্ছা করেই অনেকক্ষণ আগেই টেলিফোন কেটে দিয়েছে।

সে হাসতে হাসতে ওকে বলে, "আবার টেবিল ছেড়ে খেতে খেতে উঠে এসেছেন?"

"টেলিফোনটা কেটে দিলে?" হতাশার স্বরে সে কথা গুলো ওকে বললে।

"এখন খেয়ে নিয়ে অফিসে যান। মিনতি বোসের সঙ্গে পরে কথা কইলেও চলবে এখন।" মুচকি মুচকি হেসে টগর ওকে বললে।

ঈর্ষায় টগরের সমস্ত শরীরটা জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিল। দিব্যেন্দু ওর কথা শুনে বললে, "টেলিফোনটা কেটে দেওয়া তোমার উচিত হয়নি। মিনতির বাড়ীতে টেলিফোন নেই। বোধহয় সে কোন জরুরী কথার জন্যে আমায় অন্য জায়গা থেকে ফোন করছিল। যাকগে যা হবার হয়ে গেছে। ওর বাড়ীতেই আজ আবার আমায় ছুটতে হবে।"

"নিন বসে পড়ুন। খাবারগুলো সব পড়ে রয়েছে।"

"না আমি অফিসে চল্লুম। আমার আসতে রাত হবে বাবাকে বলে দিও।"

"তা হয় না। পাতে অতগুলো লুচি পড়ে আছে। অফিসে গিয়েই তো আবার খিদে পাবে। তখন খিদের জ্বালায় হয়তো কারো মাথা চিবোবেন।"

"এবার তোমার মাথাটা মুখের মধ্যে পুরে চিবুবো। তখন বুঝতে পারবে।" দিব্যেন্দু খুব রাগতভাবে কথাগুলো বললে। টগর হাসতে হাসতে মাথাটা ওর মুখের কাছে বাড়িয়ে বললে, "চিবিয়ে ফেলুন, তাহলে আমিও বাঁচি।"

দিব্যেন্দু বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে, "যত সব পাগলকে ধরে এনে কাজ করানো হচ্ছে।" বলে সে চলে গেল।

টগর নিজের মনেই গজরাতে থাকে, "মিনতি-ফিনতির এ বাড়ীতে আসা চলবে না।"

লেখাপড়া শেখার পরেই টগরের মনে হতো সমস্ত বাড়ীটার কর্ত্তৃত্বটা সে নিজের হাতে নিয়ে নেবে তারপর দিব্যেন্দু—।

একে একে সংসারের সব কর্ত্তৃত্বটা সে নিয়েছিল। ও কিন্তু দিব্যেন্দুকে নিতে পারে নি। তাই সে ক্ষোভে আর ঈর্ষায় মনে মনে জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছিল। সেদিনের টেলিফোনের ব্যাপারটায় দিব্যেন্দু ওর ওপর খুব বিরক্ত হয়েছিল। তারপর ওকে বেশ একটু বিস্মিতও করেছিল। তবে কি টগর তাকে মনে মনে ভালবেসে ফেলেছে? এটা যে কত অবান্তর সেটা টগরের জানা উচিত ছিল। মিনতির নাম শুনেই বোধহয় সে ঈর্ষা তা হয়ে উঠেছে। ও বোধহয় চায় না যে অন্য কোন স্ত্রীলোক এ বাড়ীতে ঢোকে। তাই সে

টগরের কাছ থেকে বেশ একটু দূরে সরে যেতে থাকে। ছেলের বউ শাশুড়ীর কর্তৃত্ব চায় না। শাশুড়ীও চায় না বউ এসে তাঁর সংসারে কর্তৃত্ব করে। বাড়ীর ঝি-রাঁধুনিও যে সংসারের কর্তৃত্ব নিয়ে মারামারি করবে এটা তার জানা ছিল না। যাই হোক, দিব্যেন্দু স্থির করল যে এরপর থেকে তাকে একটু বেশ সতর্ক হতে হবে। তা না হলে মিনতিকে ঘরে আনলেই সংসারে একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটতে পারে। তাই পরের দিন টগরকে ডেকে সে জানিয়ে দিলে যে যে কেউ যে কোন সময়ে তাকে ফোন করলে তাকে যেন সে ডেকে দেয়। টগর ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিয়েছিল।

মাস কয়েক পরেই দিব্যেন্দু মিনতিকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এলো। একমাত্র ছেলের বিয়েতে মল্লিক সাহেব প্রচুর খরচ করলেন। বিয়ের কয়েকদিন আগে তিনি মরণ-দাসের খোঁজে রমাপতিকে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না। টগর এই উৎসবে খুবই খাটলো। মুখে হাসি ফুটিয়ে মিনতিকে সে-ই বরণ করে ঘরে তুললো। নতুন বৌকে দেখে ভেতরে ভেতরে জলতে থাকলেও সে সব সময়ে হাসিমুখে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। মুখ বুজে নতুন বউএর যত্ন করতে লাগলো। বাড়ীর গিন্নির মতন সে সকলকে আপ্যায়ন করতে থাকে। দূরের লোকেরা টগরের প্রকৃত পরিচয় জানেন না। তাঁরা মনে করতে থাকেন টগর বোধহয় এঁদেরই সংসারের একজন। তাঁরা সকলেই এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। টগর মিনতিকে বৌদি বলে ডাকে। সে এখন দেখতে পায় যে মল্লিক সাহেব আজকাল তাকে বেশ এড়িয়ে চলেন। অনেক সময় তিনি মিনতির সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

দিব্যেন্দু মিনতিকে কথায় কথায় একদিন টগরের ইতিহাস খুলে বলে। সব কাহিনী শুনে সে খুব সতর্ক হয়ে যায়। সেও প্রথমে মনে করেছিল যে টগর হয়ত এদের কোন আত্মীয় হবে। তা না হলে ওদের সংসারে সে এত কর্তৃত্ব করতে পারবে কেন? মিনতি সব কিছু দেখে-শুনে বুঝতে পারে যে তার কাছ থেকে সংসারের কর্তৃত্ব সহজে ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না।

মাস তিনেক এই ভাবেই কেটে গেল। টগরের গিন্নি-পনার জ্বালায় মিনতি অস্থির হয়ে উঠলো। সবতাতেই টগর তাকে উপদেশ বর্ষণ করতে সুরু করে। ঘরে বিধবা ননদ থাকলে যেমন হয় সেই রকম হতে থাকে। সে তার স্বামী ও শ্বশুরকে তার বিরুদ্ধে বলতে কিছু সাহস করে না। ওঁদের কিছু না বলে সে ধীরে ধীরে সংসারের এক একটা ভার ক্রমে ক্রমে তার কাছ থেকে একরকম ছিনিয়ে নিতে লাগলো। টগর সহজে ছাড়তে চায় না। পরে বাধ্য হয়েই তাকে ছাড়তে হয়। সে জানে যে মিনতি এ বাড়ীর বউ। আর মিনতি জানে যে টগর ওদের কোন আত্মীয়া নয়। সে ওদের বাড়ীর রাঁধুনী। তাকে সে সমীহ করতে যাবে কেন? তবে তাদের এই ছন্নছাড়া সংসারকে টগর এতদিন ধরে রক্ষা করে এসেছে বলে সে তার কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করতে পারে তবে তার হাতে এখন সব কর্তৃত্ব দেওয়া চলে না। দিব্যেন্দু ও মল্লিক সাহেবের মত হল যে মিনতি যেন টগরের মনে কোন কষ্ট না দেয়। যেভাবে সে সংসার চালাচ্ছে সেই ভাবেই তাকে যেন চালাতে দেওয়া হয়। নতুন বউ মিনতির মনে বেশ লাগে। একটা রাঁধুনীর কাছে তাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে? সে বুঝতে পারে যে টগরকে ওঁরা ওঁদের সংসারের একজন বলেই ধরে নিয়েছেন। তাহলেও সংসারের সমস্ত কর্তৃত্বটা একটা বাইরের লোকের হাতে সেচ্ছায় ছেড়ে দেওয়াটা মোটেই যুক্তি-সঙ্গত নয় বলেই তার মনে হতে থাকে। টগর বাড়ীর কাজ নিয়ে থাকুক। তবে তার কথা তাকে শুনতে হবে, মানতে হবে। অনেক সময় ও দেখল—টগর ওর কথা মানতেও চায় না, শুনতেও চায় না। ওকেই সে উপদেশ দিতে আসে আর কি করতে হবে আর কি করতে হবে না তা জানিয়ে দেয়। মিনতি তা কখনও সহ্য করবে না।

প্রথম প্রথম ফোন বেজে উঠলেই টগর ছুটে গিয়ে ফোন ধরে ওদিকের সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ কথা বলে তবে মিনতি-কে ফোনটা ছেড়ে দেয়। মিনতি অনেক সময় ফোন ধরতে ছুটে যায় কিন্তু টগর আগেভাগে গিয়ে ফোন ধরে কথা বলে। মিনতির কাছে বেশ অসহ্য লাগে। সে খুব অপমানিত বোধ করে। দিব্যেন্দুকে বিয়ে করে কি তাহলে

এইভাবে তাকে জীবন কাটাতে হবে? একটা ঝিয়ের কাছে তাকে ওঠাবসা করতে হবে? সে একদিন টগরকে কঠোর-ভাবেই বললে যে সে যেন আর ফোন না তোলে। টগর এই প্রথম একটা ভয়ানক আঘাত পেলে।

দুপুরে প্রত্যহই টগর বসবার ঘরে গিয়ে সিলিং ফ্যান চালিয়ে দিয়ে সোফায় বসে রেডিও খুলে গান শুনতে শুনতে একটা উপন্যাস হাতে নিয়ে বসে। মিনতি রোজই দেখে। স্বামীকে সে অনেকবারই এ কথাটা জানিয়েও কোন ফল হয়নি। দিব্যেন্দু টগরকে পাগল বলে তাকে শান্ত হতে বলে। টগর যদি চলে যায় তাহলে তাদের সংসারে একটা বিশৃঙ্খলা হয়ে উঠবে এই বলে সে তাকে বোঝায়। মিনতি আর সহ্য করতে পারে না। একদিন সে রমাপতি-কে বল রেডিওটা তার ঘরে দিয়ে আসতে বললে। রমাপতি রেডিওটা বসবার ঘর থেকে ছোট সাহেবের ঘরে রেখে এল। দিব্যেন্দু এবার বুঝতে পারে মিনতি টগরকে আর সহ্য করতে পারছে না। আগে আগে বাড়ীতে কেউ এলে টগরই তাঁদের অভ্যর্থনা করে বসাতো। এবার থেকে মিনতি টগরকে অভ্যর্থনা করতে বারণ করে দিলে। টগর এখন বেশ বুঝতে পারছে যে সংসারে একটা বিরাট ভূমিকম্প সুরু হয়ে গেছে। তার পা থেকে মাটি যেন ধীরে ধীরে খসে যেতে চলেছে। রাগে ও ক্ষোভে সে গুম হয়ে যায়। আগে দিব্যেন্দুর ঘরে গিয়ে তার সব কিছু কাজ সে করে আসতো। এখন আর ওর ঘরে ঢোকবার তার অধিকার নেই। মিনতি একলা হাতেই সব করে। একদিন দিব্যেন্দু ওকে একটা কাজের জন্যে "ঊষা" বলে ডাকতে মিনতি তাকে একটা ধমক দিয়ে বলে ওঠে, "ঊষা আবার কে? ওকে টগর বলে ডাকবে। আর তোমার যা দরকার আমায় বলবে, আমিই সে কাজ করে দেব। ওকে ডাকবে না।"

দিব্যেন্দু ওকে বোঝাতে চায় কিন্তু মিনতি বুঝতে চায় না। সে ভাবে টগরকে কি তার স্বামী ভালবাসে? তা না হলে সে কেন সব সময় তার হয়ে তার কাছে ওকালতি করতে আসে। মিনতি এদের বাড়ীতে প্রথম ঢুকেই দেখে যে টগর খাবার সময় তার স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার স্বামীকে প্রায় জোর করেই এটা ওটা খাওয়ায়। দিব্যেন্দু না বললেও তার রক্ষা নেই, তাকে খেতেই হয়। এটাও তার কাছে বেশ অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

নতুন বউ হয়ে এসে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বামীর খাওয়া দেখতো। কিছু বলতে পারতো না। কিন্তু কিছুদিন যাবার পরই সে মিষ্টি করে টগরকে খাবার দিয়ে চলে যেতে বলেছিল। সে নিজেই তার স্বামীর কাছে দাঁড়িয়ে খাওয়াবে। সেই থেকে টগর টেবিলে খাবার ধরে দিয়ে চলে যায় আর মিনতি তখন তার স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে তাকে নিজে হাতে খাওয়াতে লাগলো। আগে কি কি রান্না হবে টগরই সব নিজের মনে রাঁধতো। এখন কিন্তু মিনতির কাছ থেকে কি কি রান্না হবে জেনে নিয়ে তবে তাকে রাঁধতে হয়। টগর এ অপমান আর সহ্য করতে পারছিল না। তবুও তাকে বাধ্য হয়েই সহ্য করতে হচ্ছিল। তার এখন আর কোন উপায় নেই। এখন সে বুঝতে পারে তার এই ভালবাসার মোহ ও কর্ত্তৃত্বের মোহই তাকে অনেক নীচে নামিয়ে নিয়ে গেছে। এখন সে বুঝতে পারে স্বামীর ঘরই স্ত্রীর উপযুক্ত স্থান।

মিনতি দেখলে ওর শ্বশুর স্বামী দুজনেই টগরের ওপর নির্ভর করে আসছেন বলেই আজ তার সংসারের এই অবস্থা। টগরের ওপর ততটা রাগ নেই যতটা রাগ ওঁদের দুজনের ওপর। ওঁরা তো ইচ্ছে করলেই টগরকে এককথায় বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বলতে পারেন।

এদিকে টগর যেমন মিনতির ব্যবহারে ভেতরে ভেতরে জ্বলছে ওদিকে তেমনি মিনতি ওর স্বামীর আর শ্বশুরের ব্যবহারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। টগরকে সে বেশী দোষ দেয় না। সে দোষ দেয় ওঁদের দুজনকে। যদি ওঁরা টগরকে নিয়েই দুজনে মেতে ওঠেন তবে কষ্ট দেবার জন্যে কেন তাকে ঘরে এনে তোলা হল?

সেদিন মিনতির কি হ'ল, সেই জানে না। টগর তার স্বামীর কি একটা কথায় হেসে উঠেছিল। দিব্যেন্দুও সেই হাসিতে যোগ দিয়েছিল। মিনতি হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হয় ও ওদের হাসিটা তার চোখে পড়ে যায়। তাতেই তার মাথা খারাপ হয়ে গেল। সে তক্ষুণি হাসির কারণটা না বুঝেশুনে টগরের সামনে এসে বললো, "রান্নাঘরে রাঁধুনীর কাজ। সেইখানেই তার কাজ করা উচিত বলেই আমার মনে হয়। আমাদের মধ্যে এসে আর নাক গলাবে না।

যদি এখানে ভালভাবে থাকতে চাও থাকবে। আর না থাকতে চাও দরজা খোলা আছে, সটান বার হয়ে যাবে। তোমার যা কিছু পাওনা-গণ্ডা আমিই না হয় মিটিয়ে দেব।"

মিনতির রূঢ় ব্যবহারে টগর ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে। তারপর সে ধীরে ধীরে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো। দিব্যেন্দু মিনতির কথায় খুব অবাক হয়ে গেল। সে শান্তভাবে তাকে বললে, "তুমি কেন অমন রূঢ় কথাগুলো ওকে বললে মিনতি। ও তো অন্যায়ভাবে আমার সঙ্গে হাসাহাসি করে নি। সব কথা বুঝে-শুনে তবে কথা বলা উচিত ছিল তোমার। একটা সামান্য কারণে ওকে তোমার এত বড় আঘাত দেওয়া উচিত হয় নি,"

নিজের স্বামী টগরকে প্রশ্রয় দিচ্ছে? মিনতি স্বামীর দিকে একবার চেয়ে বললে, "টগরকে নিয়ে তোমরাই থাকো। আমি কালই এখান থেকে বিদায় নেব।"

"কি যে পাগলামি করছো মিনতি আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। যাই হোক একটু মাথা ঠাণ্ডা করে বুঝতে চেষ্টা করবে। অফিসের দেরী হয়ে যাচ্ছে, আমি চল্লাম," বলে দিব্যেন্দু বেরিয়ে যায়।

এত বড় একটা অপমান সহ্য করেও যে আর এখানে থাকা যায় না টগর সেটা বুঝতে পারলো। কিন্তু কোথায় সে যাবে? স্বামী বাড়ী ছাড়া। তারই অন্যায়ের জন্যে সে আজ বিবাগী। তবে তার একটা বদ্ধ ধারণা আছে যে বড় সাহেব তাকে ছাড়বেন না। সব কথা শুনলে বড় সাহেব মিনতির নিশ্চয়ই দোষ ধরবেন। অন্যায় তিনি কখনও সহ্য করেন না সে তা জানে।

মল্লিক সাহেব বাড়ীতে এসে চা খেয়ে তাঁর ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। টগর সেখানে গিয়ে মিনতির সমস্ত ব্যবহার তাঁকে খুলে বলে কাঁদতে কাঁদতে বললো, "এরপর তো এখানে আর আমার থাকা যায় না। স্বামী বিবাগী হয়ে কোথাও ঘুরছে। আমাকে আমার বাবা-মার কাছেই ফিরে যেতে হবে।"

টগর মনে করেছিল ওকে তিনি সান্ত্বনা দেবেন। মিনতির সঙ্গে ওর একটা আপোসের চেষ্টা করবেন। যে ভাবে সে সংসারে কর্ত্তৃত্ব করে আসছিল সেই ভাবেই সে কর্ত্তৃত্ব করে যাবে। কিন্তু মল্লিক সাহেব মিটমাটের মধ্যে গেলেন না। তিনি শান্ত ভাবেই বললেন, "যদি তোমার মিনতির সঙ্গে বনিবনা না হয় তাহলে তুমি যা স্থির করেছ সেটাই ঠিক হবে। তুমি যেদিন বলবে সেদিনই আমি তোমার যাবার সব বন্দোবস্ত করে দেব। তোমার যা কিছু পাওনা আছে তা পাবে। আর এত বছর আমার কাছে রয়েছ তার জন্যে তোমায় আমি ছ'মাসের মাইনেও দিয়ে দেব।"

টগর ওঁর কথাগুলো শুনে ধীরে ধীরে নিজের ঘরে এসে বিছানায় পড়ে কেঁদে ফেললে। যাদের জন্যে সে কটা বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছে, যাদের জন্যে সে তার সুখ দুঃখ সব বিসর্জ্জন করেছে; যাদের জন্যে সে তার স্বামীর সঙ্গে পর্য্যন্ত অসৎ ব্যবহার করেছে তারা কিনা তার প্রতি একটুও কৃতজ্ঞ নয়? দু'দিনেই তারা তাকে একেবারে ভুলে গেল! মুখ বুজে বাড়ীর সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে সংসারের সমস্ত কাজ করে সে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। সে রাত্রে আর সে কিছুই মুখে দিতে পারলো না। সারা রাত্রিটা তার চোখের জলে শেষ হ'ল।

পরের দিন ভোর বেলায় একজন ভিখিরী এসে ওদের দরজায় মায়ের নাম কীর্ত্তন করতে থাকে। সেদিন ছিল রবিবার। টগর শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এখনও ঘুমে অচেতন। দিব্যেন্দু ও মিনতিও বিছানা ছেড়ে ওঠে নি। রমাপতি নিজের ঘরে শুয়ে। মল্লিক সাহেব বাগানে বসে বসে গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়ে খুঁড়ে জল ঢালছিলেন। মায়ের নাম শুনেই তিনি চমকে উঠলেন। এতো মরণদাসের গলা। মরণদাস কি তবে ফিরে এসেছে? দরজা খুলতেই মরণদাসকে গাইতে দেখলো। মুখে মৃদু মৃদু হাসি, হাতে তার সেই পুরোণো একতারাটা। ওর স্বাস্থ্যটা আগের থেকে ভাল হয়েছে। গলার স্বরও খুব মিষ্টি হয়েছে। আগেকার কর্কশ স্বরটা আর নেই। কাছে যেতেই মরণদাস তাঁকে নীচু হয়ে প্রণাম করে বললে, "ভাল আছেন সাহেব? সকলের মঙ্গল তো?"

"হ্যাঁ সব ভাল, চল ঘরে বসবে চল।"

"না সাহেব, আজ আর বাড়ীর ভেতর যাচ্ছি না। টগরের জন্যে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল তাই একবার তাকে

দেখতে এলাম। ওকে নিয়ে যাবো না সাহেব। ও আপনাদের কাছেই থাক। আমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ওর অনেক কষ্ট গেছে এবার ও একটু সুখের মুখ দেখেছে। ঈশ্বরের কাছে আমি প্রার্থনা করি। ও সুখী হোক। টগরকে একবার ডেকে দেবেন? ওকে একবার দেখেই আমি চলে যাব।"

মল্লিক সাহেব ওর উচ্ছ্বাসকে দমন করতে ইচ্ছা করলেন না। ও বলে গেল। তিনি চুপ করে শুনে গেলেন। ওর বলা হয়ে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এতদিন তুমি কোথায় ছিলে বল? তোমাকে খুঁজে খুঁজে আমি হয়রান হয়ে গেছি। তোমার বাড়ীতে রমাপতিকে পর্য্যন্ত পাঠিয়েছি। কেউ তোমার কথা বলতে পারে নি।"

"আমি এদিকে ছিলাম না কর্ত্তা। ভারতের অনেক তীর্থ ঘুরে ঘুরে হালিশহরে রামপ্রসাদের ভিটেতে শেষ পর্য্যন্ত আশ্রয় পাই। মা-ই আমার স্বপ্নে দেখা দিয়ে ওখানে যেতে বলেছিলেন। সেখানেই আমি এতদিন ছিলাম সাহেব।"

"কেন তুমি সংসার ছাড়লে? টগর ছেলেমানুষ, দোষ না হয় করেছিল, তা বলে বিবাগী হতে হবে?"

"না সাহেব, টগর আমার চৈতন্য খুলে দিয়েছিল। তা না হলে মায়ের দর্শন পেতাম না। আমি এতদিন ধরে যাকে খুঁজছিলাম তাকে আমি পেয়েছি। তাকে আমি নিজের চোখ দুটো দিয়ে দেখেছি।"

মল্লিক সাহেব তার কথা শুনে অবাক হয়ে বললেন, "তাকে নিজের চোখে দেখতে পেলে?"

মরণদাসের দুচোখ বেয়ে জল গড়াতে থাকে। সে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "তাকে আমি পেয়েছি সাহেব। তাকে আমি দেখেছি। মায়ের কি রূপ, নিজের চোখে না দেখলে কাকেও বোঝানো যায় না। একটু ডাকলে তাকে পাওয়া যায় সাহেব। আপনি ডাকুন, আপনিও পাবেন।"

"কি সব আবোল তাবোল কথা বলছো মরণদাস। তুমি পাগল হয়ে গেছো। তাকে কি কেউ দেখতে পায়?"

"একবার ওখানে গিয়ে মাকে ডাকার মতন মনে মনে ডাকুন। দেখবেন মা সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।"

"আমি তো ওখানে কতবার গিয়েছি।"

"আপনি গেছেন বেড়াতে, মামলার তদারকি করতে। তাই তাকে দেখতে পাননি। সাহেব, যে দেখতে জানে সে দেখতে পায়।"

"তুমি একেবারে পাগল হয়ে গেছ মনণদাস। টগরকে ডেকে দিচ্ছি। তুমি তার আগে আমায় একটা গান শোনাও।"

"বেশ গাইছি, শুনুন—

দে-মা আমায় কাঙাল করে
তোর স্নেহের ছায়ায় বসিয়ে রেখে
করলি আমায় মা তুই একাঘরে।
কেউ আসে না আমার কাছে
মুখ ফিরিয়ে সরে আছে
ডাকলে পরে দেয় না সাড়া
টিট্‌কারী তারা দেয় গো মোরে॥
দেমা আমায় কাঙাল করে॥
একলা আমায় রাখলে দূরে
জগতটা যে পড়বে সরে
বলবে তারা যা তা তোকে
তখন সইবি কেমন করে?
দেমা আমায় কাঙাল করে॥
ছড়িয়ে দে তোর ভালবাসা
যারা তোর করে আশা
তোর তরে যে কেঁদে কেঁদে
ওদের জীবন কাটে॥
দেমা আমায় কাঙাল করে॥
চাইনি আমি থাকতে একা
নাই বা পেলাম তোরি দেখা
ওদের সাথে ভিড়বো আমি
ঘুরবো পথে ঘাটে।
দেমা আমায় কাঙাল করে॥
ওদের ভালবাসলে পরে
ফিরবো আবার তোরি তরে
সবার সাথে আসবো আবার
দেখবো তোকে প্রাণ ভরে।
দেমা আমায় কাঙাল করে॥

মনথ দাসের কণ্ঠে বেজে উঠে থেমে গেল মায়ের নাম-গান। মল্লিক সাহেব তন্ময় হয়ে এতক্ষণ ধরে গান শুনছিলেন। গান থেমে যেতে তাঁর চমক ভাঙলো। মুগ্ধ কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, "কি মধুর নাম তুমি শোনালে মরণদাস, অনেকদিন ধরে এ গান আমার মনে স্মৃতি হয়ে থাকবে। আমি টগরকে এখুনি ডেকে দিচ্ছি।"

টগর বিছানা থেকে উঠে উঠোন ঝাঁট দেবার জন্যে ঝাঁটা হাতে নিয়ে উঠোনে নামতেই মরণদাসের গলা শুনতে পেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। গান শেষ হয়ে যেতেই সে একরকম ছুটতে ছুটতে এসে মরণদাসের পায়ের ওপর পড়ে কাঁদতে থাকে।

টগর, ওঠো ওঠো, তোমার জন্যে খুব মন কেমন করছিল বলে একবার দেখতে এসেছি। কেঁদো না তুমি। তোমাকে আমি নিয়ে যাব না। এখানেই তুমি থাকবে।" টগরকে হাত ধরে সে তোলে। টগর ওর কাঁধে মাথা রেখে বললে, "এবার আমায় তোমার সঙ্গে নিয়ে চল। তোমার ওপর সেদিন আমি যে অন্যায় করেছিলাম তার জন্যে আমায় আজ ক্ষমা করো।"

"অন্যায় কিছুই তুমি করো নি টগর। আমাকে তুমি ধন্য করেছিলে। তা না হলে মাকে আমি পেতাম না। আমার সঙ্গে তো তোমার কোথাও যাওয়া চলবে না টগর, আমার ঘর-বাড়ী-অর্থ কিছুই নেই। দোরে দোরে ভিক্ষে করেই আমার দিন চলে। তোমায় আমি কোথায় রাখবো, কি খেতে দেবো?"

না আমি এখানে আর থাকবো না গো। আমি তোমার সঙ্গেই যাবো। তুমি যেখানে নিয়ে যাবে আমি সেখানেই যাবো। তুমিই আমার আশ্রয়। আমি আর কিছুই চাই না।"

"কিন্তু তোমার এ বেশে আমি কি করে তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাবো?"

"আমি আসছি। তুমি একটু দাঁড়াও।" বলে সে বাড়ীর ভেতর চলে গেল।

"টগরকে কি কেউ অপমান করেছে সাহেব। তাই বোধহয় অভিমানে আমার সঙ্গে চলেছে।"

মল্লিক সাহেব বললেন, "লেখাপড়া শিখিয়ে মনে করেছিলাম টগর একদিন মানুষের মতন মানুষ হবে। কিন্তু ও হতে পারলো না। ওর মনে একটু অহঙ্কার ও ঈর্ষা এসেছিল। তাই সেদিন তোমাকে ও অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সে সংসারের কর্তৃত্ব নিয়ে পাগলের মত হয়ে উঠেছিল। তাই আমি ওর ওপর বেশ বিরূপ ভাব দেখাতাম—যাতে সে বুঝতে পারে যে সে যা করছে তা সবটাই অন্যায়। এ পত্র তাকে সৎ হবার জন্যেই আমি ওর সঙ্গে বেশ কয়েক মাস ভাল ব্যবহার করি নি। তবে তুমি নিশ্চিত জেনো যে ওকে আমি মেয়ের মতন ভালবাসি। তাই, আজো সেই ভাবেই তাকে ভালবাসি।"

কিছুক্ষণ পরে টগর তার সেই পুরোনো ছোপানো শাড়ীটা বাক্সের ভেতর থেকে বার করে পরে খালি পায়ে বেরিয়ে আসতেই দিব্যেন্দু ও মিনতির সামনে পড়লো। দিব্যেন্দু জিজ্ঞাসা করলো, "কোথায় চললে এ বেশে?"

"আমি চলে যাচ্ছি ছোট সাহেব। আমার স্বামী আমায় নিতে এসেছে। চলি বৌদি। আর হয় তো আমাদের দেখা নাও হতে পারে। যদি কোন দোষ করে থাকি আমায় ক্ষমা করো বৌদি।" বলে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। দিব্যেন্দু মিনতির চোখে জল দেখতে পেল। মিনতি তাড়াতাড়ি কাপড়ের খুঁট দিয়ে জলটা মুছে ফেললে। মল্লিক সাহেব বাড়ীর ভেতরে গিয়ে কিছু টাকা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন। টগর তাঁকে প্রণাম করে বললো, "চলি সাহেব।"

মল্লিক সাহেব ওর হাতে কয়েক খানা নোট দিয়ে বললেন "টগর তোমার টাকা কটা নিয়ে যাও। আমায় আর ঋণী করে রেখো না।"

"এত টাকা তো আমার পাওনা নয় সাহেব।"

"বাপ তার মেয়েকে দিচ্ছে, নিতে হবে বৈকি মা।"

"বাবা।"

"টগর, চল তোমাদের এগিয়ে দিয়ে আসি। অনেক রুঢ় ভাষা হয়ত তোমাকে বলেছি। সব ভুলে যেও মা।"

টগর চোখ মুছতে মুছতে মরণদাসের হাত ধরে বেরিয়ে এলো।

মরণদাস তখন মল্লিক সাহেবকে বললো, "এবার আমরা আসি সাহেব।"

"এসো।" মল্লিক সাহেবের তখন চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে।

রহস্যাবৃত মঙ্গলগ্রহ

সন্তোষকুমার দে

চন্দ্রবিজয়ের পর থেকেই বিজ্ঞানীরা মঙ্গল গ্রহের রহস্য ভেদ করতে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন। চন্দ্রে অবতরণের মত মঙ্গল গ্রহে মানুষ এখনও অবতরণ করতে পারেনি; তবে অদূর ভবিষ্যতে যে পারবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে মানুষের এত আগ্রহের কারণ একটা হল, মঙ্গল ও শুক্র গ্রহের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে পৃথিবীর গতি-প্রকৃতি তুলনামূলকভাবে আলোচনা করতে পারলে ও তাদের খুঁটিনাটি সব জানতে পারলে, পৃথিবীর আবহতত্ত্বের গূঢ় তথ্য অনেকটা জানা যাবে এবং তার ফলে, প্রতিদিনের এবং কয়েক মাস আগেরও পৃথিবীর আবহাওয়া নির্ভুলভাবে আগে থেকে বলা সম্ভব হতে পারে।

অবশ্য মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে মানুষের আগ্রহ আজ নতুন নয়। ১৬৫৯ সালে গ্যালেলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। জানতে পেরেছিলেন, মঙ্গলে সাড়ে ২৪ ঘণ্টায় দিনরাত্রি হয় এবং পৃথিবীর মতই বছরে বছরে ঋতুর পরিবর্তন হয়। এর একশ' চোদ্দ বছর পরে স্যার উইলিয়ম হার্সেল আরও কিছু অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করেন। ১৮৭৭ সালে G. V. Schiaparelli নামে আর একজন বিজ্ঞানী মঙ্গল গ্রহের প্রথম বিশ্বাসযোগ্য মানচিত্র তৈরি করেন এবং মঙ্গল গ্রহে কতকগুলো লম্বা লম্বা লাইনের মত চিহ্ন দেখে বলেছিলেন ওগুলো হল খালের বা নদীর চিহ্ন। আরিসেবোয় যে সর্ব-বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি আছে তার সাহায্যে জানা যায় মঙ্গলের রং কমলা লেবুর মত আর সমস্ত গ্রহটিতে মাঝে মাঝে সবুজ ও নীল রংয়ের ছোপও আছে। ১৮৯৪ সালে আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী Pereival Lowell এক-খানি মানচিত্র তৈরি করেন। তিনি ঐ মানচিত্রে অনেক-গুলো খাল দেখান। এখন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মঙ্গল গ্রহে খালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান। তাঁরা কোন খাল দেখতে পান নি, বলেছেন এটা দৃষ্টিবিভ্রম মাত্র। এরপর মহাকাশ যুগ আরম্ভ হলে ১৪ই জুলাই, ১৯৬৫ সালে ম্যারিনার৪ নামে একটি ছোট মনুষ্যহীন মহাকাশ যান কেপ কেনেডি থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই যানটি সাড়ে সাত মাসে মঙ্গলগ্রহের ৬,১১৮ মাইলের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়ে অনেকগুলো আলোকচিত্র পৃথিবীতে পাঠায় এবং গ্রহটির চৌম্বক ক্ষেত্র ও আলোক বিকিরণ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করে এবং কিছু মহাজাগতিক ধূলিকণাও (cosmic dust) সংগ্রহ করে। ৭০টির বেশি আগ্নেয়গিরির মুখের হদিস মেলে। আগে যে রেখাগুলোকে খালবিল বলে মনে করা হয়েছিল, এবার তার কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না আর শুষ্ক নদী, হ্রদ বা সমুদ্র প্রভৃতিরও কোন হদিস মিললো না। জানা গেল ওখানে কার-বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অনেক বেশি, বাতাস খুব পাতলা, বায়ুমণ্ডল ও আইশ্নোস্ফিয়ার অপেক্ষাকৃত কম ঘন বলে মনে হয়। আর সেখানে যে কোন জীবন্ত প্রাণী কখনো থাকতে পারে বলে তা মনে হয় না। তারপর মেরিনার-৫ এবং সোভিয়েট ভেনেরা-৪ মঙ্গলের কক্ষ-পথে এসে জানতে পারে গ্রহটি কারবন ডাই-অক্সাইডে পরি-পূর্ণ এবং সেখানকার ভূপৃষ্ঠের চাপ পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের চাপের চেয়ে কুড়িগুণ বেশি।

এরপর ১৯৬৯ সালে আবার যুগ্ম মহাকাশ যান মেরিণার-৬ ও ৭ পাঠানো হল মঙ্গল গ্রহের আরও কাছে। মেরিণার-৬ অবিশ্রান্তভাবে ছুটে ১৫৬ দিনে ৩৮ কোটি ৮০ লক্ষ কি, মি, পথ অতিক্রম করে ৩১শে জুলাই ১৯৬৯ সালে মঙ্গল গ্রহের নিরক্ষ বৃত্তের ৩,২০০ কি, মি,—এর মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছিল। পথের নিশানা পেয়ে তারপর যাত্রা

করল মেরিণার-৭। তার লাগল অপেক্ষাকৃত কম সময়। ১৩০ দিন অবিশ্রান্ত ছুটে সে ৩১ কোটি ৫০ লক্ষ কি, মি, পথ অতিক্রমকরে মঙ্গল গ্রহের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে ৫ই আগষ্ট ১৯৬৯ সালে পেঁছিল। তারা সংবেদনশীল ক্যামেরার সাহায্যে ১৯৮টি আলোকচিত্র নিলো এবং সেখানকার আবহাওয়া ও তাপমাত্রার পরিমাণ সংগ্রহ করল। এখানকার আবহাওয়ায় জলের পরিমাণ এত কম যে সেখানে কোন প্রাণীর বেঁচে থাকা সম্ভব নয় বলে জানা গেল ; তবে অতি সরল জীবনের প্রাণী—জীবাণুর মত (bacteria-like) কিংবা Lichen-like প্রাণী থাকলেও থাকতে পারে। গ্রহের তাপমাত্রা জানা গেছে,—৬৩ থেকে +৭৭ দিনের বেলায় আর রাতে—৬৩ থেকে—১৫৩ মঙ্গল গ্রহের দুই মেরুর দুই স্থানের আলোকচিত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করে মহাকাশ সংস্থার মনে হয়েছিল মঙ্গল গ্রহও চন্দ্রের মত উল্কাবিধ্বস্ত, ব্রনকণ্টকিত কৃষ্ণশৈল গুহামুখ পরিকীর্ণ এক বিশাল ভূখণ্ড। পৃথিবী থেকে মঙ্গলকে উজ্জ্বল পীত রক্তবর্ণ দেখায়। এর হরিদ্রাভ লোহিত আভা দেখে অনেকে মনে করেন এই গ্রহে জল আছে, সাগর ও জলাশয়াদি থাকলেও থাকতে পারে, আর থাকতে পারে ক্ষুদ্র উদ্ভিদপূর্ণ বিস্তীর্ণ প্রান্তর। কল্পনা যাদের বল্গা-বিহীন ঘোড়ার মত ছোটে তাঁরা মনে করেন, সেখানে পৃথিবীর মানুষের চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান জীব বাস করে। এইচ, জি, ওয়েলস "দি ওয়ার অব দি ওয়ার্ল্ডস" নামে এক কল্প-বিজ্ঞানে এক সুন্দর কাহিনী পরিবেশন করেছেন। আর্থার ক্লার্কও লিখেছেন এ বিষয়ে কয়েকখানা বিজ্ঞান-ভিত্তিক উপন্যাস।

যাই হোক বাস্তব সত্য হল, মঙ্গল অন্যান্য গ্রহের মতই উপ-বৃত্তাকারে পশ্চিম হতে পূর্বদিকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে সে জন্যে এদের দূরত্ব পরস্পর থেকে কখনও সমান নয়। সূর্য থেকে এর দূরত্ব ১৪ কোটি ১০ লক্ষ মাইল। দু-বছর অন্তর একবার মঙ্গল যখন পৃথিবীর কাছাকাছি এসে পড়ে, তখন তার দূরত্ব হয় ৫ কোটি ৬০ লক্ষ কি, মি। কাজেই মঙ্গল গ্রহকে একবার প্রদক্ষিণ করতে হলে মানুষকে কয়েক কোটি মাইল পথ পরিক্রমা করতে হবে এবং তার সময় লাগবে কম করে দু বছর।

মেরিণার-৭ খবর দিয়েছে মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত অনিবিড় (পাতলা) কিন্তু স্বচ্ছ—দূর দিগন্ত পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করা চলে। পৃথিবীর মত দিনরাত সেখানে ২৪ ঘণ্টায়। গ্রহটি পৃথিবীর চেয়ে আকারে ছোট। সেখানকার অভিকর্ষ পৃথিবীর অভিকর্ষ অপেক্ষা কম। এ ছাড়াও মঙ্গল গ্রহে আছে চারটি ঋতু ; তবে তারা স্থায়িত্বে পৃথিবীর ঋতুর প্রায় দ্বিগুণ। ৬৮৭ দিনে বছর সেখানে।

এরপর আরও তথ্য সংগ্রহের জন্যে ৩০-৫-৭১ তারিখে কেপ কেনেডি থেকে মেরিণার-৯ উৎক্ষিপ্ত হল। এই সময় পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহের মধ্যে দূরত্ব ছিল তিনকোটি পঞ্চাশ লক্ষ মাইল। মেরিণার-৯ মঙ্গল গ্রহে পেঁছে দেখতে পেল, সেখনে প্রবল ধূলি-ঝঞ্ঝা বইছে—মনে হচ্ছিল সমগ্র মঙ্গলগ্রহ একটা ফিকে হলুদ রং-এর আবরণে ঢাকা পড়েছে। এই ঝড় কয়েক সপ্তাহ ধরে চললো। তারপর ১৯৭২ সালের গোড়ার দিকে ঝড় থামলে, মেরিণার-৯ আবার আলোকচিত্র পাঠাতে লাগলো। এবারের ফটোগুলোতে প্রাণের কোন অস্তিত্ব পাওয়া না গেলেও, মঙ্গলের অভ্যন্তরে যে ভাঙ্গাগড়া চলছে তা মনে হল। মেরিণার-৯ মঙ্গলে একটা বিরাট বড় শুকনো খাল বা ক্যাটল দেখতে পেল। এই খালটি গ্র্যান্ড কেনিয়নের চেয়ে তিন হাজার মাইল লম্বা, আর সেই শুকনো খাল থেকে আবার কতকগুলো শাখা-প্রশাখাও দেখা গেল। ওগুলো দেখতে পৃথিবীর খালেরই মত। এই খাল বা নদীগর্ভ যাই হোক না কেন বিশেষ বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। এটি শুকিয়ে যেতে কত সময় লেগেছিল তা এখন বলা যাচ্ছে না। এই "ক্ষীণ নদীরেখা নাহি করে গান আজি, নাহি লেখে লেখা—বালুকার তটে।"

এই শুকনো নদী বা খাল ছাড়াও একটি অতি বৃহৎ আগ্নেয়গিরি দেখা গিয়েছে—যেটি উচ্চতায় ৭০,০০০ ফিট অর্থাৎ এভারেস্ট পর্বতের চেয়ে আড়াই গুণ উঁচু। এটির নাম দেওয়া হয়েছে Nix Olympica। এছাড়াও Phobos এবং Deimos নামে দুটি চাঁদেরও দেখা মিলেছে। মেরিণার-৯ পৃথিবীতে ৭,৩০০ ছবি

পাঠিয়েছিল। এইভাবে ছবি পাঠাতে পাঠাতে ১৯৭২ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখে ৩৪৯ দিন এক নাগাড়ে কাজ করে যাওয়ার পর সেটা হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এই সময় মহাকাশ যানটি পৃথিবী থেকে ২,৩৮,৪১৬,০০০ মাইল দূরে ছিল। পৃথিবী থেকে ইঞ্জিনিয়াররা বারবার তাগাদা দিয়েও তার কাছে আর কোন সাড়া পেলেন না। মহাকাশ যানটি এই নিষ্প্রাণ অবস্থায় আরও পঞ্চাশ বছর সেখানে পড়ে থাকবে।

মেরিণার--৯ যত ছবি পাঠিয়েছে তা থেকে মঙ্গলে কোন রকম প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি না তা নিঃসন্দেহে জানা যাচ্ছে না। তবে কি পৃথিবীই একমাত্র গ্রহ যেখানে প্রাণের চাঞ্চল্য বিদ্যমান। সম্ভবত তাই। অথচ মূল ভৌত-পদার্থগুলি যা দিয়ে পৃথিবী তৈরি, পরীক্ষায় জানা যায় তাই দিয়েই চন্দ্র ও মঙ্গল গ্রহ নির্মিত। মঙ্গলের আবহাওয়া পৃথিবীর চেয়ে শুষ্ক ও শীতল এবং জীবনধারণের পক্ষে তা খুব অনুকূল না হলেও একেবারে বৈরিভাবাপন্ন বলা চলে না। তাই টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের জ্যোতির্পদার্থের অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডঃ জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকার মহাকাশে জীবন সম্পর্কে এক বক্তৃতায় বলেছেন, মঙ্গল ছাড়া অন্যান্য গ্রহেও প্রাণের অস্তিত্ব আছে, এ তার দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি জানান বেশির ভাগ বিজ্ঞানীই তাঁর সঙ্গে একমত। ডঃ নারলিকারের মতে, মঙ্গল গ্রহে অবতীর্ণ ভাইকিং-মহাকাশযানের পরীক্ষা খুব সীমিত ছিল; কাজেই ভাইকিং-এর মন্তব্য—সেখানে জীবনের অস্তিত্বের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না—এ কথায় খুব বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।

হয়ত লক্ষ লক্ষ বছর আগে সেখানে জীবনের অস্তিত্ব ছিল কিন্তু আজ তার কোন চিহ্ন এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। মঙ্গল গ্রহ আজ "জলহীন ফলহীন আতপ্ত পাণ্ডুর মরুক্ষেত্র।" "নীলাম্বুরাশির অতন্দ্র তরঙ্গ কলমেন্দ্রমুখরা" সে দেশ এখন আর নয়। কিন্তু যে সমস্ত নদী-নালার চিহ্ন সেখানে দেখা গেছে, একদিন নিশ্চয়ই তারা ছিল জলপূর্ণ। আর সত্যই তারা যদি জলপূর্ণ হত; তা হলে জীবনের চিহ্নও একদিন নিশ্চয় ছিল। তারপর জল ও প্রয়োজনীয় গ্যাসের অভাব যেদিন হল, সেদিন সব হল নিষ্প্রাণ। এখন অবশ্য মনে হচ্ছে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব আমাদের এই পৃথিবী ছাড়া আর কোন গ্রহে নেই।

১৯৭৬ সালে মেরিণার-৯—ভাইকিং-১ এবং ২ নামে দুটি ছোট মহাকাশ যান পাঠিয়েছিল; তা থেকে নানা যন্ত্র সমেত দুটি মনুষ্যহীন মহাকাশ যান (Robot craft) মঙ্গল গ্রহে প্রেরিত হয়েছিল। তারা চার কোটি মাইল পথ অতিক্রম করে মঙ্গলপৃষ্ঠে অবতরণ করে ২০শে জুলাই এবং ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ সালে ভাইকিং-১ লোহিত বর্ণ মঙ্গলের সূর্যাস্তের ছবি তোলে আর ভাইকিং-২ সেখানকার পাহাড়ের গায়ে শীতকালের বরফের মত জমে থাকা সাদা সাদা দাগ দেখতে পেয়ে তার ফটো তুলে নেয়। এই ছবিটা মঙ্গল গ্রহের ইউটোপিয়া অঞ্চলের। এ ছাড়া তারা মঙ্গল গ্রহের উত্তাপ, সেখানকার মেঘ ও ধূলিঝঞ্ঝার গতিবিধি এবং নানান বিবরণ সংগ্রহ করে পৃথিবীতে তাদের ছবি পাঠিয়েছিল কিন্তু তাতেও কোন জীবাণুর অস্তিত্বের কথা জানা যায় নি। শুধু এইটুকু জানা গিয়েছে ওখানকার মেঘে এমিনো এসিডের সন্ধান মিলেছে। এমিনো এসিড হল প্রাণের অস্তিত্বের অনুকূল। তবে তা থেকে প্রমাণ হয় না যে, সেখানে মানুষ আছে। এসব সত্ত্বেও অনেক আকাশ-বিজ্ঞানীর এখনো বিশ্বাস সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব আছে। তাই তাঁরা আবার ১৯৮৬ সালে যখন মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর অনেকটা কাছাকাছি হবে তখন একটি মহাকাশ যান আবার পাঠাবেন। এখন আবার অনেকে বলছেন, এই মহাকাশ যান আর্থিক ও অন্যান্য কারণে ১৯৮৬ সালে পাঠানো সম্ভব হবে না। যদি পাঠানো হয় তাহলে ১৯৯০ সালে এবং তখনও যদি পাঠানো না হয় তাহলে একুশ শতাব্দীতে নিশ্চয়ই পাঠানো হবে। নানান অভাব ও অসুবিধে সত্ত্বেও আকাশ-বিজ্ঞানীরা বলছেন, তাঁরা চাঁদে যেমন মানুষ পাঠিয়েছেন তেমনি মঙ্গল গ্রহেও একদিন মানুষ পাঠাবেন, কিছুতেই ক্ষান্ত হবেন না এবং সে মানুষকে নির্বিঘ্নে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনবেন। এখন এটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে যেমন মনে হয়েছিল চন্দ্র গ্রহে মানুষ পাঠানো। মানুষ যদি সত্যি সত্যি সশরীরে মঙ্গলে

পৌঁছাতে পারে এবং সেখানে তন্ন তন্ন করে সবকিছুর খোঁজ নিতে পারে, যদি কোন জীবাণু সংগ্রহ করতে পারে তখন মনের সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেটে যাবে, পৃথিবীর মানুষ নিশ্চিন্ত হতে পারবে। কিন্তু এ কাজের জন্যে মঙ্গল অভিযান প্রকল্পকে দিতে হবে অগ্রাধিকার; কারণ একাজে একদিকে দরকার হবে গগনচুম্বী আনুসঙ্গিক ব্যয়ভার আর তার সঙ্গে অপর দিকে দরকার হবে বৈজ্ঞানিক প্রস্তুতি।

মঙ্গল গ্রহে মানুষ পাঠানোর সবচেয়ে অসুবিধা হল পৃথিবী থেকে তার দুস্তর দূরত্ব। মনুষ্যহীন মহাকাশ যান পাঠানো এবং সেখানে নামানো মোটেই অসম্ভব নয়, অসম্ভব হয়ে পড়েছে নভশ্চর-পাঠানো। মঙ্গলে গিয়ে সেখান থেকে ফিরে আসতে মানুষের সময় লাগবে তিন থেকে চার বছর। মহাশূন্যে ভারহীন অবস্থায় মানুষের কতদিন সুস্থ অবস্থায় থাকা সম্ভব, সেটা সঠিক ভাবে জানা দরকার। তার জন্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। সোভিয়েট মহাকাশচারী সয়ুয-৯ মহাকাশ যানে সতের দিনের বেশী ভারশূন্য অবস্থায় মহাকাশ পরিক্রমা করে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। তারপর ১৯৭৩ সালে, ২৫শে সেপ্টেম্বর আশানবিন, ওয়েন গ্যারিয়ট এবং জ্যাক লউসমা ৫৯ দিন ভারহীন অবস্থায় দুকোটি চল্লিশ লক্ষ মাইল পরিক্রমা করে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। শরীরের ক্ষয়-ক্ষতি বা অবনতি না ঘটিয়ে দীর্ঘদিন ভারশূন্য অবস্থায় যে থাকা সম্ভব তা তারা প্রমাণ করছেন। এরপর ৮০-৯০ দিন পর্যন্ত ভারশূন্য অবস্থায় থাকা সম্ভব বলে পরীক্ষিত হয়েছে। স্কায়ল্যাবের পরীক্ষা থেকে এখন জানা যাচ্ছে যে, মঙ্গলে যেতে যে দু-বছর সময় লাগবে, সেই দু-বছর পর্যন্ত ভারশূন্য অবস্থায় থাকলে স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হবে না। এ থেকে মনে হয় মানুষ ইচ্ছে মত দীর্ঘকাল ভারশূন্য অবস্থায় থাকতে পারে।

Zero gravity অর্থাৎ ভারশূন্য অবস্থায় মানুষ কত দিন থাকতে পারে তাই নিয়ে আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনও চলছে। আগেই বলেছি আমেরিকান আকাশচারীরা যেমিনি-৭-এ ১৯৬৫ সালে ১৪ দিন পর্যন্ত ভারশূন্য অবস্থায় ছিলেন আর সরবুব ৯-এর আকাশচারীরা ১৯৭০ সালে ১৮ দিন ভারশূন্য অবস্থায় ছিলেন। তাঁরা পৃথিবীতে ফিরে এলে পরীক্ষা করে জানা গেল তাঁরা মহাকাশ-অসুখে (space-sickness, ভুগেছেন অর্থাৎ তাঁদের মাথা ধরতো, দেহের জলীয় অংশ কিছু কমে গিয়েছিল; তাই দেহের ওজনও কিছু পরিমাণে কমে গিয়েছিল কিন্তু শিগগিরই আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসেন। তাঁদের রক্ত সঞ্চালনের পরিমাণও কমে গিয়েছিল। এই অল্প দিন ভারশূন্য অবস্থায় থাকলে শরীরের যদি এই অবস্থা হয় তা হলে দীর্ঘদিন ভারশূন্য অবস্থায় থাকলে কি হবে? মঙ্গলে যেতে হলে কম পক্ষে দুবছর সময় লাগবে আর ফিরতে লাগবে ঐ পরিমাণ সময়। এতদিন ভারশূন্য অবস্থায় থাকলে শরীরের অবস্থা কি রকম হবে? এই রকম অবস্থায় মানুষের কি মঙ্গল গ্রহে যাওয়া সম্ভবপর হবে? ভবিষ্যতই এর উত্তর দিতে পারবে। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেল ভ্লাদিমির লিয়াখব এবং ভ্যালের রুমিন স্যালিউট-৬ মহাকাশ ষ্টেসনে ১৭৫ দিন কাটিয়ে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন।

নাসা (NASA) ঘোষণা করেছেন যে, এই শতাব্দীর শেষের দিকে নইলে একুশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মঙ্গল গ্রহে মানব অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। রকেটের বর্তমান গতিতে মঙ্গলে পৌঁছতে সময় লাগবে পুরো দু-বছর। আকস্মিক কোন বিপদের সম্ভাবনাকে এড়িয়ে চলবার জন্যে স্থির হয়েছে যে, মহাকাশ যান করে তাঁরা মঙ্গল গ্রহে পাড়ি দেবেন, তারই পাশাপাশি মানব আরোহী-হীন আর একটি মহাকাশ যান সমান গতিতে মঙ্গলের দিকে ছুটে চলতে থাকবে। প্রথম মহাকাশ যানটিতে কোন বিপদ দেখা দিলে, মহাকাশচারীরা দ্বিতীয়টিতে চড়ে বসবেন এবং তাঁদের কর্মসূচীর কোন পরিবর্তন না ঘটিয়ে মঙ্গলের দিকে পাড়ি অব্যাহত রাখবেন।

যেদিন মঙ্গলে মানুষ অবতরণ করতে পারবে, সেই অবতরণ দৃশ্য টেলিভিসন ক্যামেরায় দেখাবার ব্যবস্থা হবে। প্রচলিত ব্যবস্থায় অতদূর থেকে আলোকচিত্র পৃথিবীতে পাঠানো সম্ভব নয়; তাই Laser space communication system-এর সাহায্যে চিত্র পাঠানোর চেষ্টা চলছে। এই লেসার হল এক অত্যাশ্চর্য শক্তিশালী আলোকরশ্মি।

একশ কোটি সূর্যের রশ্মির চেয়ে এর আলোক উজ্জ্বল। আগামী শতাব্দীতে মানুষ যখন মঙ্গল গ্রহে পদার্পণ করতে পারবে তখন সব রহস্যের সমাধান হবে, যেমন মানুষ চাঁদে অবতরণ করে সব জল্পনা-কল্পনাকে মুক করে দিয়ে একটা অল্পবিস্তর সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে।

ভূতপূর্ব NASA administrator বলছেন, মানুষ শুধুই মঙ্গল গ্রহে যাবে না, সেখানে বসবাস করবে তাও তিনি কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছেন। বলেছেন, আমি স্থির নিশ্চয় যে এ শতাব্দীর শেষে পৃথিবীর মানুষেরা বহির্বিশ্বে স্পেন ষ্টেসন এবং চাঁদে ছোট ছোট উপনিবেশ স্থাপন করে বসবাস করবে। প্রথম ছোট দলটি পৌঁছবে মঙ্গল গ্রহে। আর সে সময় প্রথম শিশু জন্মগ্রহণ করবে পৃথিবীর বাইরে এবং সেই শিশু নিজেকে নতুন জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করবে। বহির্বিশ্বে তখন এক নতুন সমাজ-বিজ্ঞান গড়ে উঠবে। বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতিরা পৃথিবীর বাইরে নতুন পরিবেশে গৃহাদি নির্মাণ করবে।

"I am certain that by the end of this century men and women will be living and working in extra-territorial space stations and in small colonies on the moon. The first few will have reached Mars. By then the first children will have been born outside the earlth's biosphere and terrestrial life will be adopting ilself to new worlds. A new sociology of extra-terrestrial society will evolve to suit growing communities of scientists, engineers and spacemen striving to create new human habitats in novel environments beyond the earth."

শ্রীধাম বৃন্দাবন কথা

কানাইলাল দত্ত

গুরুকুল। আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত গুরুকুল মানবতার সেবাকার্যে রত আছেন।

মানব সেবা সংঘ। বিভিন্ন মানুষের প্রতিষ্ঠান। সদসাদের জন্য ভাল ব্যবস্থা। অধ্যাত্ম সাহিত্য ও পত্রিকা আছে।

শ্রীকৃষ্ণ আশ্রম। প্রতিষ্ঠাতা উড়িয়া বাবা (স্বামী পরমানন্দ)

দাবানল কুণ্ড। এখানে একটি সুন্দর গ্রন্থাগার আছে। অনেক দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পুঁথি সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য।

সুরত মনি নিবাস। পাঞ্জাবী প্রতিষ্ঠান। প্রতিদিন সাধুসেবার আয়োজন হয়।

টাট্টি আশ্রম। স্বামী হরিদাসের আশ্রম। এখানে রাধা অষ্টমীতে মেলা বসে।

পরমহংস আশ্রম। ধর্মশালা। বিশেষত্ব এই যে, এখানে একটি সার্বজনীন উনুন সর্বদা জ্বালিয়ে রাখা হয়। যে কেউ সেখানে রুটি সেঁকে নিতে পারেন।

কৃষ্ণ ভক্তি আশ্রম। নানা দেবদেবীর মূর্তি আছে। ধর্মশালার ব্যবস্থা ভাল। অখণ্ড নামকীর্তন হয়।

ভজন মন্দির। অখণ্ড নামের প্রতিষ্ঠান। নির্দিষ্ট সময় নাম করলে কিছু অর্থ মেলে। চলিত কথায় একে রাধারাণী করা বলে।

চার সম্প্রদায়ের আশ্রম। স্বামী কৃষ্ণানন্দ এর প্রতিষ্ঠাতা।

প্রেম বিদ্যালয়। ভারত সেবাশ্রম সংঘ, আনন্দ মায়ের আশ্রম, শান্তি আশ্রম প্রভৃতি আরও প্রচুর সংস্থা রয়েছে।

বৃন্দাবনের আলোচনায় যমুনা অপরিহার্য। মুরলী আর ধেনু ছাড়া কিশোর কৃষ্ণকে কল্পনা করাই যায় না। তেমনি যমুনা ছাড়া রাধাকৃষ্ণের লীলা ভাবা যায় না। প্রাকৃতিক কারণে যমুনার সৌন্দর্য অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। তথাপি যমুনা যমুনাই। বৃন্দাবন যাত্রী মাত্রেই যমুনায় স্নান করে থাকেন। প্রতিদিন অসংখ্য নরনারী বৃন্দাবনের যমুনায় স্নান করছেন; যমুনা পূজা ও যমুনা তীরে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক কাজ কর্ম তীর্থ যাত্রী মাত্রেরই করণীয় কৃত্য বলে বিবেচিত হয়। বৃন্দাবনের ঘাটগুলির মধ্যে কেশিঘাটই সর্ববৃহৎ এবং বিখ্যাত। কৃষ্ণ এখানে কেশি দৈত্য নিধন করেন। ঘাটটি সুন্দর করে বাঁধানো, সুন্দর শোভন হর্ম্যরাজি এবং বহু সংখ্যক পাকা সিঁড়ি সমন্বিত ঘাটগুলির নিজস্ব একটি শান্ত সৌন্দর্য আছে। জলস্রোত মানুষের চিত্তকে শান্ত ও আনন্দময় করে তোলে।

এখন বর্ষাকাল। শীতের শীর্ণা যমুনা এখন পূর্ণ-যৌবনা। পরপারে তরুগুলি মেঘে ঢাকার মতই দেখা যায়। তারই মধ্যে যাত্রী বোঝাই নৌকা নিয়ে মাঝিরা পাড়ি ধরেছে। সংখ্যায় অবশ্য কম। নদীর জল ঘোলা। স্নানার্থীরা তাই ডলে গলা অবধি ডুবিয়ে নিচ্ছেন, পুরো ডুব দিচ্ছেন না কেউ। বৃন্দাবনের প্রায় তিনদিক বেষ্টন করে আছে যমুনা। ঘাটের সংখ্যাও অগুণতি বলা চলে। চিরঘাট বলে চিহ্নিত একটি ঘাটকে বস্ত্রহরণের ঘাট বলা হয়। আমরা বন পরিক্রমার পথে আর একটি চিরঘাট পেয়েছিলাম। কোনটা আসল আর কোনটা নকল তা কৃষ্ণ ঠাকুরই জানেন। কাত্যায়নী ব্রতের শেষ দিনে বস্ত্রহরণ পর্ব। সেই ঘটনার স্মরণে বৃন্দাবনের চিরঘাটে অগ্রহায়ণ মাসে মেলা বসে।

বৈষ্ণব ধর্মের চেহারাটা আজ যেমনই হোক না কেন, সর্বমানবের প্রতি গভীর প্রেমেচ্ছা দ্বারাই বৈষ্ণব জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। জাতি বিচার বর্জিত এবং পাপবোধ মুক্ত

মানুষ না হলে খাঁটি বৈষ্ণব হওয়া বড় কঠিন। বৈষ্ণব অনুশাসনে মুক্তির অধিকারী সকলেই। এমনকি মুসলমান অর্থাৎ বিধর্মী এবং বারাঙ্গনার জন্যও বৈষ্ণব ধর্মে মুক্তির আশ্বাস আছে। বৃন্দাবনের পরিবেশের প্রভাবে মানুষের হৃদয়ে সহজেই প্রেম-প্রীতি ভক্তির উন্মেষ ঘটে। বিরহ সঞ্জাত ব্যাকুলতার দ্বারা প্রিয় প্রাপ্তির আকর্ষণ বাড়ে। আকাঙ্খিত বস্তু যখন নিজের চেষ্টায় কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না তখন অন্য কারো সাহায্যের জন্য মন ব্যাকুল হয়। মন তখনই ঈশ্বরাভিমুখী ও ঈশ্বরনির্ভর হয়। সেই ব্যাকুলতা থেকেই ভক্তির জন্ম, ভক্তি থেকে প্রেম উপজাত হয়।

বৃন্দাবনে বসে একথা ভাবতে ভাবতে আমার মনে হয়েছিল তাজমহলের জন্য আগ্রার যমুনা তীরের চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন স্থান হতে পারত না। ঈশ্বরীয় প্রেমতীর্থ নিকট শাজাহান জেব প্রেমের মর্মর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছেন। জৈব প্রেমকে ইট-কাঠ-পাথর দিয়ে মূর্ত করে তোলার ব্যাকুলতা থেকেই তাজমহলের সৃষ্টি। তাজমহলের সঙ্গে ব্রজমণ্ডলের তুলনা করব না। কিন্তু বৈষ্ণব কবি যে প্রেমের কথা বলেছেন সে তো তার ঘরের ছবিরই রূপান্তর। প্রিয়রে তিনি দেবতা করতে পারেন এবং দেবতারে প্রিয়। প্রেম যখন তাজমহলের রূপ পরিগ্রহ করে তখন মনে হয় সে প্রেম পৃথিবীর ধূলিকণা মুক্ত হয়ে অপার্থিব উজ্জলতায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। শাজাহানের পত্নীপ্রেম রক্ত মাংসের শরীরের কিম্বা শুধু কামনা বাসনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে তিনি আর একটি মমতাজ খুঁজে নিতেন। তাজমহল তৈরি করতে যেতেন না। শেষ জীবনে আগ্রা দুর্গের শিখর থেকে বন্দী শাজাহান তাজমহলের দিকে তাকিয়ে দিন কাটিয়ে দিতেন। তার বৃদ্ধ বয়সের অসহায় ও শোকসন্তপ্ত জীবনে তাজমহলই তাকে যা কিছু শান্তি ও স্বস্তি দিয়েছে। শাজাহান অনুভব করতে পারুন আর নাই পারুন, আমরা স্বীকার করি বা না করি ব্রজমণ্ডলের স্বর্গ-মর্ত্য ব্যাপী প্রেমের প্রভাব থেকে শাজাহান প্রেমের সৌধ তাজমহল নির্মাণের প্রেরণা পেয়েছিলেন বোধ হয়।

বৃন্দাবনে নিত্য উৎসব। দোল, রাস, জন্মাষ্টমী, ঝুলন ছাড়া কৃষ্ণের কৃতি, গোস্বামীদের স্মরণ মননাদি উৎসবের দ্বারাই পালিত হয়। শুধু রাধাকৃষ্ণ কেন্দ্রিক উৎসব নয়, গনেশ, সীতারাম, দশেরা, দেওয়ালী, রামলীলা এসবও খুব সুষ্ঠু উৎসবের দ্বারা সমারোহে উদযাপিত হয়। পৃথিবী কত বদলে গেছে। অথচ এই সব উৎসব তথা তীর্থ পরিক্রমা এবং তীর্থ কৃত্যাদি আবহমান কাল থেকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলে আসছে। কোন শক্তির জোরে হাজার হাজার বছর ধরে এগুলি অবিকৃত রয়েছে তা স্পষ্ট করে বলতে পারব না। তবে বন পরিক্রমা শেষে রাজস্থানী কৃষক সাথীরা যে ধ্বনি তুলেছিলেন তার মধ্যে এই প্রশ্নের উত্তর যদি বা না থাকে কিঞ্চিৎ আভাস অবশ্যই আছে।

বল রাধারানী কি জয়।

বল আজকের আনন্দ কি জয়।

রাধারানী যতদিন আনন্দের আকর থাকবেন ততদিন সহস্র পরিবর্তনের মধ্যেও তিনি ধ্রুব হয়ে থাকবেন। আমরা সেটা যদি না বুঝি তবে বলতে হবে 'ধ্রুবতারা তুমি যেথা জাগ সে দিকের পথ চিনি নাই'।

আমার ধারনা কীর্তনের মধ্যে আনন্দের অভিব্যক্তি ঘটে। আনন্দিত মানুষ কীর্তন করতে করতে পথ চলেন। এটা একটা আচারও বটে। বিচারের দ্বারা জ্ঞান কল্যানকর হয়। আর আচারের দ্বারা সেই কল্যান জীবনে ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে অর্থাৎ জীবন শ্রীমণ্ডিত হয়। কীর্তনীয়াদের পথে ছোট বড় যত মন্দির পড়ছে সর্বত্রই তারা সম্মান নিষ্ঠার সঙ্গে যাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করছেন। আমার যে রাজস্থানী সহযাত্রীদের কীর্তনের ভাষা আমি বুঝতে পারি না। কিন্তু এর মাধুর্য ছিল অনস্বীকার্য। দলের নেতৃত্ব করছিলেন মধ্যবয়সী জনৈক ব্যক্তি। তাঁর পরিচ্ছদ ও চলনে বললে কিছু সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য ছিল।

তিনি সামান্য বাংলা জানেন এ পরিচয় পূর্বেই দিয়েছি। তার সাহায্যে জেনেছিলাম সহযাত্রীরা তখন (বৃন্দাবনে এসে) মীরার "রানাজি সে গিরধর রে ঘর জাউ" ভজনটি গাইছিলেন। ভজনটি বেশ বড়। এর মর্মার্থ হল—রানাজি আমি গিরিধারি লালের ঘরে যাব। গিরিধারি আমার সত্যকার প্রিয়তম। তার রূপ দেখলেই আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। রাত্রি হলে চলে যাই, আবার ভোর

হলে ফিরে আসি। দিবারাত্র অণুক্ষণ তার সঙ্গে থাকি। তিনি যেভাবে খুশী হন, সেই আচরণ করি, তাকে খুশী করি। তিনি যে কাপড় আমায় পরতে দেন তাই পরি। যা খেতে দেন তাই খাই। তাকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থকতে পারি না। তার সঙ্গে আমার প্রীতি, পুরাতন প্রীতি। তিনি যেখানে বসতে দেন সেখানে বসি। তিনি আমাকে যদি বেচে দেন তো আমি বিকিয়ে যাব। "জন মীরা গিরধর কে উপর, বারবার বল জাউঁ"।। বাংলার বৈষ্ণবপদাবলীতে এবং রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, নৈবেদ্য প্রভৃতি কাব্যে, আসামের নামঘোষা গ্রন্থে, তুলসীদাসের রামায়ণে, কবীরের দোহাবলীতে, সুরদাসের গানে, নরসৈঁয়ার ভজন প্রভৃতি ভারতবর্ষের সব অঞ্চলে এবং সকল ভাষায় এই রকম আত্মসমর্পণের অজস্র গান আছে। তার কোন কোনটা কথা ও সুরের দিক থেকে হয়তো উৎকৃষ্টতর হতে পারে কিন্তু প্রত্যেকটির মর্মবাণী এক।

মীরার ভজনগুলির একটা ভিন্ন স্বাদ আছে। মীরাকে ললিতা সখীর অবতার বলে মনে করা হয়।

ভক্ত ভজন-কীর্তনের দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। এটা তার যুগপৎ চিত্তমার্জনা এবং আত্মনিবেদন। ভজনের দ্বারা দুর্বাসনা দূর হয়, ভক্তি জাগ্রত হয়। আমরা নির্মল হই এবং আত্মনিবেদনের ভাব দৃঢ় হয়। গান ও আনন্দ এই ভাবে উপাসনায় পর্যবসিত হয়। ভক্তি ও পবিত্রতাই কীর্তনের প্রাণ। ভগবানের সঙ্গে কথা বলার মাধ্যম রূপেও কীর্তন কীর্তিত হয়েছে। কীর্তনের ফলে নিজের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুকূল হয়ে ওঠে, আমরা আস্তিক হই। হতাশ মানুষ নাস্তিক। কীর্তনের প্রসাদে সেই হতাশা দূর হয় এবং বিশ্বাস করতে শিখি—বিশ্বং তদ্ ভদ্রং যদবন্তিঃ দেবাঃ—এই বিশ্ব মঙ্গলময়। কারণ ঈশ্বর এর দেখাশোনা করেন।

স্থান বিশেষে উক্ত অনুভূতির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। নদীর প্রবহমান জলধারা আমাদের চঞ্চল চিত্ত শান্ত করে। হিমালয়ের বুকে বাস আমাদের ভারতীয় সত্তা যত সহজে অনুভূত হয় এমন আর কোথাও হয় না। কাশীধামে এলে অপেক্ষাকৃত অনায়াসে নর নারায়ণের অভেদত্ব উপলব্ধি হয় তেমনি বৃন্দাবনের পুণ্য ভূমিতে দাঁড়ালে ঈশ্বরীয় ভক্তির মাধুর্য ও প্রেমের ঐশ্বর্যে আমাদের দেহমন ভরে ওঠে। আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই। ভক্তি ভালবাসার শক্তির সম্পর্কে বৃন্দাবনে না এলে বোধ হয় কোন যথার্থ ধারণা হতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—তীর্থে এলে উদ্দীপন হয়। কথামৃতে কথাটা অনেকবার পড়েছি। ব্যাপারটা সম্যক্ রূপে বুঝতে পারি নি। এবার বৃন্দাবনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে বিষয়টি ঠিকমত প্রকাশ যদিও বা করতে না পারি অন্তরে অনুভব করতে পারছি। বৃন্দাবনে আমার অবস্থানকাল শেষ হয়ে এল। মাত্র আটটা দিন। তারই মধ্যে আমার মনের বদল ঘটল না তো? পৃথিবী বদলে যাচ্ছে। নিরন্তর এই পরিবর্তনের কাজ চলছে। আজকের প্রভাতটি গতকাল থেকে অবশ্যই ভিন্ন। সুতরাং আমার বদলে যাওয়াটা বিচিত্র কোন ব্যাপার হবে না। বদলে যাওয়া মানে যেন ভাল হওয়া হয় এই প্রার্থনা। বদলের পথ ধরেই জন্মান্তর ঘটে। আগামী জন্মে কি হব তা কে জানে? শঙ্করাচার্য বলেছেন—নরদেহ গেলে পশু দেহও পেতে পারি। নরদেহাতিক্রমনাৎ প্রাপ্তো পশ্যাদি দেহনাম্। সে জন্য এই নরদেহ থাকতে থাকতে অর্থাৎ এ জন্মেই আত্মসাক্ষাৎকার হওয়া চাই। এ জন্য কোন সহজ পথের সন্ধান কেউ দিতে পারেন নি। তবে রাগ দ্বেষ না ছাড়লে যে আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভব নয় তা সকলেই বলেছেন। একটা ছাড়তে হলে আর একটার অবলম্বন চাই। বৈষ্ণব শাস্ত্র ভক্তি ও প্রেম অবলম্বন করে রাগ দ্বেষ মুক্ত হওয়ার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। বৈষ্ণব জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যেই এটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

বৃন্দাবনে আমার তীর্থগুরু শ্যামসুন্দর ব্রজবাসী। ঘটনাচক্রে এবার তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়ে ওঠে নি। কিন্তু প্রথম যখন তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তখন বিষয়ী বুদ্ধির প্রভাবে পড়ে আমার ভীরু মন তার সঙ্গে খরচ-খরচার বিষয়টি পাকা করে নিতে চেয়েছিল। উত্তরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পদাশ্রিত এই পরম বৈষ্ণব আমাকে একটি স্নিগ্ধ মধুর কথা বলে নির্বাক করে দিয়েছিলেন। তার

কথার সমার্থ ছিল—পিওন পিওনের কাছে যান, গবর্নর গবর্নরের মত লোকের নিকট যান, রাজা আসেন রাজার সান্নিধ্যে,—সুতরাং যিনি গোবিন্দের দরজায় আসছেন তিনি তো গোবিন্দই। তার এই বিচার অনুসারে বৃন্দাবনের তীর্থযাত্রী মাত্রেই গোবিন্দ অর্থাৎ ভগবান। আর ভগবানের সঙ্গে খরচ খরচা নিয়ে দরদস্তুর চলে না। তিনি যা দিতে পারবেন তাতেই হবে। তিনি ভাল বাংলা জানেন। শেষ বাক্যটি আবেগ ভরে হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে বলেছিলেন—গোবিন্দসে ভিখ মাঙিবে লেকিন অন্ন বেচিবে না। এর অবশ্য দুটো অর্থ হয়। কিন্তু শ্যামসুন্দরজীর আচার আচরণ দ্বিতীয় অর্থ করার অবকাশ মেলে নি কখনো। সন্তুষ্ট হয়ে তাকে কিছু বাড়তী প্রণামী সকলেই দিয়ে থাকেন। বৃন্দাবনে যে সব ব্রজবাসী চুরাশী ক্রোশ পরিক্রমার আয়োজন ও পরিচালনা করে থাকেন শ্যামসুন্দরজী তাদের অন্যতম। ইনি আমাকে একদিন ভাগবত উদ্ধৃতি করে বলছিলেন—"পুরোহিত দক্ষিণা পেয়ে যজমানকে ত্যাগ করে।" কিন্তু ব্রজবাসীগণ শুধুমাত্র পুরোহিত নন, তারা তীর্থগুরুও, সে জন্য তীর্থযাত্রীর একমাত্র আশ্রয়।

শাস্ত্রে আছে অতঃ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। অর্থাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করবার অধিকার লাভের জন্য করণীয় কৃত্যাদি সমাপ্ত হলেই তবে ঐ প্রশ্ন করা চলে। আমরা সেটুকু করতে আগ্রহী নই, কিন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকার পেতে চাই। এটা একটা চরম দৃষ্টান্ত। সব ব্যাপারেই মোটামুটি এখন এই রকম একটা অবস্থার প্রাবল্য ঘটেছে। ঐ রকম বুদ্ধি বসে আসবার সময় মনে করেছিলাম বৃন্দাবনকে জানবার পক্ষে আট দিনই যথেষ্ট। না, আটদিন বা আট মাস কিম্বা আশি বছরেও বৃন্দাবন অজ্ঞাত থেকে যেতে পারে। বাসনা বিসর্জন দিয়ে যিনি এসে বসতে পারেন রাধারানীর করুণা হলে তার হয়তো কোন একদিন হলেও হতে পারে। বাসনা বিসর্জন সহজ কথা নয়। রাধা দামোদর মন্দিরের সিঁড়িতে বসে মোহান্তজী বলেছিলেন বাসনা বিসর্জনের জন্য নানা আচার আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। শ্মশান কৃত্য শেষে শব যাত্রীরা ফিরে আসার সময় জলপূর্ণ একটি কলসীকে পিছন ফিরে কঠিন কোন বস্তুর আঘাতে ভেঙে দিয়ে চলে আসেন। সে দিকে তাকান নিষেধ। কলসীটা হল বাসনা পূর্ণ দেহের প্রতীক। চোখের সামনে সেই দেহ ভস্মসাৎ হতে দেখে সকলের মনেই কিছু না কিছু বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। তখন বাসনা মুক্ত হবার এই আচারটি খুবই সময়োপযোগী। কিন্তু আচরণকারীরা প্রকৃত অর্থ জানেন না বলে তাদের উপর এর কোন বিশেষ প্রভাব পড়ে না। তা ছাড়া প্রতিটি কাজের সঙ্গে সাধনাকে অন্ততঃ অভ্যাসকে যুক্ত না করলে ফল পাওয়া যায় না। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়ের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্র থাকলে কাজটা সহজ হয়। তাতে না হলে জ্ঞানের স্মরণ নিতে হবে। তখনও যদি না হয় তো ভক্তি জুড়ে দিন। ভক্তিতে হবেই। কিন্তু ঐ শব্দটা মুখে উচ্চারণ করলেই হৃদয়ে ভক্তি উথলে ওঠে না। তা হলে উপায়? বৈষ্ণব জন বলবেন—নাম স্মরণ করুন। তীর্থযাত্রা, দেবদর্শন, লীলামৃত শ্রবণ মনন থেকে ভক্তির সঞ্চার হবে। সাফল্য লাভ করতে হলে তৃণের মত নমনীয় হোন, গাছের মত সহিষ্ণু থাকুন এবং অমানীকেও মান দান করুন। তখন সহজেই বলতে পারবেন—

তোমারি রাগিনী জীবন কুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো
ধন্য কর দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।

ঐ প্রার্থনা বিশ্ব চরাচরে সর্ব্বদাই উচ্চারিত হচ্ছে। শ্রীরাধিকার প্রেম, গোপললনাদের অনুরাগ, শিশুপালের ক্রোধ, কংসের ভয়, নন্দ-যশোদার স্নেহ, ভক্তের ভক্তি, সখার ভালবাসা, শুকজ্ঞানীর শ্রদ্ধা সর্বত্র এবং সর্ব কর্ম ও ভাবে ঐ একই প্রার্থনা। হে ঈশ্বর আমাকে বাসনা বর্জিত করে দাও। সার্থক হই আর ব্যর্থ হই হৃদয়ে তুমি অধিষ্ঠিত থাক। বাসনা থেকেই পাওয়ার ইচ্ছা হয়। না পেলে ক্রোধ হবে। পেলে লোভাতুর হব। লোভ থেকে পরের দ্রব্য অপহরণের ইচ্ছার উদ্রেক হয়। আর বাসনার পূর্তি তো অহঙ্কারের নামান্তর মাত্র, অর্থাৎ পরের অনিষ্ট চিন্তা অতএব পরিত্যাজ্য। একমাত্র গ্রাহ্য হচ্ছে সৎসঙ্গ, সৎ চিন্তা

এবং সদাচার। এই তিনের সম্মিলনের ফল শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা থেকে আসে নিষ্ঠা। নিষ্ঠাই ভক্তির প্রসূতি বলে স্বীকৃত। ভক্তির চরম অবস্থাই হল প্রেম। প্রেমাতুর মানুষকে ত্যাগী বা বৈরাগী হতেই হবে। সত্যিকার বৈরাগ্য মানেই তো মুক্তি। প্রেমেই সাধনার সমাপ্তি। অবশিষ্টটুকু প্রেমীর জীবনে আপসে এসে যায়। সুতরাং একমাত্র প্রেমী মানুষেরই ব্রজজিজ্ঞাসার অধিকার আছে। আমাদের কবি যদিও বলেছেন 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ।' কবির পক্ষে যা সত্য, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে তা কল্পনা বিলাস মাত্র।

সত্য পথের সন্ধান সহজ নয়। কৃষ্ণ অপ্রকট হলে সৌনক মুনির আহ্বানে হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডে ৬০ হাজার মুনি-ঋষি 'আলোর সন্ধানে' সম্মিলিত হয়েছিলেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত ছিল কৃষ্ণ অপ্রকট কিন্তু কৃষ্ণকথা আছে। অতএব মাভৈঃ। দিকে দিকে কৃষ্ণকথা ছড়িয়ে দাও। সেই কথামৃত থেকে সকলেই নিজের নিজের প্রয়োজন মত আলোর সন্ধান পাবেন। কৃষ্ণকথার তরঙ্গাঘাতের শক্তিতে ভারতবর্ষের নগরে প্রান্তরে সে দিন নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল। প্রেমতীর্থ হল ভারতবর্ষ। এই প্রেমের শতধারায় অভিসিঞ্চিত ভারতবর্ষের আনন্দিত প্রাণ ঘোষণা করেছিল—ভারতে জন্ম দুর্লভ, ভারতে মনুষ্য জন্ম দুর্লভতর। অর্থাৎ ভারতে গাধা হয়ে জন্মাবার সৌভাগ্যও সুলভ নয়। ভারতে এমন জনপদ নেই যেখানে সন্ত পদধূলি পড়ে নি, যেখানে কৃষ্ণনাম ধ্বনিত হয় না এবং ভারতে এমন শক্তসামর্থ্য লোক কমই আছেন যিনি তীর্থ-রজঃ মাথায় নেন নি। সত্য মিথ্যা কিম্বা বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব আমাদের মূল সাধনাকে কখনো বিঘ্নিত করতে পারে নি। কারণ ভারতবাসীর হৃদয়ের সত্যের সঙ্গে এর কোনো বিরোধ নেই। কি সেই মহা সত্য?

বঙ্কিমের 'কৃষ্ণ চরিত্রে' গ্রন্থ সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তথ্য অপেক্ষা সত্য অনেক বড়। "সত্য কবির প্রতিভা বলে কাব্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।.. মহৎ ব্যক্তির কার্য বিবরণ কেবল তথ্য মাত্র নয়, তাহার মহত্ত্বটাই সত্য।" তাই আমরা তথ্য দিয়ে সত্যকে ধরবার কথা ভাবি না। কৃষ্ণ-কথার মহত্বই প্রাণে প্রাণে আলোড়ন সৃষ্টি করে; ঘটনা বিচার করে না। সহস্র সহস্র বৎসর ধরে ভারতবাসীর হৃদয়-রাজ্যে প্রতিটি মানুষের ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অভীপ্সা অনুসারে কৃষ্ণ রূপলাভ করেছেন। আর সেটাই সত্য, পরম সত্য। কেননা—

সেই সত্য
যা রচিবে তুমি
ঘটে যা তা সব সত্য নহে,
কবি, তব মনোভূমি রামের জন্মস্থান
অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—কবিই শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। সেই কবি সৃষ্ট ইতিহাসের আলোকে ব্রজমণ্ডলের প্রতিটি ইট কাঠ জনপদ বাড়িঘর মন্দির ও বনের এক একটি রম্য মধুর ইতিহাস রচিত হয়েছে। তার আদিতে রাধাকৃষ্ণ, স্থিতি রাধাকৃষ্ণে এবং অন্তিম গতিও শ্রীরাধাকৃষ্ণ। রাধা-কৃষ্ণ নামে ঈশ্বরীয় অবতার নরনারী রূপে বাস্তবে কোন দিন ছিলেন এ তর্ক বৃথা। তারা অন্তর্যামীরূপে প্রতি হৃদয়ে বিরাজমান। তাঁরাই মানুষের পরম বান্ধব, আত্মার আত্মীয়। আমাদের হৃদয়ে ধ্বনিত হোক "ভগবান আমি তোমার স্মরণ নিচ্ছি। তুমি আমার অনন্য গতি; তুমি আমাকে যে কোন পথ দেখাও। যে পথ দেখাবে সে পথের আমি চলব। (গীতা প্রবচন)—কণ্ঠে ধ্বনিত হোক—হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায়মাধবায় কেশবায় নমঃ।

ওঁ নমঃ ইতি।

ছায়াসপ

শান্তনু দে সরকার

তুলসী মঞ্জুরী তিন বছরের ছেলে কোলে করে কাপড়ের একটা ছোট্ট পুঁটলি হাতে নিয়ে ল্যানসডাউন রোডের এটর্নি শ্রীশ মিত্তিরের বাড়িতে উপস্থিত হ'ল বেলা দশটার সময় খুড়শ্বশুর সম্পর্কীয় প্রতিবেসী রজনী বিশ্বাসের সঙ্গে। রজনীবাবু বাড়িতে ঢুকেই হাঁক দিলেন,—কই গো মা জননী, আপনার জন্যে লোক নিয়ে এসেছি।

শ্রীশবাবুর মা দুর্গাদেবী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। রজনীর গলা শুনে ভেতর বাড়ীর ওপরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন এটর্নি গিন্নি জ্যোতির্ময়ী। দুই গিন্নিই নবাগতা রাধুনীটিকে এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। রজনীবাবু এটর্নি অফিসের কেরানী; সাহেবের বাড়িতে হামেশাই আসা-যাওয়া করেন; থাকেন শহরতলীতে। তুলসী মঞ্জুরীকে পৌঁছে দিয়ে বললেন,—হাইকোর্টে কাজ আছে মা, চল্লাম। কি কি করতে হবে আপনি ওকে বুঝিয়ে দেবেন, বামুনের ঘরের মেয়ে, ঠিক গুছিয়ে করবে। মেয়েটি খুব ভালো মা, কিন্তু বড়ই দুখিনী।

দুর্গাদেবী বললেন—আচ্ছা, তুমি যাও বাবা।

রজনীবাবু ওদের পৌঁছে দিয়ে হাইকোর্টে গেলেন। দুর্গাদেবী তাকিয়ে রইলেন মেয়েটির মুখের দিকে। গায়ের রং ফরসা, সুন্দর কচিমুখ ব্যথায় মলিন; বড় বড় চোখ যেন জলভারে ছলছলিয়ে উঠছে। রুখু রুখু এক-মাথা কোঁকড়া চুল, সিঁদুর বিহীন সিঁথি খাঁ খাঁ করছে। পরনে পাড়চটা তাঁতের শাড়ি, শাদা ব্লাউজ, শাদা সায়া, হাতে দুগাছা করে রঙের ওপর সোনা জড়ানো চুড়ি। দুর্গাদেবীর মনে দয়া হ'ল ওকে দেখে; ভাবলেন—ভগবান কি নিষ্ঠুর। ওপর থেকে বৌ ভাবতে লাগলেন,—শাশুড়ী খাল কেটে কুমীর ঢোকালেন। সোমত্ত সুন্দরী মেয়ে বাড়ীতে রেখে বিপদ ডেকে আনলেন। যাবে সংসার গোল্লায়। বড়মা ওকে নীচে নিজের মহলে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন,—হাতের পুঁটলিটা দালানে রেখে ছেলে নিয়ে ঘরে বসো, কথাবার্তা জিগ্যেস করি।

তুলসী মঞ্জুরী বড়মার কথায় ছেলে নিয়ে বসলো বড় গিন্নির ঘরের মেঝেয়।

গিন্নি প্রশ্ন করলেন—তোমার নাম কি বলো,...ডাকতে হবে তো?

ও জবাব দিলে—তুলসী মঞ্জুরী; বাবা মা ডাকতেন—'মঞ্জু' বলে।

উনি বললেন—আমিও মঞ্জু বলে ডাকবো। তা বাছা তোমার এমন অবস্থা কতদিন হয়েছে?

ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জবাব দিলে,—বিয়ের আট মাস পরে খোকা ভূমিষ্ঠ হবার চার মাস আগে।

গিন্নি বললেন—আহা! তোমার শ্বশুর বাড়ি, বাপের বাড়ির অবস্থা বুঝি তেমন ভালো নয়?

তুলসী মঞ্জুরী সংক্ষেপে শোনালে ওর কাহিনী।

"চার বছর আগে ভয়াবহ বন্যায় ওদের বাড়ি-ঘর ভেসে, বাবা, মা বাবার কোনো খোঁজ মেলেনি। ও কোনো রকমে একটা বড় বাড়ির ছাদে আশ্রয় পায়। দুদিন পরে এক সেবা-দল ওকে উদ্ধার করে নিয়ে শহরে আসে। নিরাশ্রয় মেয়েটিকে সরকারী বড় চাকরী করা এক এম, এ পাশ ছেলে বিয়ে করে বাড়ি নিয়ে যায়। ওর বাবা-মা তখন এক বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ওঁরা সোনা-দানা নগদ টাকা আসবাবপত্র অনেক কিছুই দিতে চেয়েছিলেন। অতএব এই বানেভাসা হতভাগিনী বৌকে ওঁরা রোজগারী ছেলের মুখ চেয়ে গ্রহণ করলেও আড়ালে লাঞ্ছনা গঞ্জনার শেষ রাখেন নি। ও জন্মদুখিনী, স্বামী-সুখ ওর সইলো না, বিয়ের আট মাস পরেই বিধবা হ'ল। সমস্ত দোষ পড়লো সর্বনাশী-রাক্ষুসী বৌ ও তার অনাগত বাপ

থেকো সন্তানের ওপর। শ্বশুরবাড়ির অবস্থা খুবই ভালো। তিন ভাসুর ভালো মাইনের চাকরী করেন, শ্বশুর মশাই পেনশন পান। বাড়িতে দুজন ঝি আছে, রান্নার কাজ ওকেই করতে হয়। বড়লোকের বাড়িতে যেমন মানুষের চেয়ে পোষা কুকুরের আদর বেশী, মধ্যবিত্ত পরিবারে পেট-ভাতায় আশ্রিত আত্মীয়ের চেয়ে ঝি-চাকরের কদর বেশী; গরীবের মেয়ে বিধবা বৌয়ের স্থান নেই। সারা বছরে পুজোর সময় একখানা নতুন কাপড়, অন্য সময় জায়েদের ছেঁড়া পুরোনো কাপড়। চিকিৎসার অভাবে ছেলেটা জন্মের মত খোঁড়া হয়ে রইলো। পোলিও হয়েছিল, এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের দয়ায় প্রাণে বেঁচে আছে। নিত্য গঞ্জনা,—তিনকালখাকী সব্যনাশী বৌ। ওর খোঁড়া পাপের বোঝা জ্যাঠারা বইবে কেন? শাশুড়ীরও চক্ষু-শূল। বড়ই অসহ্য অবস্থা। আত্মহত্যা করা সহজ, কিন্তু জন্ম হতভাগা খোঁড়া ছেলেটাকে মা হয়ে কোথায় ভাসিয়ে যাবে। তাই রজনী বিশ্বাসের মুখে এ বাড়িতে রান্নার লোক দরকার শুনে সকলের মত নিয়ে ও শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে।"

গল্প শুনে দুর্গাদেবীর চোখে জল এল, বললেন,—তোমার কোনো ভয় নেই মঞ্জু, তুমি আমার কাছে থাকো। বাড়িতে লোকজন কম, কোনো অসুবিধে হবে না। আমি, আমার ছেলে ও বৌ বাড়িতে থাকি। নাতনীর বিয়ে হয়ে গেছে, সে থাকে শ্বশুরবাড়ি, নাতি গেছে বিলেতে ব্যারিষ্টারী পড়তে, ফিরবে এক বছর পরে।

একটু থেমে উনি আবার বললেন,—তোমাকে ভাই রান্না ছাড়াও একটা বেশী কাজ করতে হবে।

ও বললে—আমাকে দয়া করে আশ্রয় দিলে যা বলবেন করবো। আমি বামুনের মেয়ে হলেও মিত্তি বাড়ির বৌ। আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না।

ঠাকুমা বললেন—আমাকে একটু দেখো দিদি। আমি নীচে, একলা থাকি। কর্তা এই ঘরে থাকতেন। প্রফেসার মানুষ, রাত জেগে বই পড়তেন, খাতা দেখতেন। আমারও তাই রাত্তিরে জেগে জেগে বই পড়া অভ্যেস হয়ে গেছে, সময় মত ঔষধপত্র খেতে ভুলে যাই। ওটা তুমি একটু লক্ষ্য রেখো আর আমার পাশের ঘরেই ছেলে নিয়ে থেকো, আমার বাড়তি বিছানা আছে তোমাকে দোবো। চলো সব তোমাকে দেখিয়ে আনি। আর একটা কথা বলে রাখি, এ বাড়ির মা রাজবাড়ির মেয়ে, ভারী কড়া মেজাজ। একটু সাবধানে থেকো,...যা বলে শুনো।

তুলসী মঞ্জুরী প্লাবনে ভাসতে ভাসতে এসে ডাঙা পেয়েছিল, কপাল গুণে তা হ'ল মরুভূমি। আজ ওর পায়ের নীচে সবুজ মাটির নাগাল। ভারী মিষ্টি কথা আর ব্যবহার ঠাকুমার। উনি মধ্যবিত্ত স্কুল-মাষ্টারের মেয়ে, মহেশ্বরের মত আপনভোলা অধ্যাপকের স্ত্রী, দুর্গার মত ওঁর দয়ার শরীর। ওকে আর ছেলেকে নতুন জামা-কাপড় কিনে দিলেন, ছেলের জন্যে দুধের ব্যবস্থা করে দিলেন। সময় পেলেই ঘরে ডেকে কর্তার গল্প শোনাতেন। ছেলেটা সব সময় ওঁর ঘরে খেলা করতো। এমন বাড়িতে রাধুনীর কাজ করেও সুখ। ঠাকুমা ওকে নাতনীর মতই যত্ন করেন।

এক বছর পরে ফিরলো ব্যারিষ্টার হয়ে নাতি অনুপম। ঠাকুমার সঙ্গে নাতির ঘনিষ্ঠতা বরাবর ছিল বেশী। ও বারবার ঠাকুমা দেখতে আসে, ঘরে বসে গল্প করে। এই ব্যাপার নাতির মায়ের ভালো লাগলো না। ছেলেকে কিছু বলতে পারলেন না, তুলসী মঞ্জুরীর পেছনে ছায়ার মত লেগে থাকতেন, উঠতে বসতে খিট্ খিট্ করতেন। ওকে ঠাকুমার ঘরে যেতে দেখলে কুকুরের মত তাড়া করতেন।

তুলসী মঞ্জুরীকে প্রথম যেদিন দুর্গাদেবী আশ্রয় দিয়েছিলেন, উনি স্বামীর কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন, ওকে যেন এ বাড়িতে না রাখা হয়। সুন্দরী অল্প বয়সী মেয়েছেলেকে কোনো গেরস্ত বাড়িতে কাজ করতে না দেওয়াই উচিৎ।

দর্শনের অধ্যাপক হরিশ মিত্তিরের এটর্নি ছেলে হেসে জবাব দিয়েছিলেন,—ওসব বড়লোক জমিদার বাড়ির সেকেলে পুরোনো ধারণা। রূপ ঈশ্বরের দান, যৌবন সব মানুষের জীবনে একবার করে আসে, এ দুটো কারুর অপরাধ নয়। শুধু এই জন্যে একজন নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে ভয় পেয়োনা জ্যোতি, ছায়াকে সাপ ভেবে মনকে সংশয়াচ্ছন্ন করোনা। আমি লক্ষ্য করেছি মেয়েটি খুব

শান্তশিষ্ট ; তা ছাড়া তোমার ভয়ের কারণ তো ছেলে। তাকে বিলেতে পাঠালে সেখানে কি সুন্দরী যুবতী মেয়ে নেই?

জ্যোতির্ময়ী টিপ্পনি কেটেছিলেন—ছেলে নেই সত্যি কথা, কিন্তু ছেলের বাপকেই বিশ্বাস কি? ভদ্রলোক এই হীন মন্তব্যের জবাব সহজ ভাবেই দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—তিরিশ বছরেও যে ভদ্রমহিলা তার স্বামীকে চিনতে পারে না তাকে করুণা করাই উচিৎ। মেয়েটি আমার নিরুর চেয়েও ছোট। আমার মা তাঁর স্বামী-পুত্রকে ভালো ভাবেই চেনেন। এমন চিন্তা রাজা খেতাবধারী বাড়ির মেয়ের পক্ষেই সম্ভব।

যেমন মা তার তেমনি ছেলে। জ্যোতির্ময়ী বাধ্য হয়ে মুখ বন্ধ করেছিলেন। মেয়েটির কাজ-কর্ম ব্যবহারে খারাপ কিছু দেখেন নি, তবুও ওর রূপ, ওর প্রতি শাশুড়ীর স্নেহ তুলসী মঞ্জুরীকে জ্যোতির্ময়ীর চক্ষুশূল করে তুললো। ছেলে দেশে ফেরার পর জ্যোতির্ময়ী অশুভ সন্দেহের তাড়নায় ছটপটিয়ে বেড়াতে লাগলেন।

দুর্গাদেবী জানতেন এলেনবি রোডের বোস বাড়ির লরেটো থেকে পাশ করা মেয়েটার সঙ্গে নাতির প্রেমের ব্যাপারটা। ঠাকুমাকে প্রজাপতি করবার জন্যেই নাতির ঘন ঘন আসা-যাওয়া ঠাকুমার কাছে। ঠাকুমা ছেলেকে ডেকে পরামর্শ করে নাতির বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে এলেন এবং সুন্দরী নাতবৌ এনে আপাততঃ নাতির মায়ের দুশ্চিন্তা ব্যধির উপশম করলেন।

তুলসী মঞ্জুরীর গুণে নতুন বৌও মুগ্ধ হয়ে পড়লো। ও ওকে 'মঞ্জুদি' বলে ডাকতে শুরু করলে। তাতেও জ্যোতির্ময়ী এক দফা চটলেন। ঝি-চাকরের সঙ্গে সম্বোধনের সুসম্পর্ককে উনি খুশী নন। চাকর-চাকরের মত থাকবে, তার সঙ্গে দিদি-দাদা, মাসী-পিসী সম্পর্কের মানে হয়। এরপর হঠাৎ একদিন দেখলেন বৌ দয়ায় দিদি-শাশুড়ীকেও ছাড়িয়ে গেল। খোঁড়া ছেলেটাকে কলকাতার এক নামকরা স্কুলে ভর্তি করে দিলে। অদ্ভুত বাড়ির অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা। সুন্দরী রাধুনী রেখে মেয়ে পুরুষ সবাই যেন ওর রূপের কাছে পাগল হয়ে গেছে। ওর বাপের বাড়িতে দশজনের কাছাকাছি ঝি-চাকর,—দারোয়ান, রাধুনী, ঘর পরিষ্কার করবার লোক, বার-বাড়ি পরিষ্কার করবার লোক, বাসন মাজা, রুটি বেলা, কুটনো কোটা, বাজার করার আলাদা আলাদা লোক। ওদের জন্যে আলাদা ভাত-তরকারী, রাঁধার ব্যবস্থা। ঝি-রাধুনী নিয়ে এমন আদিখ্যেতাও কখনো চোখে দেখে নি। রাধুনীর ছেলের জন্যে দুধ-স্কুলের ব্যবস্থা পৃথিবীতে কোথাও আছে কিনা ওঁর জানা নেই। স্কুল মাস্টারের মেয়ে বুড়িটা না মরলে এ বাড়ির মন্ত্রম আর ফিরে আসবে না। যেমনি মা, তেমনি ছেলে, তেমনি নাতি-নাতনী, আবার নাত-বৌটা যেন সোনার ওপর সোহাগা। হাড়ে হাড়ে জ্বলতে লাগলেন জ্যোতির্ময়ী। নিজেকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন উনি। ওঁর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো তুলসী মঞ্জুরী আর তার খোঁড়া ছেলেটার ওপর।

দেখতে দেখতে ষোল বছর পার হয়ে গেল। জ্যোতির্ময়ী মনে সন্দেহের আগুন জ্বালামুখীর মত ধিক ধিক করে জ্বলতে থাকলো। বড়মা আর মাসীমার স্নেহ কুড়িয়ে খোঁড়া ছেলে দেবকান্ত মিত্তির বি, এ, পাশ করে ফেললো। শুধু পাশই করলে না সুন্দরী মার ছেলে দেবকান্ত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কন্দর্প-কান্তি হয়ে উঠলো। ওর চোখ জুড়ানো রূপ দেখে রূপের চির-বিদ্বেষিণী জ্যোতির্ময়ীর চোখ জ্বলতে লাগলো। ওঁর পনেরো বছরের নাতনীও সুন্দরী, এগারো ক্লাশে পড়ে। সর্বনাশী রূপসী মায়ের রূপের ডালী এই খোঁড়া ছেলে না তার আভিজাত্যের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। জলাতঙ্ক রুগীর মত রূপাতঙ্কে জ্যোতির্ময়ী ছটফটিয়ে বেড়াতে লাগলো। সুযোগ খুঁজতে লাগলো একটু দোষ পেলেই ষোল বছরের চক্ষুশূলদের বাড়িছাড়া করবার। একবছর হ'ল স্কুল মাস্টারের মেয়ে শাশুড়ী ঠাকরুন গত হয়েছেন কিন্তু ইংরিজী স্কুলে পড়া নাতবৌকে একেবারে নিজের ছাঁচে গোড়ে গেছেন। গিন্নী হয়েও বিশেষ কায়দা করতে পারছে না।

ছেলেটা খোঁড়া ; স্কুল-কলেজ ছাড়া নিজের ঘর থেকে বেরোয় না, বই-খাতাপত্তর নিয়ে লেখাপড়া করে। মা ব্যস্ত থাকে নিজের কাজে। দোষ ওদের খুঁজে পাওয়া

যায় না। কিন্তু রূপকে ওর বিশ্বাস নেই। ওর বাপের বাড়িতে এমন দুর্ঘটনা অনেক ঘটেছে।

বেলা তখন সাড়ে আটটা, বৌ অনুরাধা দুশো টাকা হাতে নিয়ে দেবকান্তর ঘরে এসে বললে,—দেবু, তোর মামা দুশো টাকা দিয়ে বললেন, আজই তুই এম, এতে ভর্তি হয়ে আসবি। ইউনিভারসিটির ফার্স্ট লিষ্টে তোর নাম উঠেছে, তোর মামাকে ফোন করে জানিয়েছেন ওঁর বন্ধু। সকাল সকাল যাবি, পায়ের জোর নেই, বেলা হলে ভীড়ে কষ্ট হবে।

ও বললে—আমি এক্ষুনি যাচ্ছি মামিমা, আপনি মাকে তাড়াতাড়ি জলখাবার দিতে বলে যান।

অনুরাধা রান্নাঘরে তুলসী মঞ্জুরীকে শুনিয়ে গেল,—মঞ্জুদি, দেবুকে জল খাবার দাও ; ও এক্ষুনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ্যাডমিশন নিতে যাবে।

মেয়েটার স্কুলে যাবার সময়, এক্ষুনি খেতে নামবে। তুলসী মঞ্জুরী ওর খাবার সাজাচ্ছিল। ছেলের ভর্তি হবার কথা শুনে একটা ডিসে খানকয়েক রুটি আর একটু তরকারী নিয়ে ছেলেকে দিতে যাচ্ছিল, দৌড়তে দৌড়তে মেয়ে পিংকী নেমে এসে বললে,—পিসিমা, শীগগীর খেতে দিন, আজ বড্ড দেরী হয়ে গেছে। এক্ষুনি স্কুলের বাস এসে পড়বে।

ও খাবারের ডিস নামিয়ে রেখে মেয়ের ভাত বাড়তে বসলো। পিংকী জিগ্যেস করলে—ও কার খাবার পিসিমা?

তুলসী মঞ্জুরী বললে—তোমার দেবুদার মা। ও এক্ষুনি ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হতে যাবে. তোমার মা বলে গেল।

পিংকী বললে—তুমি ততক্ষণ আমার খাবার রেডি করো পিসীমা, আমি এটা তোমার হয়ে দেবুদাকে দিয়ে আসছি।

না মা থাক, তুমি খেতে বসো ; আমার হয়ে গেছে, যাচ্ছি—বলে তুলসী মঞ্জুরী বাধা দিতে গেল। কিন্তু কে কার কথা শোনে। ছটফটে পিংকী ততক্ষনে খাবারের থালা নিয়ে বেরিয়ে গেছে। দেবুর ঘরে ঢুকে খাবারের থালা টেবিলে রেখে বললে—দেবুদা তোমার খাবার। দেবু বাইরের জানালার আলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে পড়ছিল, পিংকীর গলার আওয়াজে চমকে উঠে বললে—তুমি কেন? মা কোথায়?

পিংকী খাবার রেখে সঙ্গে সঙ্গে থুড়িলাফ খেতে খেতে বেরিয়ে গেছে, দেবুর কথা শুনতে পায় নি। দেবুও ওকে স্পস্ট ভাবে দেখতে পায় নি, কিন্তু শয়তানের দৃষ্টিতে এ দৃশ্য অন্য রূপ নিল। জ্যোতির্ময়ী গঙ্গার স্নান সেরে বাড়িতে ঢুকেই দেখলো এ ছবি। হায় হায় কি সব্যনাশ। তার ধারনা মিথ্যে হবার নয়,.. এতোদিনে তার সংসারে পাপ থাবা বাড়ালে। রাগে ওর মাথায় আগুন জ্বলে উঠলো, কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে রইলো নাতনীর মুখের দিকে।

ঠাকুমার মুখ দেখে জিগোস করলে পিংকী—তোমার কি হয়েছে ঠাকুমা? চোখ লাল কেন? গঙ্গার নোংরা জলে চান করে অসুখ হয়েছে নাকি? জানি না বাপু কি পুণ্যি হয় তোমাদের নোংরা জলে ডুব দিয়ে।

ঠাকুমা নাতনীর কথায় আরো রেগে গেলেন। ক্রুদ্ধ গর্জনে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলেন—গঙ্গার জল নোংরা না বাড়ির ভেতর নোংরামী। মাস্টারের মেয়ে ডাইনী বুড়িটা আমার ঘরে কালসাপ ঢুকিয়ে গেলেন। সর্বনাশ করে ছাড়লে হারামজাদি। জ্যোতির্ময়ী শেষ কথাগুলো তুলসী মঞ্জুরীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। ইংরিজী স্কুলে পড়া আদরের নাতনী ভাবলে এই অভদ্র ভাষা ওকে লক্ষ্য করে বললে ঠাকুমা। অভিমানে ওর দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। খাবার টেবিলের সামনে বসে টেবিলের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো পিংকী। মেয়ে কান্না শুনে ছুটে এসে তুলসী মঞ্জুরী আদর করে মেয়ের মুখ কোলের কাছে তুলে জিগ্যেস করলে—ওকি মামণি, কাঁদছো কেন? কি হ'ল তোমার?

অভিমানে পিংকীর চোখের জল আর ফোঁপানী বেড়েই গেল। সর্পিনী ঠাকুমা রাগে কাঁপতে কাঁপতে ওপরে উঠে গেল। না না পাপ আর আগুনের শেষ রাখতে নেই। শুনবে না ও কারুর কথা। সর্ষেখোলার দত্তবাড়ির মেয়ে ও, সর্ষেফুল দেখিয়ে ছাড়বে। ও জানে কেমন করে অবিজ্ঞানকে ঝেঁটিয়ে সাফ করতে হয়।

মেয়ের কান্না দেখে তুলসী মঞ্জুরীও কেঁদে ফেললে।

এ মেয়েকে যে ও আঁতুড় থেকে বুকে করে মানুষ করেছে। কি হ'ল আজ মেয়ের? মমতায় গলে গেল তুলসী মঞ্জুরী। কান্নায় আকুল হয়ে উঠলো পিংকী। কি সর্বনাশ। দেবুকে খাবার দিতে গিয়ে মেয়ে কেঁদে ফিরলো কেন? ভয়ে আড়ষ্ঠ হয়ে উঠলো তুলসী মঞ্জুরী।

এমন সময় বাইরে স্কুল-বাসের হর্ন বেজে উঠলো। পিংকী বইয়ের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল খাবার ঘর থেকে। পেছনে পেছনে ছুটলো তুলসী মঞ্জুরী টিফিনের বাক্স নিয়ে। মেয়ে উঠতেই বাস ছেড়ে দিলে। দুচোখ জলে ভরে গেল তুলসী মঞ্জুরীর। আহারে! মেয়েটা খেলেও না, টিফিনও সঙ্গে নিলে না। কি করবে ও? হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো পথের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ। ধীরে ধীরে পা বাড়ালো বাড়ির দরজার ভেতর তুলসী মঞ্জুরী। ওর সামনে এসে পথ রোধ করে দাঁড়ালো জ্যোতির্ময়ী। চিৎকার করে বলে উঠলো—খবরদার। আর এক পাও বাড়িও না আমার বাড়ির ভেতর। অনেক সহ্য করেছি,...আর নয়।

ও কাঁদতে কাঁদতে বললে—এতদিন পরে আপনার চরণে কি দোষ করলাম মা?

জ্যোতির্ময়ী ভেংচে উঠলো—কি দোষ করলাম মা? আকাশ থেকে পড়লেন...যেন ন্যাকা খুকী,...কিছুই জানেন না। বলি মা হয়ে ছেলের কুটনীগিরি করতে লজ্জা হ'ল না। যেদিন রজনী বিশ্বাস এক গেরস্তর ছেলে-ভোলানী, ডাইনী, এই রাক্ষুসীটাকে আমার বাড়িতে এনে ঢোকালে সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম স্বামীখাকী, আমার সংসারও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে ছাড়বে। দোষ না থাকলে এমনি কোনো গেরস্থ বাড়ি থেকে অল্প বয়েসী বিধবা বৌকে তাড়িয়ে দেয়। তোমরা মা-ছেলে এক্ষুনি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও।

জ্যোতির্ময়ীর চিৎকার শুনে ওপর থেকে নেমে এলো বৌ অনুরাধা, ঘর থেকে বেরিয়ে এলো দেবকান্ত, ওপরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো কর্তা শ্রীশ মিত্র ও ছেলে অনুপম।

ওপর থেকে শ্রীশবাবু বললেন—ছিঃ ছিঃ জ্যোতির্ময়ী, এখনো তোমার সন্দেহবাতিক গেল না। ভালো মানুষ মা-ছেলে ষোল বছর আমার মায়ের স্নেহ-ছায়ায় আছে। মা মরতে না মরতে নিরপরাধদের তুমি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছো!

জ্যোতির্ময়ী রাগের ওপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন; ঝি-চাকরের জন্যে বাড়ির গিন্নীকে অপমান! এরা নিজেদের ভদ্রলোক, শিক্ষিত বলে বড়াই করে। রাধুনী দরদী এমন শিক্ষিত বাড়ি ভুভারতে আর কেথাও আছে কিনা কারুর জানা নেই। ঘেন্নায় দেওয়ালে মাথা ঠুকে মরে যেতে ইচ্ছে করছে।...কানা-খোঁড়া দশগুণ বাড়া। এই ছোঁড়া, সংএর মত দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? আমার চোখ বড় সাংঘাতিক চোখ, এ চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়। এক্ষুনি মায়ের হাত ধরে বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে। আমি গোবর-জল ছড়া দিয়ে আবার নেয়ে আসি গঙ্গা থেকে।

দেবকান্ত আধ-চিবানো রুটির টুকরোটা কোন রকমে চোখ বুজিয়ে গিলে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এসে মায়ের হাত ধরে বললো চলো মা।

মা-ছেলে সদর দরজার বাইরে গেল। অনুরাধা ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো জলভরা চোখে। দেবু বললে—মামীমা আমাদের পথ ছেড়ে দিন।

অনুরাধা বললে—তোমাদের জামা-কাপড়, বই-খাতা সব পড়ে রইলো যে বাবা।

দেবু জবাব দিলে—মামীমা, ষোল বছর আপনাদের দয়া-স্নেহ-ভালোবাসা নিয়ে কাটিয়েছি। স্কুল-কলেজ ছাড়া বাইরে যে একটা জগত আছে জানিনা; খোঁড়াকে আপনারা স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন। ষোল বছরে এ বাড়ির বাইরের ধুলো লাগে নি মায়ের পায়ের পাতায়। সমস্তই আমাদের অজানা; কোথায় যাবো তাও জানিনা; কি করবো মিথ্যে বোঝা বাড়িয়ে। যেখানেই থাকি আপনাদের কথা ভুলবো না, ভুলবো না যত দিন বাঁচবো বড়মাকে। অনাথ-কে উনি রাজার আদরে রেখেছিলেন।

ও অনুরাধাকে প্রণাম করে পকেট থেকে সদ্য দেওয়া দুশো টাকা বার করে দিতে গেল। অনুরাধা বললে—ওগুলো তোমার মামাবাবু তোমাকে এম, এ ক্লাশে ভর্তি হবার জন্যে দিয়েছেন, যথাযথ ব্যবহার করে মর্যাদা দিয়ে

ফিরিয়ে দিয়ে তোমাদের চেয়ে অসহায় মামা-মামীকে লজ্জা দিয়ো না বাবা।

মায়ের হাত ধরে দেবকান্ত নেমে পড়লো পথে। কলকাতার পথ নিরাশ্রয়ের চির আশ্রয়, কাউকে বিমুখ করে না। খোঁড়া ছেলের হাত ধরে ষোল বছর পরে বানে ভাসা তুলসী মঞ্জুরী আবার চললো অকূলে ভাসতে ভাসতে অজানা দ্বীপের সন্ধানে। ওপরে দাঁড়িয়ে সজল চোখে তাকিয়ে দেখলেন এটর্নি শ্রীশ মিত্র, তাঁর মায়ের ষোল বছরের আশ্রিত আজ বিনা দোষে বিতাড়িত হ'ল। দেখলে ব্যারিষ্টার অনুপম, দেখলে লরেটোতে পড়া বৌ অনুরাধা। পৃথিবী আজ বোবা, হারিয়ে ফেলেছে প্রতিবাদের ভাষা!

একটি বাস্তব ঘটনা

লীলা ভট্টাচার্য্য

সেই দিনটি আজও আমার মনে পড়ে। মানুষের নিত্যকার জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে থাকে কিন্তু সব ঘটনাই সাহিত্য-সত্য নয়, সাহিত্য-সত্য নয় বলে তা থাকে মাটির নীচে সংগোপনে। ১৯৭১ সালের ১৬ই মে এইদিনটিকে আমি আমার জীবনের স্মরণীয় দিন বলে ঘোষণা করতে পারি। পৃথিবীতে এমন কোন জিনিষ নেই যে, যার পিছনে ইতিহাস নেই, আমার মাতা-পিতা যে অকালে পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নিয়ে চিরনিদ্রা দিচ্ছেন, এর পিছনে এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে।

আমার জন্ম হয় বাংলাদেশের বরিশাল শহরে। আমার ছোট ভাই চন্দন, তারপর এক বোন কাজল, এই তিন-ভাই-বোন ও মা বাবাকে নিয়েই আমরা বেশ সচ্ছল ভাবে বরিশালের বাড়ীতে বসবাস করছিলাম। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অকস্মাৎ ঢাকায় বোমা ফেলে। ক্রমেই বাংলাদেশের অবস্থা অগ্নিকুণ্ড হয়ে উঠেছে, তখন কেউ ভাবেনি যে বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশে চরম দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে। পাক-সেনাবাহিনী তারপর বাংলাদেশের সর্বত্র ঘাঁটি স্থাপন করলো, তখন আমার বাবা শহর থেকে গ্রামে নিরাপদে থাকা যাবে মনে করে আমাদের মামাবাড়ী বরিশাল শহর থেকে বাইশ মাইল দূরে চাঁদশী গ্রামে পাঠিয়ে

দিলেন। কয়েকদিন পরে বাবাও বরিশালের সব জিনিষ ফেলে মামাবাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন। একমাস মামা-বাড়ীতে থাকার পর ভাগ্যবিধাতা আমাদের জীবনের সব-চেয়ে অন্ধকার দিন এনে উপস্থিত করলেন।

সেদিনও আমরা সূর্যদেবকে নমস্কার দিয়ে, মুখ ধুয়ে খেয়েদেয়ে বারান্দায়ে বসেছি, এমন সময় দ্রুতবেগে একটি বাইশ বছরের ছেলে দৌড়ে এসে বললো,মিলিটারী আসছে। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো। তখন সবাই কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়েছে। মাসী রান্নাঘরে রান্না করছিল। দিদিমা অসুস্থ তাই শুয়ে ছিল। আমরা আর সবাই বারান্দায় গল্প করছিলাম। মিলিটারী আসার খবর পেয়ে আমরা এক জামা কাপড়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম দাদু-দিদিমা ও দুই মামাকে ফেলে আমরা মা, বাবা, এক মাসী ও মাসতুতো তিন ভাই বোন আত্মরক্ষার্থে অজানা পথে হাঁটতে শুরু করেছি। অনেক সময় হেঁটে মামাবাড়ীর পশ্চিমে রাংতা গ্রামে উপস্থিত হয়েছি। চারদিকে ধানক্ষেত, মাঝখানে কয়েকটি কুঁড়ে ঘর এবং ঘরগুলোর চারপাশে বিক্ষিপ্ত গাছপালা ছিল। এই জায়গাটাকে নিরাপদ মনে করে আমরা ঐ বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছি। ও বাড়ীতে শুধু আমরা নয়, চার-দিকের গ্রাম থেকে প্রায় তিন-চারশো লোক এসে ঐ বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছিল। সময় এবং নদীর স্রোত কারোর জন্য অপেক্ষা করে না। সেদিনও তেমনি ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চললো। আমরা ক্ষুধায়, পিপাশায় খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম। কিন্তু সেদিন নরনারী-শিশু সবাই ভয়ে পাথরের মতো বসেছিল। কারোর মুখে কথা নেই, বেলা যখন সাড়ে বারোটা তখন কম করে একশো মিলিটারী ক্ষুধার্ত কুকুরের মত অস্ত্রসহ ঐ বাড়ীটার দিকে এগিয়ে আসছিল। ওরা রাস্তার দুপার্শ্বের বাড়ীগুলোতে প্রফুল্ল বদনে আগুন জ্বালিয়ে দিল এবং পশুর মত মানুষদের গুলি করছিল।

ঐ বাড়ীতে আমরা যারা আশ্রয় নিয়েছিলাম, ওদের আসতে দেখে সবাই দিশেহারা হয়ে গেল। মা সন্তানকে ফেলে ছুটলো, স্বামী স্ত্রীকে ছেড়ে পালালো, কেউ জমির মধ্যে বসে পড়লো। আবার কিছু লোক শুয়ে পড়লো। তেমনি আমি ও ভাই কিছুটা দৌড়ে গিয়েছিলাম এবং একটা মুসলমান বাড়ীর সামনে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম। তারা দা নিয়ে এগিয়ে এসে বললো, তোমরা আসলে কেটে ফেলবো। অগত্যা মা বাবা পূর্বে যে বাড়ীর পিছনে আশ্রয় নিয়েছিল, ভাই ও আমি সেখানে এসে উপস্থিত হলাম। বোনটা ছোট তাই মায়ের কোলেই ছিল। মা বাবা, মাসী এমন ধানক্ষেতের উপর বসেছিল, সেখানে পিঁপড়ে, জোঁক, বিছা, মাকড়শা কিছুর অভাব ছিল না। তথাপি ঐ জায়গাটা তখন আমাদের কাছে তীর্থক্ষেত্র মনে হয়েছিল। তাই নিঃসংকোচে মায়ের সামনে বসেছিলাম।

তারপর পাকবাহিনী বাড়ীটার মধ্যে মেশিনগান বসিয়ে অবিরাম গুলী বর্ষণ করলো। অতঃপর ওরা সামনে এসে যারা মরেনি তাদের গুলি করলো। আমার মাসী মিলি-টারীর পা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, আমার প্রাণ ভিক্ষা দিন। তখন মিলিটারীটা মাসীকে সাতটা গুলি করলো। মাসীর কোলের ছেলেটার গুলির আঘাতে চোখের কোন চিহ্ন ছিল না। মাসী ঐ মুহূর্তে পরলোক গমন করলো। মাসীর মেজছেলেটা বলেছিল, মিলিটারী দাদা, আমার মাকে মারবেন না। তখন মাসীর ছেলেটাকে বুট জুতো দিয়ে লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিল। তারপর মায়ের গায়ে গুলি লাগলো। ছোট বোন মায়ের কোলে ছিল। বোনটা আহত হলো। ওর হাতে-পায়ে গুলী লেগেছে, হঠাৎ একটা গুলি এসে আমার বাঁ হাতে লাগলো, আরেকটা গুলী এসে পেট দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, তখন আমি শুধু বলেছি, মা আমি গেলাম। তৎক্ষনাৎ আমি শুয়ে পড়লাম। মা একটা হাত শেষবারের মতো আমার গায়ের উপর দিলেন। তখন বাবাও গুলিতে নিহত হয়েছেন। ঐ জমিতে শুধু মানুষের মুণ্ড গড়াগড়ি যাচ্ছিল, বহুলোক নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে প্রচুর।

আমার ভাই ও মাসীর দুই ছেলে গুলীর হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল ওরাও আবার মিলিটারীর চোখে পড়লো। তখন ওদের তিনজনকে একগুলিতে শেষ করার লাইন করলো। গুলি করার জন্য বন্দুক প্রস্তুত। এমন

সময় মিলিটারীর কমান্ডার বললো, বাচ্চা, ছেড়ে দাও। অবশেষে বিধাতার কৃপায় ওরা প্রাণ ফিরে পেল। আমার বোনকে মাসীর বড়ছেলেটা মায়ের কোল থেকে টেনে বের করে আনলো। তারপর আমার ভাই, বোন মাসীর দুই ছেলে মামাবাড়ীর উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করলো। পথে মেসোমশায়ের সঙ্গে দেখা হল, তিনি আমার বোনকে কোলে নিলেন। মামাবাড়ী গিয়ে দেখলেন, মামাবাড়ী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এদিকে আমি সব মৃতদেহের মধ্যে শুয়ে আছি। আমার জামাটা রক্তে ভিজে গিয়েছিল। বেলা গড়িয়ে বিকেল হল, তখন কিছু লোক এসে আমাদের পরণের দামী দামী জিনিষপত্র খুলে নিচ্ছে। কেউ মায়ের চুড়ি, কানের দুল, হার খুলে নিল। অপর লোক বাবার ঘড়ি, আংটি, সোনার বোতাম, চশমা, পাঞ্জাবী সব নিয়ে নিল। আমার কোন ক্ষমতা নেই উঠে বসার বা প্রতিবাদ করার মতো।

ওদিকে মেসোমশাই বোনের ক্ষতস্থানগুলো বেঁধে দিলেন। ওদের নিয়ে একটা বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। দাদু, দিদিমা, ও দুই মামা অন্য জায়গায় পালিয়েছিল, তাই তারা বেঁচে ছিল। তারা এসে মেসোমশাইয়ের কাছে সব শুনে যেন বোবা হয়ে গেছে। দিদিমা যখন শুনলেন তার দুই মেয়ে জামাই ও এই নাতি মারা গেছে এবং দুই নাতনী অর্থাৎ আমরা দুবোন আহত হয়েছি এবং মামাবাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে, তখন বললেন আমার বেঁচে থেকে কি হবে? কিন্তু ঐ দুঃসময় কারোর চোখে জল নেই। সবার চোখ যেন মরুভূমি হয়ে গেছে। দিদিমা একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার ভাই বোন, দাদু মামা সকলকে রান্না করে দুমুঠো ভাত দিলেন। এদিকে আমি সারারাত মৃতদেহের মধ্যে শুয়ে থেকে ব্যাথায় ছটফট করেছি। সাহারার জ্বালা বুকে নিয়ে সারারাত কাটিয়েছি। পরের দিন মেসোমশাই এসে ঐ বাড়ীতে একটা গর্ত করে আমার মা, বাবা, মাসী ও মাসীর ছেলের মৃতদেহগুলোকে লোক দিয়ে মাটি চাপা দিয়েছেন।

আমি আর লিখতে পারছি না। মনের দাগ তো জলের দাগ নয়। এদিনটিকে ভুলতে পারছি না আর জীবনে কোনদিন পারবোও না। তারপর আমাকে মেসোমশাই অনেক কষ্টে লোক দিয়ে ধরে মামাবাড়ীর কাছে এক বাড়ীতে উপস্থিত করলেন। একজন ডাক্তার চিকিৎসা করলেন। দু-মাস পরে বিছানা ছেড়ে উঠেছি। তারপর একদিন ভাত খেতে বসেছি, এমন সময় গুলির আওয়াজ। বুঝলাম মিলিটারী আসছে। ভাত ছেড়ে উঠে পুকুরে গিয়ে ডুব দিয়ে পালিয়েছিলাম। শুধু নাকটা তুলে রেখেছিলাম। তখন একজন মা, কোলের নবজাতক শিশুকে জলে নিক্ষেপ করলেন। কারণ শিশুর কান্না শুনলে ওরা আসবে, গুলি করবে তাই নিজে বাঁচার জন্য সন্তান বিসর্জন দিলেন। এই অবস্থার পর আমরা আর ওখানে থাকতে পারবো না মনে করে, দশদিন হেঁটে ভারতের সীমান্ত বনগাঁ বর্ডারে এসে সন্ধ্যাবেলা উপস্থিত হয়েছি রাত এগারোটার সময় মামার এই যাদবপুরের বাড়ীতে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু আমরা মা, বাবা, সম্পত্তি সব হারিয়েছি। এখনো আমাদের বরিশালে তিন খানা দোতলা বাড়ী আছে এবং বাইশখানা রিক্সা আছে। কিন্তু আমরা প্রাণের ভয়ে ঐ দেশে আর পা দিতে পারিনি। চোখের সামনে যে হত্যালীলা দেখেছি, অগণিত মানুষের হত্যালীলা দেখেছি, নদীর জল লাল হয়েছিল, বাংলাদেশ যেন শ্মশান পুরীতে পরিণত হয়েছিল, এ দৃশ্য আর জন্ম-জন্মান্তরে ভুলবো না।

কতটুকু জানি

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

যে মানুষ অনেক কিছু চায়, সে সব কিছু না পেলেও কিছু কিছু পায়, কিন্তু যে কিছুই চায় না, কি চাইবে জানে না তার কপালে অনেক কিছু জুটে যায়। যা সে আশা করতে পারে না, আশা করে না, এমন কিছুও তার ভাগ্যে জুটে। এ যে কতখানি নিষ্ঠুর ভাবে সত্য তা বোঝাতে হলে নিজের কথাই বলতে হয় আমাকে।

শীতের রোদ এসে পড়েছে চার্চের পাশ দিয়ে শিয়ালদার মোড়টায়, বাস-ট্রাম যে দিকটায় দাঁড়ায় ভিখারীরা বসে পচা ফল খায়, ভিক্ষার আশা করে, বা শুধু খাবারের স্বপ্ন দেখে। আমি আমার ছেঁড়া কাপড়টার আধখানা গায়ে জড়িয়ে ফুটপাতের উপরই শুয়েছিলুম। আর তন্দ্রা-জড়ানো চোখে দেখছিলুম মানুষের গতি—জীবন যুদ্ধে যে মানুষ সংগ্রাম করে চলেছে—আরো পাবার আশায় মত্ত হয়ে চলেছে—কি চাইছে কেন চাইছে না জেনে চলেছে।

আমার দিকে কারোর দৃষ্টি নেই। কেউ যেন আমায় দেখতে পাচ্ছে না। অথচ আমি সবাইকে দেখছি। এ যেন বাল্যকালের সে অদৃশ্য হয়ে মিঠাই-এর দোকানে ঢুকে সন্দেশ খাওয়ার কল্পনা। আমার যা খুশি তুলে তুলে খাচ্ছি দোকানদার আমায় দেখতে পাচ্ছে না। আমি অদৃশ্য।

মনে হলো ফুটপাথের উপর আমি অদৃশ্য হয়েই শুয়ে আছি। নইলে কেউ আমার দিকে তাকাচ্ছে না? তাকালে কারোর না কারোর মনে একটুও হয়ত করুণা হোত। তারা দেখতে পেত, আমার এই শীতার্ত দেহটায় তিন দিন আহার নেই,—আহার সংগ্রহের চেষ্টাও ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আসছে। আমার সামনেই লাইটপোষ্টের পাশে দাঁড়িয়ে একটা বাবুর পকেট থেকে পকেট-মার তুলে নিত মানি ব্যাগটা? ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই যে একটি বর্ষীয়সী মেম সাহেব আমার সামনে দাঁড়িয়েই তার চেয়ে বয়সে ছোট তরুণ প্রেমিককে চুম্বন করতে পারত রাস্তাটাকে সম্পূর্ণ নির্জন মনে করে? কেউ আমায় দেখছে না। অবহেলায় অন্ধ বলে তাদের কারো নজরে আমি পড়ছি না।

অনাহারে কাটছে দিন, শীতে কাটছে রাত। পায়ে চোট লেগেছিল। তাই চলতে পারছিলুম না। শুয়েই আছি, শরীর অবসন্ন। চোখ খোলা। চারি পাশে কত কিছু ঘটছে আমি দেখছি। আকাশের রঙ বদলাচ্ছে। বদলাচ্ছে বড় কোলকাতা—আজব সহর কোলকাতা। রাস্তায় লোকের চলাচল বাড়ছে। হঠাৎ বাজারের থলে হাতে এক ভদ্রলোক আমার পায়ে হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। রাগে দাঁত কটকট করে গায়ের ধুলি ঝাড়তে ঝাড়তে সুরু করলেন গালি: যত সব ভিখারী ভ্যাগাবণ্ড কোলকাতার রাস্তায় ভিড় করে আছে। তাদের জন্যে একটু স্বচ্ছন্দে চলবার উপায় নেই। যত সব অধম—ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

লোকটি দু'পা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলেন। পকেট থেকে দুটি পয়সা বের করে আমার হাতে দিতে চাইলেন। আমি বললুম পয়সা চাই নে। খাবার থাকে তো দিন। তিন দিন খাই নি।

'কেন খাও নি?'

"জুটছে না।"

'কাজ করনা কেন? বয়স তো বেশী নয় দেখছি। কেন ভিক্ষে করে খেতে চাও?'

'কাজ দেবেন একটা?'

'করবে? বাসার কাজ করতে পারবে?'

'কেন পারব না? এই পাটা ভেঙ্গে গেছে। একটু সেরে উঠলেই পারব মনে করছি।'

'তবে চল আমার সঙ্গে।'

'চলতে পারছি না বলেই তো পথে পড়ে আছি।'

বাবু একটা রিকশা ডাকলেন। আমাকে তুললেন। পরে বাজারের থলে হাতে নিয়ে পাশে বসলেন।

অম্বিকা চক্রবর্তীর নামে রাজাবাজার এলাকার চোর বাটপাড় পকেটমার গুণ্ডা সবাই ভয় পায়। রাজাবাজারের কাছে আচার্য প্রফুল্ল রোডের একটা সরকার অধিকৃত ভবনে তিনি বাস করেন।

এত বড় নামী দারোগার ভাগ্যেও যে ভৃত্য-কষ্ট ঘটতে পারে তা জেনে অবাক হলুম। তিনি স্ত্রী শৈলজা সুন্দরীর কাছে প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন বাজারের থলে হাতে নিয়ে—আজ একটা চাকর না নিয়ে বাড়ী ফিরবেন না। যত সব জানা চাকরের আড্ডা ছিল সব জায়গায় খোঁজ খবর নিয়ে ব্যর্থ হয়ে বাজার সেরে বাড়ী ফেরার পথে আমাকে তিনি কুড়িয়ে পেলেন। কিন্তু আমাকে নিয়ে বাড়ী পৌঁছবার পর যে তাঁর কি দুর্দশা হল তা যদি তাঁর অধস্তন কর্মচারী বা তাঁর শাসনে পীড়িত চোর-ডাকাতেরা একবার দেখতে পেত? আমি রিক্‌শা থেকে নেমে বাড়ীর ভেতরকার দালানে যখন দাঁড়ালুম খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমার ভিখারীর বেশ নিয়ে রান্না ঘর থেকে একটা অদ্ভুত হাসি হেসে বেরিয়ে এলেন দারোগা বাবুর স্ত্রী।—

'এই তোমার লোক। আর পেলে না ঘাটের মড়া? তিনটি অষ্টাদশী, ষোড়শী, চতুর্দশী মেয়ে এসে খিল খিল করে হেসে দাঁড়াল মায়ের পাশে। তাদের সঙ্গে যোগ দিল দুটি এগার আর আট বছরের ছেলে। তাদের ছোট ভাই-ই হয়ত হবে। অম্বিকা দারোগা গিন্নীর প্রতাপে মুখ চুণ করে থাকলেও ছেলে মেয়েদের প্রতি গর্জন না করে থাকতে পারলেন না। বড় মেয়েকে দাঁত খিঁচিয়ে আদেশ করলেন, দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিস কি? লোকটা দাঁড়াতে পারছে না, ওকে হাত ধরে নিয়ে যা আউট হাউসটায়—বেচারী।' ছোটদের ধমক দিলেন—যা পড়াশোনা কর গিয়ে। বই ফেলে তামাশা দেখতে এসেছে?

বড় মেয়ে মালবিকা আর মেজ মেয়ে মাধবিকা দুজনে ধরে আমায় চাকরের ঘরে নিয়ে গেল। ঘরে একটা খাটিয়া রয়েছে। আর একটা দড়ি ঝুলান রয়েছে—যাতে এ ঘরের পূর্ববর্তী বাসিন্দাগণ কাপড় জামা রাখত, গামছা শুকাতো, ভিজে কাপড় ছড়িয়ে দিত। দারোগাবাবু শোবার ঘর থেকে আদেশ করলেন—ওকে ফার্স্ট এড দে। ওর পা ভেঙ্গে গেছে। গরম জল করে একবার ওকে ওয়াস করে দে। পায়ে গরম হলুদ আর চুণ লাগিয়ে দে। পরে আমি নেধু ডাক্তারকে নিয়ে আসছি।' তারপর দারোগাবাবু থানায় চলে গেলেন। তার গলার আওয়াজ আর শুনতে পেলুম না। দুইবোন যত্ন করে আমাকে খাটিয়ায় বিছানা করে দিল—পূর্ববর্তী চাকরের বিছানাটা ঘরের কোণে পড়েই ছিল খাটিয়ায়। আমায় পরতে একটা পুরানো ধুতি—একটা পুরানো জামা দিল। দারোগা বাবুর বলিষ্ঠ দেহের ঘর্মগন্ধ যুক্তা হলেও এসব আমার ভালই লাগছিল—বিশেষ করে মালবিকা আর মাধবিকার যত্ন!—ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ঘরের দরজায় এসে দেখে গিয়েছে আমাকে। কতক্ষণ পরে শৈলজা সুন্দরী দেবী এলেন। দজ্জাল দারোগা গিন্নী হলে কি হবে—মেয়ে মানুষের মন তো,—আমার চেহারা-টা দেখে যেন তার মন গলল। তিন দিন তিন রাতের অনাহারক্লিষ্ট চেহারা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: কিছু খাবে এখন?

আমি ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললুম: হ্যাঁ, তিন দিন খাই নি।

ইতিমধ্যে খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল মালবিকা। একটা টিনের থালায় তিনখানা রুটি। একটু গুড়।

গিন্নীমা জিজ্ঞেস করলেন—চা খাবে?

আমি মাথা নেড়ে বললুম—হ্যাঁ।

মাধবিকা একটা এনামেলের কাপে চা নিয়ে এসে আমার সামনে রাখল। একটা টুলের উপর আমার খাবার আর চা রাখা হল। আমার গায়ে যেন নূতন জোর এল খাবার দেখে। আমি ওঠে বসলুম খাটের কিনারায়। রুটি টেনে ছিঁড়তে লাগলুম, চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগলুম। শৈলজা দেবী তিন কন্যা দুই পুত্র নিয়ে আমার সে খাওয়ার দৃশ্য উপভোগ করলেন। শৈলজা দেবী রত্নগর্ভা তিনটি কন্যা মালবিকা, মাধবিকা, বাসবিকা তার মতই স্বাস্থ্যবতী—কিন্তু দেখতে তার চেয়েও সুন্দরী। পুত্র শান্তি আর কান্তি দুজনেই দেখতে ভালো। ওদের

চোখে বুদ্ধি যেন চিকচিক করছে। আমার খাওয়া শেষ হতেই শৈলজা সুন্দরী প্রশ্ন করলেন: তোমার নাম কি যাদু?

আমার মুখে হাসি ফুটল—যাদু।

হাসিতে ফেটে পড়ল ছেলেমেয়ে সকলে। ধমক দিলেন শৈলজা দেবী—থাম, চুপ কর।

মুহূর্তে হাসি স্তব্ধ হ'ল। দারোগা গিন্নী আবার জেরা করলেন—ঠিক করে বল, বাপু। ইয়ারকি নয়।

আমি গম্ভীর হয়ে বললুম—আমার নাম যাদব চন্দ্র ঘোষ। পিতার নাম মাধব চন্দ্র ঘোষ। সাকিন বড়াইল। জিলা ত্রিপুরা।

আবার হাসল ছেলেমেয়ে গুলি। শৈলজা দেবী রেগে গিয়ে বললেন:— অতসব তোমায় কে বলতে বলল?

আমি সবিনয়ে বললুম—আপনি বার বার কষ্ট করে প্রশ্ন করবেন। তাই সব এক সঙ্গে বলে দিলুম। তাছাড়া এসব কথা সকলেই তো জানতে চান। তাই—

'আচ্ছা, তুমি বাপু একটু সুস্থ হয়ে নাও। 'আয় তোরা' বলে ছেলে মেয়েদের ডেকে নিয়ে চলে গেলেন। আবার একটু পরে ফিরে এসে বললেন—আমায় গিন্নীমা বলে ডাকবে, বুঝলে? মেয়ে তিনটি বড় হয়ে গেছে। ওদের যেন দিদিমনি ছোট দিদিমনি ডাকবে। দেখছো তো শোমত্ত, ওরা বড় হয়ে উঠছে ওদের একটু সমীহ করে সাবধানে চলবে। বুঝলে।—

আমি মাথা দুলিয়ে বললুম—বুঝেছি।

বিকালবেলা দারোগাবাবু নেধু ডাক্তারকে নিয়ে এলেন। নেধু ডাক্তার আমাকে খুব যত্ন করে সর্বাঙ্গ পরীক্ষা করে দেখলেন, জিজ্ঞাসা করে করে জানলেন সব রোগের কথা। ওসব রোগের নামও কখনও শুনিনি। ডাক্তারবাবু যত বলছি পায়ের ব্যথাটা একটু সারিয়ে দিন—তিনি কেবল জিজ্ঞেস করছেন—ভিডি কখনও হয়েছিল কিনা। জানি না, বলে তার হাতে রক্ষা পাওয়ার উপায় নেই। নেধু ডাক্তার দারোগা বাবুর চাকরদের চিকিৎসক, ওদের কথাবার্তা থেকে বুঝলুম। আরও বুঝলুম আমার আগে এ ঘরে যে ছিল তার ভিডি ছিল—শুধু তাই নয়—তার থেকে রোগ সংক্রামিত হয়েছিল দারোগা গিন্নীর দেহেও। দারোগাবাবুর গৃহচিকিৎসক ডাঃ সর্বানী বোস ভিডি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাই অতি সহজেই তাকে রোগ-মুক্ত করেছিলেন তিনি! কিন্তু নেধু ডক্তোর সে চাকর হরচরণকে চিকিৎসা করার সুযোগ পান নি। কারণ—ডাঃ সর্বানীর উপদেশ অনুসারে দারোগাবাবু তাকে বিদায় করে দিয়েছিলেন, যদিও গিন্নীমার বাসনা ছিল। হরচরণকে চিকিৎসা করে ভাল করে নেওয়া—কারণ তার মতে হরচরনের মত ভালো কাজের আর বিশ্বাসের চাকর এবাড়ীতে কখনও আসে নি।

শেষ পর্যন্ত নেধু ডাক্তার আমার পায়ের জন্যে ভালো ওসুধ ও মালিশ দিয়ে গেলেন। তাতে অল্প দিনের মধ্যেই আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলুম,—আর শুরু করলুম চাকুরী। অম্বিকা দারোগার গৃহ-ভৃত্যের জীবন।

হরচরন আমার চাকুরী জীবনের আদর্শ। গিন্নীমা প্রতেক কাজে তারই শুধু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন—চরন এমন করত, চরনের মত চলবে। চরনকে কিছু বলে দিতে হত না। ঘুম থেকে উঠেই সে চা করে দিত, ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসত। রান্না সারত কর্ত্তা-বাবু থানা যাবার আগে। বড় মেয়েদের স্কুলে যাবার আগেই সব কাজ শেষ করে গিন্নীমার জন্যে পানের খিলি তৈরী করে রাখত—তারপর ঘর দোর সাফাই করে, কাপড়-চোপড় কেচে খেত। আবার খেয়ে উঠেও এক মিনিট সে বিশ্রাম করত না। বিকালের কাজে লেগে যেত। সন্ধ্যার আগেই বিকালের সব কাজ সেরে গিন্নীমার কাছে পাড়ার গল্প বলতে বসে যেত। হরচরনের চরণের সমান হতে পারব কিনা সব শুনে আমার ভয় হল।

কিন্তু ভয় কাটল, দারোগাবাবু যখন গিন্নীমা বাথরুমে যাবার পর তার নিজস্ব উপদেশ গুলি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন—দেখো হরচরনের মত চললে আমার চলবে না। কাজ কর্ম্ম সেরে ঘরে তার মন টিকত না। সে এ পাড়ায় ও পাড়ায় ঘোরাফেরা করত। কোন কথা শুনত না। চোর-ডাকাতের সাধ্য ছিল না, তার দৃষ্টিকে ফাঁকি দেয়—কিন্তু হরচরন অবিরত তার চোখে ধুলো দিত। তার উপর তার কিছু শাসন খাটত না। তোমাকে হরচরনের মত হলে

চলবে না।

বুঝতে পারলুম দারোগাবাবু হরচরনকে দু-চোখে দেখতে পারতেন না। কিন্তু গিন্নীমার জন্যে তাকে তাড়ানো তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। শেষে যখন তাকে দুষ্ট ব্যাধিতে কাবু করল, ডাঃ সর্ব্বানীতোষ বোস বুঝিয়ে দিলেন এমন চাকর ঘরে রাখলে সকলের দেহে ছড়িয়ে পড়বে রোগ তখন আর গিন্নীমা তাকে চাকুরীতে বহাল রাখতে পারলেন না। কিন্তু মনের গভীরে তিনি চাইছেন হরচরন ভৃত্যকে। আমার মধ্যেই তিনি হরচরনকে ফিরে পেতে চাইছেন। আর দারোগাবাবু চাইছেন—হরচরন যেন আমার মধ্য দিয়ে ফিরে না আসে কখনও। আমি কোন পথে যাই?

পথ সম্বন্ধে কখনও কোন চিন্তা আমি করিনি। অবস্থা বিপাকে যা করতে হয়েছে করেছি, যখন যা মনে এসেছে তাই করেছি। ফল কি হবে ভাবিনি—আশা করিনি কিছু। আমার সেই এক পথ। আমার ভৃত্য-জীবনেও এটুকু ঠিক বুঝেছি—প্রভু-প্রভুপত্নীর কৃপা লাভ করা, কৃপা থেকে বঞ্চিত হওয়া অদৃষ্টের চক্রান্ত, সে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আর একথাটা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেতে এক মাস সময়ও লাগল না।

সেদিন সন্ধ্যা হয়নি তখনও। বাড়ী সম্পূর্ণ খালি। দারোগাবাবু থানা থেকে ফেরেননি। মেয়েদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণের উৎসব। তাদের সঙ্গে ছোট ভাই দুটিই স্কুলে গেল। আমিই পাঁচজনকে নিরাপদে স্কুলে পৌঁছিয়ে দিয়ে এসেছি। আসার পথে দোকান থেকে গিন্নীমার জন্যে দুই খিলি মিঠে পান নিয়ে এসেছি। কট কট করে কড়া নাড়তেই গিন্নীমা এসে দরজা খুললেন। আমি ঘরে ঢুকেই তার হাতে পান দুটি রাখলুম। আমার হাত থেকে পান নিয়েই তিনি খুশি ভরা চোখে বললেন, 'আয়, যাদু দেখবি কে এসেছে?' গিন্নীমা এগিয়ে চললেন, বসবার ঘরে গেলেন না, শোবার ঘরে গেলেন না, একেবারে সোজা চলে এলেন আমার আস্তানায়। সেখানে আমার খাটিয়ায় দেখতে পেলুম একটা লোক বসে আছে। তার পরনে ড্রেন পাইপ, গায়ে চিত্র বিচিত্র রঙের হাওয়াই সার্ট। বয়স ত্রিশ পেরিয়ে গে'ছ, রঙ কালো, চোখে যেন শয়তানের দৃষ্টি। ঠোঁটে একটা দুষ্টু হাসি লেগেই আছে। গিন্নীমা তার সামনে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে আমার চেনা পরিচয় করিয়ে দিলেন: এই হচ্ছে আমাদের চরণ। যার কথা তোমায় বলেছি। আমাদের একেবারে বাড়ীর ছেলের মত ছিল।

আমি হাত তুলে নমস্কার জানাতেই গিন্নীমা আবার বলতে সুরু করলেন: এ হচ্ছে যাদু, আমাদের নূতন লোক। তোমাকে তো এতক্ষণ বলেছি এর কথা। খুব ভাল ছেলে। তবে ততটা চালাক নয়। সহরে এসেছে। চালাক হয়ে যাবে। তুমি ওকে নিয়ে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাস্তাঘাট চিনিয়ে দেবে,—খারাপ জায়গা কোথায়—কোথায় চলাফেরা ভয়ের সব বুঝিয়ে দেবে। বুঝলে চরণ। যাও তো যাদু, চরণের সঙ্গে একটু ঘুরে-ফিরে এস।—বলেই তিনি শোবার ঘর থেকে দারোগাবাবুর একটা সার্ট এনে দিলেন তার হাতে। স্নেহের সুরে বললেন—'নাও, চরণ, এই জামাটা। তোমার গায়ে লাগবে নিশ্চয়ই, নূতনই আছে। পাঁচ বছর আগে বাবু করিয়েছিলেন,—একদিন মাত্র পরেছেন। তারপর থেকে এমনি পড়ে আছে।'

'আমি জানি' ব'লে চরণ গিন্নীমার হাত থেকে জামাটা নিল। ইস্ত্রি করা জামাটা একটা কাগজের ভাঁজের মধ্যে রাখল, তারপর উঠে দাঁড়াল। এবার সে যাবে। গিন্নীমা আমাকে আবার উপদেশ দিলেন: সাবধানে যাবে, ঘুরে-ফিরে সব বুঝে-শুনে মেয়েদের স্কুলে যাবে। ওদের সঙ্গে নিয়ে তবে বাড়ী ফিরবে। আর সাবধান। চরণ এসেছিল একথা কেউ যেন জানতে না পারে। সাবধান!'

গিন্নীমার 'সাবধান' বলার ভঙ্গিতে যে কতখানি তেজস্বিতা, মৃদুতা, সাহস আর ভয় মেশানো ছিল তা নিজে প্রত্যক্ষ না করলে প্রত্যয় হবার কথা নয়। আমি মাথা নেড়ে বললুম—আপনি যেমন বলবেন—তার অন্যথা হবে না। গিন্নীমা মৃদু হেসে চরণের দিকে তাকিয়ে বললেন: হ্যাঁ—যাদু আমার ছেলে ভাল।

হরচরণের প্রজাপতি গোঁফের নীচে ঠোঁটে যে বঙ্কিম হাসি ফুটল তার অর্থ আমি বুঝতে পেরে বড় লজ্জা পেলাম। আমি তার পেছন পেছন বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলুম।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে একটা সিগারেট ধরাল হরচরণ।

আমাকে সধিল আর একখান। ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বললুম, 'ও রসে বঞ্চিত, দাদা।'

'তা হলে একটা পান খাও,' বলে হরচরণ দুটি পান কিনল। একটা আমায় দিল, আর একটা নিজের মুখে পুরল। পথ চলতে সুরু করল হরচরণ। আমি তার পেছন পেছন সমান তালে পা ফেলে চলেছি। হরচরণ একটু থেমে মুখটা ফিরিয়ে বলল—গিন্নী বড় ভাল মানুষ যাদু। এমন সতী-সাধ্বী মেয়েছেলে আর আমি দেখতে পাইনি। যতদিন এ-বাড়ী ছিলুম শুধু তার জন্যেই ছিলুম। নইলে ট্রাম কোম্পানীর যে চাকুরীটা এখন করছি আগেও পেতে পারতুম। শুধু এই একটি মানুষের মায়া কাটাতে পারলুম না। কত কাজ যে ওর করেছি তার অন্ত নেই। আর চাকরের মত তো এখানে ছিলুম না। ছিলুম আত্মীয়ের মত। গিন্নীকে বড়দি বলে ডাকতুম—দারোগাবাবুকে জামাইবাবু। ছেলেমেয়েগুলি বাড়ী থাকলে দেখতে পেতে কেমন আমায় মামা বলে এসে জড়িয়ে ধরে, আমার পকেট খুঁজে যা পায় তা নিয়ে নেয়—বড় মেয়েটা পর্যন্ত। জান, পাঁচ বছর এ-বাড়ীতে কাটিয়ে গেলুম, একটা পয়সা মাইনে নিয়ে যেতে পারি নি। কুড়িটি করে টাকা মাসের শেষে পেয়েছি। কুড়িটি টাকাই নিঃশেষে ছেলেমেয়েদের বিলিয়ে দিয়েছি—ওরা কেড়ে নিয়েছে।

'আপনি মহাপ্রাণ' সপ্রশংস চোখে বললুম আমি। হরচরণের মুখখানা খুশিতে গৌরবে যেন জ্বল জ্বল করে উঠল। বললো, 'জানো? এমন সতী-লক্ষ্মী নারীর কপালে স্বামী জুটেছে একটা লম্পট। নিজে যত সব খারাপ মেয়ে মানুষের বাড়ী ঘুরে বেড়াবে রোজ রাতে। আর স্ত্রীর উপর করবে অত্যাচার, তাকে অবিশ্বাস করবে, তার নামে মিথ্যা কথা রটাবে, ওর জিভ দিয়ে কিনা বেরুল একদিন—'শৈলজা,—তুই হরচরণকে নিয়ে আমার বিছানায়—'

এমন মিথ্যা অপবাদও আমায় শুনতে হল। তার জন্যেও কিছু নয়, এমন সতীলক্ষ্মী দেবী-চরিত্রে দোষারোপ আমার সহ্য হ'ল না। নিকুচি করি তোর চাকুরীর। চলে এলুম। পরের দিন ট্রাম কোম্পানীর চাকুরীতে ঢুকে গেলুম। কিন্তু ভাই জানো, বড়দির জন্যে মনটা কেমন করছিল, বাড়ীটা খালি মনে করে ঢুকলুম। দেখলুম সত্যি খালি। বড়দি আমায় দেখে কি যে খুশি হলেন। বললেন, চরণ তুই আমার কত কাজ করতিস, কত খবর আনতিস। এখন কেউ নেই। যাদু তো ছেলে মানুষ, সোজা। এত সব বোঝে না। তুই চলে যেতে আমার সব দিক অন্ধকার হয়ে গেছে। তুই ছিলি আমার চক্ষু।' সত্যি বড়দি আমার চোখ দিয়ে দারোগাবাবুর নানা কুস্থানে যাতায়াতের দৃশ্য দেখতেন, রাত্রে তা নিয়ে দুজনে যুদ্ধও হত, আমি তা বুঝতে পারতুম। আমি চলে যাওয়াতে যেটা বদমাস এখন বড় সুখে আছে। বড়দি তাকে আর আক্রমণ করতে পারছেন না। আমি এখানে নেই, তাকে পাজীটার দুষ্কর্মের খবর দেবে কে? বড়দি চায় তোমাকে আমি সব যাতায়াতের জায়গা, ইন্দুমতী, নীলপরী, আর রাবণের বাড়ী দেখিয়ে দিই। তুমি ওদের বাড়ীগুলি জেনে রাখবে, আর আশেপাশের পানের দোকান থেকে, বাড়ীর আড়ালে দাঁড়িয়ে বদমাসটার চলাফেরা লক্ষ্য করবে আর বড়দিকে জানাবে।'

'কিন্তু গিন্নীমা তো আমাকে কিছু বলেন নি?'

'বলবেন কি করে? দুদিন এসেছ, বড়দির সঙ্গে তেমন সহজ ভাবও হয় নি। নিজের সংসারের গলদ, নিজের মনের দুঃখ হঠাৎ একজনকে বলা যায় কি?'

কথা বলতে বলতে আমরা একটা পার্কের ধারে পৌঁছে গেলুম। হরচরণ আমার হাত ধরে টেনে পার্কের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। পার্কে ছোট ছেলে-মেয়েরা খেলা করছে। একটা বেঞ্চিতে বসে আমাকে পাশে বসাল হরচরণ। সেখান থেকে একটা চারতলা বাড়ীর তেতলার ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ঐটা হচ্ছে রাবণের বাসা।'

'রাবন মানে?

'রাবণ মানে? একটু বক্র হেসে বলল চরণ, রাবণ মানে যে সতীকে চুরি করে অশোক কাননে নিয়ে রেখেছিল, অত্যাচার করেছিল।'

'সেই রাবণ এইখানে?'

'কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না? সেই এইখানে।

বিপরীত ভাবে। সেই আমাদের সীতা দারোগা বাবুকে তার ঘর থেকে চুরি করে নিয়েছে। সেখান থেকে সীতার আর মুক্তি পাওয়ার উপায় নেই। রাত্রি হলেই সীতাকে সেখানে যেতে হয়। নগ্ন এলোকেশী বিকটাকার রাবণ সীতাকে নগ্ন করে বলাঘাত করে। সে-আঘাতে পুলকিত হয় সীতার সর্বাঙ্গ। চোখ ডাকাত, পকেটমার যার মারের আর তর্জনের ভয়ে কাঁপতে থাকে তিনি বারণের চাবুকের সামনে অশোক বনের সীতা। বিশ্বাস হচ্ছে না তো?

'সব হেঁয়ালি মনে হচ্ছে।'

'হবারই কথা। এত বড় জোয়ান মরদ মানুষটা ঘরে এমন সুন্দরী সাধ্বী স্ত্রী ফেলে এখানে এসে একটা বিকটাকার জঘন্য মেয়ে মানুষের চাবুক খায় কেন? চাবুক খেয়ে তার কোলে সোহাগে লুটিয়ে পড়ে কেন--কিছু বুঝতে পারি না। প্রথম যেদিন আমাকে এর দৃশ্য দেখালে ঐ বাড়ীর পাশের পানের-দোকানওয়ালা রাবণের ঘরের দরজার ফুটো দিয়ে; সেদিন আমার কি রকম তাজ্জব লেগেছিল তোমায় কি বলব? আমার মনে হয়েছিল আমি স্বপ্ন দেখছি। একটা দুঃস্বপন। ভেবেছিলুম বড়দিকে একথা বলবো না—কারণ দিদির বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু জেরার পর জেরায় অস্থির হয়ে আমি সব ঘটনা বললুম। ঐ খাণ্ডারণী মেয়েটাকে দারোগাবাবু রাবণ বলে সোহাগে গড়িয়ে পড়েন সেকথাও তাঁকে বলেছি। বড়দি কিছু অবিশ্বাস করেন নি—এতটুকু অবাক হন নি—সবই যেন তার জানা। আমি শুধু তাঁর অশান্তির কারণ বাড়িয়ে দিলুম।

'সবই যদি জানা হবে, তবে আমাদের খবর নিতে পাঠিয়ে লাভ?

তুমি ছেলে মানুষ। মেয়ে মানুষের মনের কথা বুঝবে না। ঘরে দিবারাত্র কাজ করছে। ছেলেমেয়ের খবর নিচ্ছে সব করছে—কিন্তু মন পড়ে আছে মরদ কখন কোথায় গেল—কোন ফুলটার কাছে গিয়ে কী কীর্তি করল। বড়দি হচ্ছে সেই শ্রেণীর মেয়ে। সে ঘরের বউ—সতী সাধ্বী। স্বামীর চরিত্রদোষে তার মন উচাটন। সে উচাটন যেন কিছুক্ষণের জন্যে শান্ত হয়ে যায়, আমি যখন ওর দুষ্কর্মের বর্ণনা দিয়ে যাই,—তিনি নিবিষ্ট মনে শুনেন, কেমন যেন হারিয়ে যান এ বর্ণনার মধ্যে। তারপর কাঁদেন, মনে করেন,—অভিমান করেন—মেয়েদের বকেন। ছেলেদের মারেন—স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করেন। আবার তার আর কীর্তি-কলাপ শোনবার আগ্রহে আমাকে ধরে বসেন। তাঁর দুঃখে মনটা গলে যায় বলেই কত বিপজ্জনক ভাবে যে বদমাসটার পেছন পেছন ঘুরেছি। বড়দির হলো নেশা তার স্বামীর কাহিনী শোনা—আর আমায় পেয়ে বসল তার গোপন সব কাজ আবিস্কার করার নেশায়। সেই নেশায় পাঁচটা বছর কাটিয়ে দিলুম। কিন্তু কি অবাক কাণ্ড যে পাষণ্ডটা বেবুশ্যে মেয়ে-মানুষের চাবুক খায়, ঘরে এসে বাঘ হয়ে যায়। আর নিরীহ বৌটার উপর অত্যাচার করে—তাকে মারধোর করে। তার চেয়েও আরও অবাক হওয়ার ব্যাপার যতক্ষণ না তাকে মার দিচ্ছে বদমাসটা ততক্ষণ যেন বৌটার শান্তি কিছুতেই নেই। সে নানা ভাষায় জিভের ঝাল যত আছে সব ঝাড়ে।

'সব আজব ব্যাপার।'

'হ্যাঁ সব দেখবে, আস্তে আস্তে সব বুঝবে। মেয়ে-গুলির সঙ্গে কেমন জমছে?'

'তেমন কিছু নয়।'

'ভায়ার দেখছি একেবারে রস কস কিছু নেই। দেখবে ওরা আসবে। বড় আর মেজ আসবে। মাইনে-টাইনে কিছু পেয়েছ?'

'না। একমাসও ত এখনও হয় নি।'

'হয় নি? যখন হবে, তোমার পকেটে টাকা আসবে কয়টি, বড় আর মেজ আসবে। তোমায় সিনেমা দেখাও, লজেন্স খাওয়াও বলে ধরবে। আর এসব দিয়ে যদি এক-বার ওদের সঙ্গে জমাতে পার, যা খুশি তুমি করতে পারবে ওদের নিয়ে—যতখুশি মজা লুটতে পারবে। আমি তো ভাই একটি পয়সাও রাখতে পারতুম না মাইনে থেকে। ওদের ফরমাস জোগাতেই সব চলে যেত।'

'তা হলে খুব মজা লুটেছেন?'

'হু—খুব।'

হরচরণের চেহারা যেন বদলে গেল। গিন্নীমার প্রতি সহানুভূতিতে যে মুখখানা করুণ দেখাচ্ছিল, সেই মুখে

যেন শয়তানের ছায়া পড়ল। তার ঠোঁটে যেন লালসার আগুন জ্বলে উঠল। যে বেঞ্চিটায় বসেছিলুম, তার উপর ডান হাতটা চাপড়ে বলল—জান, বড় আর মেজ দুজনেরই সর্বনাশ করেছি আমি এই বেঞ্চির উপর বসে। কেনই-বা আমি ছেড়ে দেব। আমি জান দিয়ে খেটে টাকা পাব, আর তোমরা আমার পকেট মেরে নেবে আমায় কাতুকুতু দিয়ে। সে হবে না। আমায় কিছু দিয়ে যেতে হবে বদলে। বদলে অবশ্য আদায় করেছি, ছোট-খাট অনেককিছু। কিন্তু যেদিন দেখলুম বদমাসটা এক নার্সের কুমারী মেয়েকে এনে রেখে দিলে রাবণের ঘরে, আর রাবণের সামনে ফেলে তার সর্বনাস করলে তখন যেন আমার একটা প্রতিহিংসা জাগল। সেইদিন রাতেই বড়র সর্বনাশটি করলুম। জান, আমার কাঁধে একটা ধাক্কা দিয়ে বললে চরণ—সেদিন রাত্রি বেশী হয় নি, বড়কে গিয়ে বললুম, একখানা টিকিট পেয়েছি ন-টার শো-এর। বড় তার মার কাছ থেকে অনুমতি আদায় করলে। মেজ হিংসায় জ্বলতে লাগল। তাকে আশ্বাস দিলুম, পরে একদিন দেখাব। কী একটা ছবি এসেছিল বড় ভিড় তাতে। তাই আগ্রহ ওদের বেশী। সিনেমা দেখে বাসায় যখন ফিরছি এই পথ দিয়ে। এই পার্ক একদম নির্জন, তাকে নিয়ে বেঞ্চির উপর বসলুম—তার একদিন পরে নাইট শো-এর শেষে বসলুম মেজকে নিয়ে। তারপরে কিন্তু এই পার্কে আসতে হয়নি। তারা আসত রাতে, তুমি যে খাটিয়ায় শোও তার উপরে।'

'কিন্তু মেয়ে একটা ছোটটি, দেখতে যেমন সুন্দর। তেমন স্বাস্থ্য—তেমন তেজী। তার গায়ে হাত ছোঁয়াবার উপায় নেই। দশ হাত যেন আগুন জ্বলে উঠে। সত্যি দারোগার মেয়ে। একটু আদর করবার উপায় নেই।—সাবধান, তার কাছ থেকে দূরে থাকবে।'

'আমি সকলের কাছ থেকেই দূরে থাকছি, দাদা।'

'তোমার একদম রসকস নেই দেখছি। আগে কোথায় চাকুরী করতে?'

'আগে? ভিক্ষে করতুম।'

'ভিক্ষে!' শুনে যেন হরচরণের রাগ হলো। সে এতক্ষণ একটা ভিখারীর সঙ্গে এত গোপন রসের কথা বলছে! সে উঠে পড়ল, 'চল্' বলে। ভিখারীকে আর তুমি বলা চলে না। গলির একটা ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, এই ঘরটায় আমি থাকি, ৫৯ নং বাড়ী। মিঃ এইচ, সি, রায় বললেই আমাকে পাবে। থাক, পরে তোকে দেখিয়ে দেব, দরকার হলেই আমার কাছে আসবি, বুঝলি। এখন চল ইন্দুমতী আর নীলপরীর বাড়ীটা তোকে দেখিয়ে রাখি।

এবার হরচরণ দ্রুত চলল। আমার আগে আগে একটা ভিখারীরকে সঙ্গে নিয়ে চলতে পারে মিঃ হরচরণ? তার এতে সম্মানের হানি। আমি বেশ পেছনে পড়ে গেলুম। ইন্দুমতীর বাড়ীর কাছে পৌঁছেছি। কোথা থেকে দেখি দারোগাবাবু এসে খপ করে ধরল হরচরণের ঘাড়। তার বগলের তলা থেকে টেনে নিলেন কাগজে জড়ানো সার্জের সার্টটা। গর্জন করে বললেন—ব্যাটা আমার সার্টটা চুরি করে এনেছে? আরো লোকজন এসে ঘিরে ফেলল দুজনকে। আমি ভয়ে ভয়ে বাড়ী ফিরে এলুম। খবরটা জানালুম গিন্নীমাকে। তিনি রাগে দুঃখে আতঙ্কে যেন শিউরে উঠলেন। 'চরণের কি হবে গো' বলে কাঁদলেন। তারপর হঠাৎ রেগে উঠলেন। সে রাগটা যেন আমারই উপরে। 'সাবধান, কখনও বলবে না,—চরণ এ-বাড়ী এসেছিল। চরণকে তুই জানিস একথা কেউ যেন জানতে না পারে। চরণের ঘরটা তোকে দেখিয়েছে?'

'হ্যাঁ, মা।'

কিন্তু সেই ঘরে যাওয়ার আমার কোন সুযোগ হলো না। দারোগাবাবু হরচরণকে কলে ফেলবার সুযোগ খুঁজছিলেন। সত্য মিথ্যা নানা মামলার প্যাঁচে ফেলে তাকে দুব বছরের জন্যে শ্বশুর বাড়ী পাঠালেন। আর সে খবর শুনে গিন্নীমা আমার ঘরে বসে একদিন এমন কাঁদলেন—তার একটা ছেলের যদি জেল হ'ও—এমন কাঁদতেন কিনা সন্দেহ।' আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলি কেঁদে কি হবে গিন্নীমা, হরচরণবাবু তো দুবছর পরেই চলে আসবেন।'

'বেচারার কত কষ্ট হবে।'

'পুরুষ মানুষ—'

কথা শেষ করতে না করতেই গিন্নীমা চলে যান। আমি ভাববার সুযোগ পাই। বিকাল সাড়ে চারটে থেকে ঘন্টা খানেক আমার ছুটি। আমি খাটিয়ার উপর নির্জীবের মত শুয়ে শুয়ে ভাবি। আমার ঘরের দরজা খোলা। ঘরের পেছনটায় একটা জানালা আছে। সেও আজ খোলা। আকাশের এক টুকরো চোখে পড়ে। জানালার ফ্রেম আকাশ থেকে এক টুকরো কেটে দিয়েছে আমাকে। অসীম চেতনা থেকে আমিত্বের এক ফ্রেম যেন সৃষ্টি করেছে আমার ব্যক্তি-চেতনাকে। আমি ভিখারী ছিলুম। সারাটা আকাশ চোখের সামনে ছিল দিবারাত্র। খোলা চোখে দিবারাত্র দেখেছি শিয়ালদার পথে মানুষের স্রোত। লক্ষ্য করেছি নির্জন রাতের নর-নারীর গতিবিধি। লক্ষ্য করেছি আকাশের কোন তারা ঘুরছে কোন তারার পেছনে। দেখেছি কত তারকার পতন। শিহরিত হয়ে স্মরণ করেছি সপ্ত ঋষিকে।—সপ্ত ঋষি ঘুরছে ধ্রুব নক্ষত্রের চারিদিকে। ধ্রুবকে ফেলে তাদের যাবার উপায় নেই। আমার জীবনেও বোধ হয় তাই—পুলিশ দারোগা থেকে বুঝি দূরে যাবার উপায় নেই। যাই হোক দারোগা-বাবুর যত নিন্দাই করুক হরচরণ—তাকে তত খারাপ আমার লাগেনি। মেয়েদের যা কুৎসা গেয়েছে সেটাও বিশ্বাসের যোগ্য নয়। অবশ্য বিশ্বাস অবিশ্বাস আমি কিছুই করিনি। এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। মাইনে এক মাসের পেয়েছি। গিন্নীমাই দিয়েছেন—গুনতি করে পনরটি এক টাকার নোট। এতগুলি টাকা কত দিন দেখিনি। ছেলে-মেয়ে কেউ আমায় পয়সা দাও, পয়সা দাও করে ধরে নি—সিনেমা দেখাও বলে রাত্রে এসে হাজির হয়নি বড়, কিম্বা মেজ, আমিই একটা টাকা খরচ করে লজেন্স কিনে সবাইকে বিলিয়ে দিলুম। গিন্নীমা তা' লক্ষ্য করে বললেন কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে—এ সব কেন করছ যাদু, মিছিমিছি পয়সা নষ্ট। তোমার বুঝি টাকা পয়সার দরকার নেই?'

'বলেন কি, টাকা পয়সার দরকার নেই এমন মানুষ আছে?'

'তবে মিছি মিছি পয়সা নষ্ট করছ কেন? আসল কথা হচ্ছে চাকরের পয়সায় ছেলে-মেয়েদের লজেন্স খেতে দেখে গিন্নীমার কেমন যেন লেগেছে—একটা ভিখারীর কাছে মনের কথা বলেনি, হরচরণ রায়ের যেমন লেগেছিল।

ক্রমশঃ

সাময়িকী

কাছাড়ের বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যার কবলে

দীর্ঘদিন ধরে খরা ও অনাবৃষ্টি চলার পর গত কয়েক-দিনের অবিরাম বর্ষণের ফলে কাছাড় জেলায় প্রবল বন্যা দেখা দিয়েছে। জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যা কবলিত হয়েছে। বরাক, কুশিয়ারা, লঙ্গাই, সোনাই ও জেলার অন্যান্য নদীর জল অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জলস্তর বহু ক্ষেত্রেই বিপদসীমা থেকে অনেক উপরে। বহু এলাকার জনবসতি ও জমিজমা প্লাবিত হয়েছে। সহস্রাধিক পরিবার ঘর বাড়ী ছেড়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। বুধবার রাতে করিমগঞ্জ শহর এলাকায় কুশিয়ার জল অত্যন্ত বিপজ্জনক ভাবে বাড়তে থাকে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ শহর এলাকায় যাতে জল ঢুকতে না পারে তার জন্য সাময়িক ব্যবস্থা নিয়েছেন। কালীবাড়ী রোডে নদীর পাড়ে প্রচুর বালির বস্তা দেয়া হয়েছে। শিলচরে অন্নপূর্ণা ঘাটে জলস্তর বিপদসীমা ছাপিয়ে গেছে ২০ সেণ্টিমিটার।

শিলচর শিলং রোডও এই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোথাও কোথাও ধস নেমেছে। করিমগঞ্জ শিলচর ও করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি রোডে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। চারগোলা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত সড়কের উপর জল থৈ থৈ করছে। বহু স্থানেই বাঁধ ভেঙ্গে পড়ায় অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের পাথারকান্দিস্থ সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে পাথারকান্দি শহর রক্ষার জন্য নির্মিত বাঁধটি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হওয়ায় এক বিপজ্জনক অবস্থা দেখা দিয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ সেখানে পরিস্থিতির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন। পুলিশ ও হোমগার্ডকেও সতর্ক রাখা হয়েছে।

করিমগঞ্জ শহরের বাজার এলাকায় চড়াকুড়ি, চরবাজার, হাসপাটি, মদনমোহন রোড এলাকায় জল অত্যন্ত দ্রুত-গতিতে বাড়ছে। বাজার এলাকার সবগুলো সড়ক, ঘর-বাড়ী, দোকানপাট জলমগ্ন। বন্যার ফলে জেলার গ্রামাঞ্চলের মানুষ বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী বণ্টনের এবং বিপন্ন চাষীদের সহায়তার জন্য সরকার এগিয়ে না এলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে। —"যুগশক্তি"

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য্য সমীপেষু

বামফ্রন্ট সরকারকে ধন্যবাদ। তাঁরা গ্রামবাসীদের চিকিৎসার অপ্রতুল ব্যবস্থার প্রতি সময়োচিত দৃষ্টি দিয়েছেন। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের চিকিৎসার অসুবিধা দীর্ঘকালের। বস্তুতঃ প্রতি বছর হাজার হাজার গ্রামবাসী বিনা-চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হন। গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী আশীভাগ লোকের চিকিৎসার অসুবিধা দূর করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার তিনটি মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং তার একটি উত্তরবঙ্গে স্থাপন করা হবে। এই "কমিউনিটি মেডিক্যাল প্রাকটি-সনার্স" এ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হবার সুযোগ পাবেন। উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঁচ বছরের জন্য অবশ্যই গ্রামাঞ্চলে কাজ করতে হবে এবং তাঁরা ইচ্ছা করলে এম, বি, বি, এস (কনডেন্সড) পরীক্ষাতে বসবার সুযোগ পাবেন।

উত্তরবঙ্গে প্রস্তাবিত মেডিক্যাল স্কুলটি আমরা জলপাইগুড়ি শহরে স্থাপনের দাবী জানাচ্ছি। ইতিমধ্যে একটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে সুশ্রুতনগরে। বিপুল অর্থব্যয়ে তৈরী শহর থেকে বহু-দূরে অবস্থিত এই হাসপাতালের সুযোগ উভয় জেলার অধিবাসীর কেউ গ্রহণ করতে পারছেন না। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্যের আমলেই এই মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছিল।

(১) এখানে অতীতে জ্যাকসন মেডিক্যাল স্কুল নামে একটি মেডিক্যাল স্কুল ছিল। (২) জ্যাকসন মেডিক্যাল স্কুলের সুন্দর ঘরবাড়ী এবং তৎসংলগ্ন বিরাট

উন্মুক্ত প্রাঙ্গন আছে। (৩) স্কুলটির জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে আদায়ীকৃত পাঁচ লক্ষাধিক টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে যা বর্তমান মেডিক্যাল স্কুলটি স্থাপনের প্রাথমিক ব্যয়ের জন্য খরচ করা যেতে পারে। (৪) জ্যাকসন মেডিক্যাল স্কুলেই উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের প্রথম দিকের ছাত্রদের ক্লাস খোলা হয়েছিল। দুঃখের বিষয় এই জেলার সঙ্গত দাবী প্রত্যাখ্যান করে শিলিগুড়ি থেকে অনেক দূরে জনমানবহীন কাউখালি মৌজায় মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন করা হয় যা উভয় জেলায় অধিবাসীদের কারো উপকারে লাগেনি। (৫) জলপাইগুড়ি শহরে উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ ৮৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালটি 'জ্যাকসন মেডিক্যাল স্কুল' সংলগ্ন। উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের জন্য স্কুল সংলগ্ন হাসপাতালটির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এছাড়াও এই শহরে একটি টি, বি, হাসপাতাল ও অপর একটি মাতৃ-মঙ্গল হাসপাতাল আছে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত ননী ভট্টাচার্য মহাশয় প্রস্তাবিত মেডিক্যাল স্কুলের স্থান হিসাবে উক্ত 'জ্যাকসন মেডিক্যাল স্কুলটি' বেছে নেবেন। নূতন স্কুল নয়, পূর্বতন স্কুলটিই আবার খুলতে হবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য মহাশয় এই জেলারই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। জলপাইগুড়ি জেলাবাসীর আশা আকাঙ্খার সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত করবেন এবং স্থানীয় পূর্বতন স্কুলটি নবরূপে ও নবকার্যকারিতায় আবার চালু করবেন —এটা আমাদের বিশ্বাসই শুধু নয়, দাবী।—'ত্রিস্রোতা"

পরলোকে শ্রীমাণিকলাল দে

আমরা গভীর বেদনার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে ব্রহ্মসমাজ ও ব্রহ্মোপাসনার সহিত আজীবন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত অদ্বিতীয় কীর্তন-গায়ক পরমশ্রদ্ধেয় মাণিকলাল দে মহাশয় বিগত ২৯শে আশ্বিন ১৩৮৬ (ইং ১৬ই অক্টোবর ১৯৭৯) তাঁহার কলিকাতার ২১ বি ডাক্তার লেনস্থ বাসভবনে ৯২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। এই প্রেমিক ও ভক্তের মধুর কণ্ঠ নিঃসৃত হরিনামগান বিগত দুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাল ব্রাহ্মসমাজের উৎসবানুষ্ঠানগুলিকে মুখর করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুতঃ এমন এক সময় ছিল যখন তাঁহার প্রারম্ভিক সংকীর্তন গানকে বাদ দিয়া ব্রাহ্ম নর-নারী ১১ই মাঘের প্রাতঃকালীন উৎসবের কথা চিন্তা করিতে পারিতেন না। বীণাধ্বনির ন্যায় মধুর, শঙ্খধ্বনির ন্যায় বলশালী সেই কণ্ঠের নাম-কীর্তন যেন উপাসকমণ্ডলীর হৃদয়কে অন্তর্জগতের গভীর হইতে গভীরতম স্তরে লইয়া গিয়া ব্রহ্মসত্তায় তন্ময় করিয়া দিত। যতদিন সামর্থ্য ছিল তিনি তাঁহার মধুর কীর্তনের মাধ্যমে ব্রহ্মোপাসনাকে সরস ও আকর্ষণীয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইদানীং বার্দ্ধক্য হেতু তিনি স্বয়ং ব্রহ্মসমাজের উপাসনাদিতে যোগ দিতে পারিতেন না, কিন্তু আমাদের সহিত গভীর আত্মিক যোগ তাঁহার আজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল। আজ আমাদের মনে পড়িতেছে তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে সাধনাশ্রম ভবনে ব্রাহ্মসমাজের বন্ধু ও নিষ্ঠাবান সেবক এই বর্ষীয়ান ভক্ত গায়ককে সংবর্ধনা জ্ঞাপনপূর্বক একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজে সশরীরে তাঁহার সেই শেষ আগমন। তাঁহার তিরোধানে আমরা আমাদের শ্রদ্ধাপ্রীতির পাত্র এক পরম প্রিয়জনকে হারাইলাম। তাঁহারই আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীসুবোধরঞ্জন ও পৌত্রী কল্যাণীয়া শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী ব্রাহ্মসমাজের উৎসবানুষ্ঠানসমূহে তাঁহার প্রচলিত নামগানের ধারাটি বজায় রাখিয়াছেন আজ কৃত-জ্ঞতাভাবে সে কথা স্মরণ করিতেছি। ঈশ্বর তাঁহার দেহ-মুক্ত আত্মাকে চিরশান্তিতে চির আনন্দে রক্ষা করুন ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পত্নী পুত্রদ্বয় ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গের অন্তরে সান্ত্বনা দান করুন সর্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করিতেছি।

পরলোকগত মাণিকলাল দে মহাশয়ের মরদেহ নিমতলার শ্মশানঘাটে নীত হইবার কালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে আনীত হইয়াছিল। তথায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও কলিকাতা সাধনাশ্রমের পক্ষ হইতে মরদেহ পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয় ও শ্রীমতি আহ্‌মেদ প্রার্থনা করেন। শ্মশানে মরদেহের চিতারোহণের পূর্বে অধ্যাপক দিলীপ কুমার বিশ্বাস প্রার্থনা করেন ও শ্রীমতী সবিতা বসু ব্রহ্ম-সংগীত করেন।

বিগত ১৩ই কার্তিক ১৩৮৬ (ইং ৩১শে অক্টোবর ১৯৭৯) প্রাতঃকালে পরলোকগত মাণিকলাল দে মহাশয়ের কলিকাতাস্থ স্বভবনে অনুষ্ঠিত তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনার এক অনুষ্ঠান হয়। অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস উপাসনা করেন। শ্রীযুক্তা কমলা রায়, শ্রীসুবোধরঞ্জন দে ও শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দে সংগীত ও কীর্তন করেন। ব্রাহ্মসমাজের অনেক নরনারী অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

লক্ষশস্য

রাজা রামমোহন রায় প্রসঙ্গে

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

বাঙলা ১৩২৭ সনে সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন যে, কিছুদিন আগে 'প্রবাসী' পত্রিকা পাঠকদের নিকটে জানতে চেয়েছিলেন, এ যুগে বঙ্গদেশে সব চেয়ে বড় মানুষ কে। পাঠকদের ভোটে দেখা গেল, তিনি রাজা রামমোহন রায়। তিনি কেবল বাঙলার নয়, ভারতেরও বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। তিনি যখন এখানে জন্মগ্রহণ করেন, তখন এখানকার অবস্থা কিরূপ ছিল, রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে অথচ স্পষ্টভাবে তার বর্ণনা দিয়েছেন: "যখন আমাদের আর্থিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষীণতম, যখন আমাদের দৃষ্টিশক্তি মোহাবৃত, সৃষ্টিশক্তি আড়ষ্ট, বর্তমান যুগের কোনো প্রশ্নের নূতন উত্তর দেবার মতো বাণী যখন আমাদের ছিল না, আপন চিত্তদৈন্য সম্বন্ধে লজ্জা করবার মতো চেতনাও যখন দুর্বল, সেই দুর্গতির দিনেই রামমোহন রায়ের এ দেশে আবির্ভাব" (ভারত পথিক রামমোহন রায়, ১৯৬৫ সংস্করণ, পৃঃ ২৭)।

সেই শোচনীয় অবস্থাতে রামমোহন নিঃস্বার্থ ভাবে দেশ-সেবা ও জনহিতকর কার্যে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি কোন কাজ আগে করেছেন বা কোন কাজ পরে করেছেন, এবং কোন কাজের সূত্রপাত তাঁর পূর্বে হয়েছিল বা তিনি নিজেই কোন কাজগুলি আরম্ভ করেছিলেন এ-সব তর্ক-বিতর্ক করা নিষ্প্রয়োজন; তবে কতকগুলি কাজের যে তিনিই সূত্রপাত করেছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই যুগ-সন্ধিক্ষণে স্বদেশের জরা-জীর্ণ অবস্থা দূর করে ইহাকে উন্নত ও যুগোপযোগী করার জন্য যে সব উপায় ও ব্যবস্থার দরকার, সেদিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল এবং নিজের জীবন বিপন্ন করেও অত্যন্ত কষ্ট ও ধৈর্য সহকারে তিনি তাঁর করণীয় কার্য সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে খুব ব্যাকুল থাকতেন। কর্তব্য-কার্যে তিনি অগ্রসর হয়েছেন শান্ত, ধীর, স্থিরভাবে এবং যথাযথ বুদ্ধি-বিবেচনা করে। কোন কাজেই তিনি ঝোঁকের মাথায় কখনও অগ্রসর হন নি। তাঁর যেমন অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, তেমন অকাট্য যুক্তি নিয়ে তিনি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতেন। যুক্তিতর্কে তিনি ছিলেন অজেয়। ফরাসী প্রকৃতি-বৈজ্ঞানিক ভিক্টর জাকমঁ (Victor Jacquemont) ভারতে এসেছিলেন ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে এবং ঐ বৎসর তিনি রামমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎও করেছিলেন। ফরাসী দেশে থাকতেই তিনি রামমোহনের নাম শুনেছিলেন, কারণ ঐ দেশে তখন তাঁর নাম ছিল সুপরিচিত। তাঁর লেখা 'ভোয়াইআজ দ্যা ল্যাঁদ' গ্রন্থে আমরা রামমোহন-সম্বন্ধে কিছু মূল্যবান কথা জানতে পারি। জাকমঁ ছিলেন একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি; তিনি এ-দেশে কোন বিতর্ক বা বিরোধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। তিনি লিখেছেন, "Rammohun Roy is the learned Brahmin whose.....polemical works against Hindu theologians and European missionaries, have made his name well-known

even in France. Before coming out to India, I knew that he was an able orientalist, a subtle logician and an irresistible dialectician, but I had no idea that he was the best of men, ... There is vigour in his physiognomy, of calmness, dignity and goodness..... Endowed by nature with a feeling for religion, but freed from all prejudice." He isa practi-cal man. He is no: a bassionate idealist who attempts to realise impossible theories ; all that he wants to do is to bring about the possible good ; and however limited the measure of the possibility for the good may be, he is resigned to concentrate his effort within the channel in which it will be useful." (Modern Review, 1926).

আমাদের সেই অতীত অন্ধকার যুগে আমরা এমন আর কাউকে দেখতে পাই না, যিনি রামমোহনের মত স্বদেশের কল্যাণের জন্য এত বেশি কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িত করে অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। যে প্রবল বিরুদ্ধতা তিনি সময়ে সময়ে পেয়েছেন, তা সত্ত্বেও দৃঢ় অথচ শান্ত, অস্বাভাবিক ধৈর্য ও সংযমের সঙ্গে তিনি নিজের লক্ষ্যপথে অগ্রসর হয়েছেন, কখনও লক্ষ্যচ্যুত হন নি। আমাদের জাতীয় জীবনে গৌরব করার মত এমন কয়জন ব্যক্তি আছেন? ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি ও রাজনীতি প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল এবং যাতে জাতীয় জীবনের প্রত্যেকটি অঙ্গকে সুস্থ, সবল ও সুন্দর করা যায়, তাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। গরীবের প্রতি যে তিনি কতটা সহানুভূতিশীল ছিলেন, তা জানা যায় পরিষ্কার ভাবে ইংলণ্ডে সিলেক্ট কমিটির প্রতিবেদনে।

ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তিনি কখনও ভোলেন নি। তাঁর লেখা গ্রন্থসমূহ ও চিঠি-পত্র ইত্যাদি পাঠ করলে আমরা তাঁকে ভালভাবে বুঝতে পারি। বেদান্তের তিনি ছিলেন পরম ভক্ত এবং এই শাস্ত্র অনুযায়ী তিনি এক নিরাকার সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের সাধনা নতুনভাবে প্রচলন করেন। তিনি এমন যুগে জন্মেছিলেন যখন এই শাস্ত্র যা একসময়ে ছিল আর্য ধর্মের প্রধান সম্পদ, তা হয়েছিল বিস্মৃতির আড়ালে নির্মজ্জিত। স্বদেশে এই শাস্ত্রের পুনঃ প্রচলন এবং বিদেশে, ইংলণ্ড ইহার বাণী প্রচার তাঁর কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়। প্রাচীন-কালে মানবাত্মার ঐক্যের বাণী এই পবিত্র শাস্ত্রেই সর্বপ্রথম প্রতিবিম্বিত হয়েছিল এবং এই ঐক্যের ও মানব-প্রীতির বাণী দ্বারাই তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রাণীত হয়েছিলেন। তার মধ্যে অত্যাশ্চর্যভাবে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সর্বমানবের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরূক ছিল। আন্তরিক ধর্ম-পিপাসা তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল বিভিন্ন ধর্মমতের সঙ্গে সুপরিচিত হবার জন্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি বহুভাষা আয়ত্ত করেন এবং নানা ধর্মগ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করে ও তুলনামূলক-ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে তিনি বুঝতে পেরেছেন সকল ধর্মেই সত্য নিহিত ও মূল লক্ষ্যে তাদের মিল রয়েছে। তবে মানুষে মানুষে কেন এত ভেদ, অনৈক্য বা পার্থক্য থাকবে? জগতে তাঁর মত ধর্ম-পিপাসু উদার প্রকৃতির মহান ব্যক্তি অতি দুর্লভ। ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার যথার্থ বলেছেন, "এই মানুষের আবির্ভাবের জন্য কাল জমি প্রস্তুত করে রেখেছিল। বিশাল ভারতের কোন না কোন স্থানে তাঁর আবির্ভাব হতই। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল আমাদেরই বাংলাদেশে। ..... তাঁর মধ্যেই সর্বপ্রথম আধুনিক ভারতের কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল।" (ঊনবিংশ শতাব্দীর পথিক, পৃঃ ৩০-৩১)।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে রামমোহন গ্রহণ করেছেন, যা কিছু স্বদেশের পক্ষে কল্যাণকর ও উন্নতিমূলক হবে। পাশ্চাত্যের দিকে তিনি রিক্তহস্তে হস্ত প্রসারিত করেন নি। আচার্য যদুনাথের ভাষায়, India was not called upon to plume herself in the borrowed feathers of European civilisation. She had only to assimilate modern thought and modern arts into herinner life without any loss of what she had so long possesd." (Fall of the Mughal Empire, Vol. IV, p 348.)

ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা এখানে প্রবর্তনের বিষয়ে যে পত্রটি রামমোহন গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টের নিকটে পাঠিয়েছিলেন, তা বিশপ হেবারের মারফৎ প্রেরিত হয়েছিল। রামমোহনের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গী ইহাতে

সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। হেবার এই পত্র সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, "Ram Mohan, a learned native, remonstrated against this [orientalist] system last year, in a paper which he sent me to be put into Lord Amherst's hands, and which, for its good English, good sense and forcible arguments, is a real curiosity, as coming from an Asiatic." (Heber's Narrative, vol III, Second Edition, p, 360.)

ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রবর্তনের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন বাঙলা ভাষার উন্নতি ও প্রচারের জন্যও সচেষ্ট ছিলেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার রামমোহনকে নব্যভারতের পিতা ও যুগধর্মপ্রবর্তকরূপে অভিহিত করেছেন। এই উক্তির কারণও তিনি যুক্তিসহকারে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমরা যাঁদের মহাপুরুষ বলি, তাঁরা প্রত্যেকেই জাতীয় জীবন ও মনকে এমন একটি নূতন ভাব বা পথের সন্ধান দিয়ে যান যে বিশেষ পথ অবলম্বন করে মানুষ জীবনে অগ্রসর হয় ও উন্নতি লাভ করে। যে ভাবে অতীত ভারত বর্তমান যুগের ভারতে এসে পৌঁছোতে পারে সে পথের সর্বপ্রথম প্রদর্শক রামমোহন। আচার্য যদুনাথ আরও বলেছেন যে, যুগধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষগণ শিষ্যদের হাত ধরে চলেন না বা তাদের জন্য প্রতিপদে বিশেষ বিধিও দেন না। তাঁরা কেবল তাঁদের মূলমন্ত্রের ভাব সমাজে স্থাপিত করে ও মানুষের মধ্যে একটি নূতন শক্তি সঞ্চারিত করে যান, যা তাঁর অবর্তমানেও সুষ্ঠু ভাবে কাজ করতে থাকে। বৈজ্ঞানিক যুগের প্রবর্তক লর্ড বেকন। "তিনি বিজ্ঞান-চর্চায় সফলতা লাভের উপায়, বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিশুদ্ধ প্রণালী মাত্র নির্দেশ করিয়া, প্রমাণ দ্বারা জগতে প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই সাধারণ পদ্ধতি বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই ফলবতী হয়, সব সময়েই ইহা সত্য ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। কিন্তু বেকন কোন যন্ত্রনির্মাণের খুঁটিনাটি, বা বিশেষ দ্রব্যের জন্য বিশেষ বিধি, বা বিভিন্ন শাখার জন্য বিভিন্ন বিধি দিয়া যান নাই।" কিন্তু বিজ্ঞান-জগতে যে সমস্ত বিশেষ দ্রব্য বা নূতন নূতন যন্ত্র নির্মাণের খুঁটিনাটি ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়ে যাচ্ছে, সেগুলি বেকনের সৃষ্ট মহাবীজের ডালপালা। রামমোহন রায়ও সে রকম একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মনিষী, যুগধর্ম-প্রবর্তক। "কারণ, তিনি এই নব যুগের ভারতের জন্য বীজমন্ত্র দিয়া গিয়াছেন.....তিনি শুধু বলিয়াছেন যে যাহা আন্তরিক, যাহা সত্য বিশ্বাস, তাহাই পবিত্র, তাহাই ঈশ্বরের গ্রাহ্য, এবং সুস্থ, সবল, বাঁধন্ট মানব হৃদয় অতীত যুগের শৃঙ্খলা কাটিয়া নিজের গতির পথ নিজে করুক। এই একমাত্রই সাধারণ বিধিই, শুধু ধর্মে নয়, রাজনীতিতে, সমাজে, সাহিত্যে ও কলাবিদ্যায় নবজীবন আনিতে পারে। যে পরিমাণে আমরা রামমোহন রায়ের এই বীজমন্ত্র গ্রহণ করিব, সেই পরিমাণে আমরা নব্য ভারতকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারিব ;—সেই পরিমাণে আমরা লগত সভার মাঝে আমাদের উচিত আসন লইতে পারিব.....।" ('রামমোহন রায়ের কীর্তি", ভারতবর্ষ, ১৩২৬ সন)

রামমোহন ভারতের তমসাচ্ছন্ন পরিমণ্ডলে আবির্ভূত হয়ে ধ্রুবতারার মত এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে দেদীপ্যমান ছিলেন। তাঁর আবির্ভাবে ভারত গৌরবান্বিত হয়েছে। বর্তমান যুগে তিনিই সর্বপ্রথম ভারতের গৌরবময় প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাণী ইউরোপে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁকে যদি আমরা বুঝতে ভুল করি বা বুঝতে অসমর্থ হই, সে মানসিক দৈন্য-তো আমাদের। তাঁকে এ দেশের বর্তমান যুগের inauguratorই বলা হোক বা পিতা ও যুগধর্ম-প্রবর্তকই বলা হোক, তাঁর দুর্লভ ও মহৎ ভূমিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তিনি তাঁর বিদ্যাবত্তা, সৃজনী-শক্তি কঠোর শ্রম, স্বার্থত্যাগ, নিঃস্বার্থ সেবা ও মহানুভবতার দ্বারা এই দেশের নানাবিধ মঙ্গল সাধন করে আমাদের অপরিশোধ্য ঋণজালে আবদ্ধ করে রেখে গিয়েছেন। —"তত্ত্বকৌমুদী"

———

THE PRABASI
REGISTERED No. WB/CC—340 OCTO, NOVEM, DECEMBER, 1979
India Price : Single Copy Rs. 1.75 Quarterly Copy Rs. 5 00
Annual Subscription—Rs. 20 00
Phone : 24-5520

2 DEC 1983

Editor—ASHOKE CHATTERJEE
Printed and Published by Samindranath Sircar, Prabasi Press Private Limited
77/1/2/1, Lenin Sarani, Calcutta-13

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত—

প্রবাসী

সম্পাদক—অশোক চট্টোপাধ্যায়

মাঘ—ফাল্গুন-চৈত্র-১৩৮৬

প্রবাসী—১৩৮৬

সূচীপত্র

মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র

বিবিধ প্রসঙ্গ ১১৩
মহাপ্রয়াণে দিলীপকুমার – শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় ১১৭
স্তর – প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায় ২০১
কবি —অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায় ২০৪
টোডেরা জীবন্ত ফসিল —বিমলেন্দু চক্রবর্তী ২০৬
প্যাকেজ ট্যুরে দক্ষিণের মন্দিরে মন্দিরে—গৌরমোহন দাস দে ২১০
মানসিক রোগ—জাতি, শিক্ষা ও স্ত্রী পুরুষ ভেদে – সন্তোষকুমার দে ২১৭
বিজ্ঞান বিস্ময় —শ্রী কে, পি পাত্র ২২১
কতটুকু জানি—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য ২২৩
সুদূরের নীহারীকা – অরূপকুমার দাস ২৩০
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাষা ও শিক্ষা নীতি – কেন এই প্রতিবাদ —কানাইলাল দত্ত ২৩৮
পঞ্চশস্য — ২৪৯
না—হরিশ্চন্দ্র দাস ২৫৫

চরাচর

"সত্যম শিবম সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেনলভ্যঃ"

৮০তম ভাগ | দ্বিতীয় খণ্ড

মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র —১৩৮৬

৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

অবশেষে জনতা সরকারের পতন ঘটল। রাষ্ট্রপতি নতুন করে লোকসভার নির্ব্বাচনের পক্ষে রায় দিয়েছেন। শ্রীমোরারজী দেশাই দলগত সংখ্যা লঘিষ্ঠতা হারাবার পর শ্রী চরণ সিংকে মন্ত্রী-সভা গঠনের অনুমতি দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি। কিন্তু দেখা গেল চরণ সিং-এর পক্ষেও সংসদের ন্যূনতম সদস্য সংখ্যার সমর্থন পাওয়া কঠিন হয়ে উঠল। অবশেষে রাষ্ট্রপতি আর কাল বিলম্ব না করে নতুন করে লোকসভার নির্ব্বাচনের আদেশ দিলেন। রাষ্ট্রপতির পক্ষে মনে হয় এটা যথেষ্ট দূর-দর্শিতার পরিচয়। কারণ লোকসভার বর্ত্তমান সদস্যদের মতের অনৈক্যের ফলে দেশের প্রগতি যথেচ্ছ ব্যহত হয়েছে। এরপর এই অবস্থায় শাসকদলের নেতা হওয়ার যোগ্যতা সত্যিই এদের মধ্যে কারও আছে কিনা তা আজ সাধারণ মানুষেরই চিন্তার বিষয়। যদি এই অবস্থায় আর কেউ নেতা হন, তবে তাঁর পক্ষেও সংখ্যা-গরিষ্ঠ সদস্যদের স্থায়ী সমর্থন পাওয়া খুব সহজ হবে না।

স্পষ্টই দেখা যায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অপসারিত করতে যেমন করে জনতা প্রার্থীরা এক মন-প্রাণ হয়ে নির্ব্বাচনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সে ঐক্য তাঁরা ইন্দিরার পতনের পর লোকসভায় গিয়ে রাখতে পারেন নি। পারার কথাও নয়। কারণ এটা এখন সুস্পষ্ট যে নতুন করে জাতীয় ভাবনা নিয়ে এঁরা লোকসভায় আসেন নি। দেশ গভীর কাজে আজ যে নতুন চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন, তা কি এঁরা বাস্তি-

গত ভাবে করেও থাকেন, তবুও সেটাকে দলগত রূপ দিয়ে বাস্তবে প্রয়োগ করার ব্যাপারে এঁরা একেবারেই অক্ষম, এটা আজ আর কারোও কাছেই অবিদিত নয়।

প্রদেশিক দেশী বিদেশী সমস্যা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, দারিদ্র, মূল্য-বৃদ্ধি, বৈদেশিক সমস্যা, নানা সমস্যায় জর্জরিত ভারতের পক্ষে আজ লোকসভার সদস্যদের এই মতানৈক্য বিধাতার পরিহাস ছাড়া আর কি হতে পারে? আগামী নির্ব্বাচনে জন-সাধারণ কি রায় দেবেন, তা একমাত্র ভবিষ্যৎ বলতে পারে।

গত নির্ব্বাচনে সসম্মানে লোকসভায় এসেছিলেন জনতা দল। উদ্বেল ভারতবাসী তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সত্যিই ভাবতে অবাক লাগে, বিশাল ভারতের শাসন-ভার যাঁরা স্বেচ্ছায় বহন করতে চলেছেন তাঁরা কি সর্ব্বভারতীয় কোন এক নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা তাঁদের সামনে রাখেন নি? নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় করার অবসর কি তাঁরা পান নি? যদি না পেয়ে থাকেন তবে দুর্ভাগ্য সারা ভারতের। তার চেয়েও দুর্ভাগ্য-জনক যদি তাঁরা সে সুযোগ পেয়েও তার সদ্ব্যবহার করতে না পেরে থাকেন। রাষ্ট্রপতি তাঁর দূরদৃষ্টিতে সেটাই পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন। সকলের কাছেই আজ পরিষ্কার যে আজ নতুন করে ভারতের জনগনকে নতুন সদস্য নির্ব্বাচনের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। ইন্দিরা সরকারের বিকল্প সম্বন্ধে দেশের মানুষের অভিজ্ঞতা আজ অনেকখানি বাস্তব রূপ পেয়েছে। এই অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি হবে আগামী নির্বাচনের ফলাফল।

অস্পৃশ্যতা—

ভারত স্বাধীন হইবার পর দেশের নেতাগণ দেখিলেন যে ভারতবর্ষে বহু ক্ষেত্রে অনেক কিছু রহিয়াছে যাহা ভারতীয়দিগের সভ্যতার প্রাঙ্গণে অপরাপর জাতি সকলের তুলনায় অনগ্রসর ও প্রাচীন পন্থী করিয়া রাখিয়াছে। ইহা সকলের উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে বহু বিবাহ রীতি, জাতি ভেদ রীতি ও অস্পৃশ্যতা। ভারতের বহুস্থলে আজিও মেথর, ডোম ইত্যাদি জাতির জন্য বিশেষ ঘৃণা ধরণের কাজ সংরক্ষিত থাকে ও বহু অপ্রীতিকর কার্য্য শুধু এ সকল জাতির লোকেই করিয়া থাকে।

অবশ্য আইনয়ত অস্পৃশ্যতা ভারতে আজ নাই। স্বাধীনতা লাভের পরে যে সকল সমস্যার সমাধান অত্যাশ্যক বলিয়া দেখা গিয়াছিল তাহার মধ্যে অস্পৃশ্যতা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু আজও গ্রামে বহু প্রদেশে অস্পৃশ্য জাতির মানুষ যে কূপে সকলে জল তুলিয়া লয় সেই কূপ হইতে তাহারা জল তুলিতে পারে না ও বহু স্থানে তাহাদের সন্তানগণ জন্য উচ্চতর জাতির বালক-বালিকার সহিত নিকটে বসিয়া পাঠশালায় লেখাপড়া করিতে পারে না। সর্ব্বাপেক্ষা আপত্তি জনক হইল যে অস্পৃশ্য জাতির মানুষদিগের উপর আক্রমণ করিয়া তাহাদের প্রাণে মারা এবং তাহাদের গৃহে আগুন লাগান নারীদিগকে অপমান করা, ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন ও ভয় দেখাইয়া গ্রাম ছাড়িয়া পালাইতে বাধ্য করা।

সংবিধান অনুযায়ী অধিকার বা অধিকারের অভাব বিচার করিলে দেখা যায় যে অস্পৃশ্য জাতির মানুষের সকল অধিকারই পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান আছে; কিন্তু কার্য্যত দেখা যায় যে তাহারা উৎপীড়িত, অপমানিত ও ধর্ষিত। এই অন্যায় অত্যাচারের অবসান না হইলে ভারতের জগৎ জাতি সভায় মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইবার অধিকার থাকিবে না।

ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন—

ভারতের সর্ব্বত্রে কোন ভাষা রাজনীতি ও অর্থনীতির কর্ম্মে প্রচোলিত হইবে ইহা লইয়া বহুদিন আন্দোলন চলিতেছে। উত্তর ভারতের লোক হিন্দীভাষাকে ভারতের সর্ব্বত্র চালাইতে পরম উৎসুক ও দাক্ষিণ ভারতের লোক হিন্দীভাষা প্রচারের বিরোধে আপত্তি জানাইয়াছেন। ভারতের অন্য আঞ্চলিক ভাষা যাহা রহিয়াছে তাহা ব্যবহার করিলে সর্ব্বত্র ভারতে কেহ ইহা প্রচলিত করিতে পারিবেন বলিয়া সন্দেহ। আপাততঃ ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করিয়া সরকারি কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্য চলিতেছে। কয়েকটি প্রদেশে ইংরাজীকেই সরকারী ভাষা রাখিয়াছেন, যথা নাগাল্যাণ্ড। ইহারা সহজে হিন্দীভাষা শিক্ষা লইয়া সরকারী কার্য্য হিন্দীতে চালাইবেন বলিয়া ঘোর সন্দেহ।

কোন ভাষা ব্যবহার হইবে তাহা আলোচনা করিলেই সর্ব্বপ্রথমে সকলের বুঝিতে হইবে যে ভারতের প্রায় শতকরা আশিজন নাগরিক নিরক্ষর এবং ইহাদের নিজ মাতৃভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা প্রথমে প্রয়োজন। তাহার পর অন্য ভাষা শিক্ষার কথা চিন্তা করিতে হইবে। ইহাদের অধিকাংশের পক্ষে নিজ ভাষার পরিবর্ত্তে হিন্দী শিক্ষা লওয়া সম্ভব নয়। প্রথম কথা কোন না কোন একটি ভাষা শেখা। স্বভাবতই সকলেই তাহাদের মাতৃভাষা শিখিবে। ইহা শিক্ষা হইলে পরে দ্বিতীয় ভাষা শিখিতে হইবে। সর্ব্বত্র ভারতে এই দ্বিতীয় ভাষা কি হইবে তাহা লইয়া আন্দোলন চলিয়াছে। সকলের মতে খরচ ও সাধনা করিয়া যদি আরো একটি ভাষা শিখিতে হয় তাহা হইলে সে ভাষা এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে খরচ পোষায়। এই কথা বিবেচনা করিয়া বহু লোক হিন্দী না শিখিয়া ইংরাজী শিক্ষা লইতে চায়।

ইংরাজী শিক্ষা লাভজনক যেহেতু এই ভাষায় রাজনীতি ও অর্থনীতির কার্য্য বাদে ব্যবসা বাণিজ্য, ওকালতি চিকিৎসা শিক্ষা ও সকল প্রকার উচ্চ শিক্ষার সুবিধা দেশে বিদেশে রহিয়াছে। ইহা কেবল ভারতে নয়, ইহা বহু দেশে যথা আমেরিকা, ক্যানাডা, ইংলেণ্ড, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদিতেও আছে। এই কারণে রুশদেশ, জাপান, জার্মানী ও বিভিন্ন দেশে সকুলে ও কলেজে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন আছে।

ভারতে সর্ব্বত্র আরো একটি সমস্যা রহিয়াছে। এখানে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রিযন উচ্চ শিক্ষা লইতে অক্ষম। ইহারা সকলেই কোন না কোন শিল্প শিক্ষা লইতে বাধ্য এবং এই শিক্ষা লইতে হইলেও ইংরাজী ভাষার প্রয়োজন যদিও ভাষার জ্ঞান অল্প বিস্তর হইলে যথেষ্ট। উচ্চ শিক্ষা লইতে হইলে তাহা যাহাই হউক, সাহিত্য বা ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান বা যন্ত্রকৌশল, চিকিৎসা বা অনন্ত শূন্যে অভিযান সকল কিছুর ও শিক্ষা দেওয়া-নেওয়ার কাজ ইংরাজী ভাষাজ্ঞান না থাকিলে ভারতে আজিও চলা সম্ভব হয় না। সুতরাং আধুনিক শিক্ষার পরিকল্পনা হইতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষাকে ক্রমশঃ অবশ্য প্রয়োজনীয় স্থান দান না করার কথা কেহ কেহ উথাপন করেন, এই কথা যাহাতে কেহ চিন্তা না করিয়া সমর্থন না করেন সেই চেষ্টাই সকলের করা কর্ত্তব্য। আর যাহারা ইংরাজী ভাষাকে ভারত হইতে অপসৃত করিবার প্রয়োজনীয়তা লইয়া আন্দোলন করেন, তাঁহাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে এই ভাষা শিক্ষা না হইলে অন্য বহু শিক্ষা ক্রমশঃ কঠিন হইবে এবং ভারতে বহুক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষা লওয়া অসম্ভব হইয়া যাইবে।

আসামে আহোম

প্রবাসী—পৌষ ১৩১৭ হইতে পুনর্মুদ্রিত

মানব জাতির মঙ্গোলীয় শাখাভুক্ত তাতার, হূন, লিচ্ছবি, শক প্রভৃতি জাতিরা পশ্চিমোত্তর ভারতে সময়ে সময়ে প্রবেশ করিয়া যেরূপে আপন আপন আধিপত্য বিস্তার পূর্ব্বক পরিশেষে ভারতীয় হইয়া গিয়াছে—পূর্ব্বোত্তর ভারত প্রান্তেও এক জাতি আসিয়া তদ্রূপ হইয়াছে। এই জাতি আহোম নামে অভিহিত। তরায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুর তাঁহার আসাম বুড়ঞ্জির ২৮ পৃষ্ঠায় আহোমদিগের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

—"প্রায় ৬৫০ বছর হল এই জাতি শ্যাম দেশের পরা আহি এই দেশ অধিকার করে। ইহঁতর অনেকে হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করি বড় নিষ্ঠাপর হিন্দু হইছে। ইহঁতে এতিয়া পর্ব্বত বাসন করে—।"

ত্রয়োদশ শতাব্দিতে উত্তর ব্রহ্মের শান প্রদেশ হইতে একদল বলশালী শান ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত পর্ব্বত-মালা উত্তীর্ণ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রবেশ ও রাজ্য স্থাপন করে। সুবিস্তৃত উপত্যকা ভূমিতে আসিবার সময় মিথি (মণিপুরী) নাগা প্রভৃতি জাতিদিগের বাধা অতিক্রম করিয়া আসিতে হইয়াছিল এবং উপত্যকাস্থিত তাৎ কালিক জাতিদিগের সহিত সংঘর্ষ করিতে না হইয়াছিল এমন নহে। কিন্তু সেই সংঘর্ষ সহজেই দমিত হইয়াছিল অনুমান হয়। কেন না এমন বিশেষ তেজস্বী জাতি শিবসাগর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ছিল না—থাকিলে নবাগতদিগের পক্ষে প্রবেশ লাভ অত সহজ সাধ্য হইত না। কারণ শান নবাগত দিগের সাংখ্যা মোটে ১০৮০ জন, ও সঙ্গে মাত্র একটি দাঁতাল হস্তী, ১টী মাখুন্দী হস্তী, আর ৩০০ ঘোড়া ছিল। ইহারা প্রথমে শিবসাগরের সমীপবর্ত্তী স্থান ও তৎ পূর্ব্ব-ভাগ আপনাদিগের শাসনাধীন করে এবং পরে ক্রমশঃ পশ্চিম ভাগেও শাসন বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে ইহাদের ক্ষমতা অগ্রসর হয় নাই, কারণ উহা ভোট প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ জাতির করায়ত্ত ছিল। আহোমেরা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহন করায় হিন্দুদিগের বিশেষ সহানুভূতি পাইয়াছিল। ইহারা ১২২৯ খৃষ্টাব্দে হইতে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫৯৫ বৎসর আসাম শাসন ও আসামের পুষ্টি সাধন করিয়াছিল। ইহারা হিন্দু হইয়া অনেক দেবালয় পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এখনো সেই সমুদয় তাহাদের যশঃগীতি কীর্ত্তন করিতেছে। ইহাদের আদি রাজা চুকাফা ও শেষ রাজা যোগেশ্বর সিংহ। সর্ব্বসুদ্ধ ৪০ জন রাজা হইয়াছিল।

শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ

মহাপ্রয়াণে দিলীপকুমার

শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯৮০ সালের ৬ই জানুআরি ৮৩ বছর বয়সে বিখ্যাত গায়ক দিলীপকুমার রায় বোম্বে নগরের এক চিকিৎসাগারে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে মহাপ্রয়াণ করেছেন। বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক জগতে এক ইন্দ্রপতন হ'ল। সঙ্গীত, সাহিত্য ও অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে এক মহামনীষীর তিরোধান হ'ল। উপযুক্ত বয়সে যা দেবার ছিল তা দিয়ে তিনি চ'লে গেলেন। সে দিক থেকে ক্ষোভের কারণ নেই। মানুষ চিরঞ্জীবী নয়। কিন্তু তাঁর দান তাঁর জাতি কতটা গ্রহণ করতে পেরেছে বা পারবে, সেটাই এখন প্রশ্নের তীব্রতা নিয়ে আমাদের মনকে আলোড়িত করছে।

গানেই রূপসুন্দর দিলীপকুমারের শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়েছিল। তিনি অনেকের ঈর্ষ্যা ও বিরাগের পাত্র ছিলেন নানা কারণে। কিন্তু তাঁর প্রবল বিরোধীরাও তাঁর গানের প্রশংসায় মুখর না হয়ে পারতেন না। তাঁকে নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ করতেন যাঁরা, তাঁদের অনেককে গোপনে দিলীপকুমারের গান শুনতে শুনতে উচ্ছ্বসিত হতে দেখা গেছে। আড়ালে তাঁকে উপহাস করেছেন এমন সব লোকও তাঁর গান শুনে আবেগে বিহ্বল হয়ে পড়তেন।

আমার নিজের ধারণা, তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ পারফরমার বা এক্সিকিউট্যান্ট বা গানের রূপকার। অর্থাৎ সুরের রূপসৃষ্টি করতে তাঁর মতো দক্ষ কেউ ছিলেন না। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অতি মধুর। সেই মধুকণ্ঠ ছিল অনুশীলনসমৃদ্ধ। আবার সুকণ্ঠ ও অনুশীলনের সঙ্গে এসে মিলেছিল দেশ-বিদেশের অতি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা। ভারতীয় ওস্তাদ ও সাঙ্গীতিকদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে তিনি এসেছিলেন সে ঘনিষ্ঠতার পরিচয় আছে তাঁর ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকা বা পরবর্তীকালের ভ্রাম্যমাণ বইএ। পাশ্চাত্যেও তিনি ক্লেম ক্লারা বাট্, লিলি লেমান, শালিয়াপিন, কারুসো প্রভৃতির সাঙ্গীতিক সান্নিধ্যে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ওস্তাদ হন নি ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, তারাপদ চক্রবর্তী, ফৈয়াজ খাঁ, আবদুল করিম খাঁ, বড়ে গোলাম আলি খাঁ প্রভৃতিদের মতো।

তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ গায়ক রোবসন, কারুসো প্রভৃতির ধারাও গ্রহণ করেন নি। নিজস্ব মৌলিক প্রতিভা তাঁকে শেষ পর্যন্ত ভক্তিমূলক গানের গায়ক ও সুরকারে পরিণত করেছিল। তিনি কিছু দেশাত্মবোধক গানও গেয়েছিলেন। ক্বচিৎ দু একটি হাসির গান। কিন্তু মুখ্যত তাঁর পরিচয় নিজস্ব স্বতন্ত্র বিচিত্র এক ধারার প্রবর্তনায় বাংলা, হিন্দি ও সংস্কৃত ভক্তিমূলক গান গাওয়ায়—ভজনে, স্তবে, কীর্তনে, কীর্তনের আখর তাঁর সমস্ত গানের মর্মে প্রবেশ করেছে। ভক্তির উপাদানে তাঁর গায়কসত্তা নির্মিত হয়েছিল। তিনি সর্বান্তঃকরণে কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণব ভাব ও রসের চর্চায় তিনি মধুময় সত্তায় পরিণত হন। মোহিতলাল তাঁকে "রসবগলিত পুরুষ" আখ্যা দিয়েছিলেন মুখ্যত কৌতুক করেই। কিন্তু তাই ছিল তাঁর সার্থক পরিচয়। এমন সরস মধুর রূপময় সুষমাসুন্দর সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্ব আর কখন ও দেখা যায় নি।

গানে দিলীপকুমারের নিজস্ব ধারার কথা বলার সময় একথাও স্মর্তব্য যে, তিনি নিজের গান গাওয়া ছাড়াও দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের গান প্রচুর পরিমাণে গেয়েছেন। বাংলা দেশে অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের গান জনপ্রিয় করার ব্যাপারে তাঁর অসামান্য দান ছিল। নজরুল সকৃতজ্ঞে তাঁকে "বুলবুল" কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেন। অতুলপ্রসাদও তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। রজনীকান্তের গানের সম্বন্ধেও তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। দেশবিদেশের গানের ফুলঝুরি সৃষ্টিতে তাঁর মতো পারদর্শিতা আর কখনও দেখা যায় নি। সুরসাগর হিমাংশু দত্তের সঙ্গীতে পুষ্পবিকাশপ্রতিভার কথাও তিনি বড় চমৎকার ক'রে বলেছেন নানা জায়গায়। তরুণ গায়ক-গায়িকাদের গুণগরিমার কথাও তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। সাহানা, রেণুকা, যূথিকা, উমা, মঞ্জু, শুভলক্ষ্মী, কান্তি—মন্ত্রী প্রভৃতি গায়িকারা তাঁর স্নেহধন্যা ছিলেন। তাঁর

বালাবন্ধু হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি গায়কেরা তাঁর গান গেয়ে যশস্বী হয়েছেন। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ, তারাপদ, ভীষ্মদেব প্রভৃতির মুক্তকণ্ঠ প্রশংসা তিনি কয়ে গেছেন। নিজে গেয়ে ও অপরকে দিয়ে গাইয়ে তিনি একটি অতি মনোরম সঙ্গীত জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন যার মধ্যে গিয়ে পড়লে মনে হত কবি-কল্পনার বৃন্দাবন যদি পৃথিবীতে কোথাও থেকে থাকে তবে তা এই-খানে.....এইখানে..... এইখানে। তাঁর গানের আসরে গিয়ে যাঁরা কখনও বসেছেন তাঁরাই জানেন, এ-বর্ণনা কত-দূর সত্য। আর, এ-সব গানের আসর বসতে [illegible] শ্রেষ্ঠ লোকদের বাড়িতে, অতি অন্তরঙ্গ ঘরোয়া প্রীতিমধুর পরিবেশে। সেখানে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্রের কোন ভেদ ছিল না। প্রকাশ্যেও ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে, আশুতোষ হলে, দ্বারভাঙ্গা হলে, রামমোহন লাইব্রেরিতে, মহাবোধি সোসাইটি হলে, হাজরা ও শ্রদ্ধানন্দ পার্কে, সেনেট হলে—সর্বত্র আপামর জনসাধারণ তাঁর গানের রসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছেন, পবিত্র হয়েছেন ভক্তিবারিতে বিধৌত হয়ে। এই রকম শুধু কলকাতায় নয়, ভারতের সর্বত্র। মহাত্মা গান্ধি তাই বলেছিলেন: পৃথিবীতে এত বড় গায়ক কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। রাসেল, রোঁলা রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, বিনয়কুমার প্রভৃতি অগণিত মনীষী অযাচিতভাবে তাঁর প্রভূত সুখ্যাতি করে-ছেন। তাঁর প্রশংসাপত্রের দরকার ছিল না। সূর্যকে চেনাবার জন্যে লণ্ঠনের দরকার হয় না। তবে তাঁর প্রশংসাপত্রের অভাব ছিল না। তাঁর যত প্রশংসাবাণী মনীষীদের বরেন্যকণ্ঠে সমুচ্চারিত তাতে একটি বই অনা-য়াসে সঙ্কলন করা যায়।

দিলীপকুমারের গানের নিজস্ব ধারার কথা বলতে গেলে যে সাঙ্গীতিক প্রজ্ঞার প্রয়োজন, তা খুব কম লোকের আছে। সে চেষ্টা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ প্রভৃতি মহাশয় ব্যক্তিদের শোভা পায়। আমার সামান্য পর্যবেক্ষণে যা দেখা হয়েছে তার কথা বলা যাক। তিনি বাংলা ভক্তি-মূলক গান প্রচুর পরিমাণে গাইতেন, কিন্তু মামুলি বা এক-ঘেয়ে ঢঙে নয়। প্রতিটি গানের কথা ও সুর অনন্যসাধারণ। তিনি বৈষ্ণব পদাবলী ও শ্যামাসঙ্গীতও গেয়েছেন। কিন্তু তাঁর বাংলা ভক্তিমূলক গান কীর্তন, শাক্তপদ বা হিন্দি ভজনের অনুকরণ তো নয়ই, অনুসরণও নয়। তাঁর 'শ্যামল। চিরজীবন ঘিরি' মরমে রহো পাশে, আলো-কায়া থেকো প্রিয় পাশে' প্রভৃতি গান শুনলে বোঝা যায়, এ এক বিশিষ্ট ভক্তিগীতিকাধারা। এর কথা আশ্চর্যজনক ভাবে মৌলিক, এর সুরে দেশ-বিদেশের সুরের নানা ধারা এসে বেমালুম মিশে গেছে। রুশ, জার্মান, ইতালীয়, নিগ্রো মার্কিন গানের সুরের সঙ্গে রাস্তার ভিখারির গানের লোক সঙ্গীতের সুরও এই ধারার রসপুষ্টি সাধন করেছে। 'তোমার আঁধার নিশা' গানটিতে "ঐ লাল পাখিটা ধ'রে দে না রে" এই লোক গীতির সঙ্গে লক্ষ্ণৌ ঠুংরির আমেজ কি চমৎকার-ভাবে মিশেছে! এই সুররচনাশক্তি ঐন্দ্রজালিক; স্বীকৃতি পেতে দেরি হোক বা না হোক, তিনিই ছিলেন বাংলা গানের শ্রেষ্ঠ সুরকার। "আয় ঘুম যায় ঘুম দত্তপাড়া দিয়ে," বাঙালি মায়েদের এই মেয়েলি ছড়ার সঙ্গে ফরাসি ঘুম-পাড়ানিয়া 'ও ক্লায়ার দ লা লুন-কে' মিশিয়ে তিনি লিখলেন, সুর দিলেন ও গাইলেন: 'চাঁদের বাঁশি বাজলো।' এই গানটি শ্রীমতী কৃষ্ণাদেবীর মধুঝরা কণ্ঠে যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা নিশ্চয় মুগ্ধ।

দিলীপকুমারের হিন্দি গান মুখ্যত ভজন। কিন্তু সেখানেও তাঁর মৌলিকতা সুপরিব্যক্ত। ডি. ভি. পলুস্কর, কৃপাশঙ্কর তেওয়ারি প্রভৃতির ভজনে তাঁর গানের ক্ষীণ আভাসমাত্র পাওয়া যায়। তিনি স্বে মহিম্নি পরিস্ফুট মীরার ভজনে। রাহানা বেন, মীরা, ইন্দিরা মালহোত্রা ও দিলীপকুমারের নিজের লেখা হিন্দি ভজনে তাঁর নিজের গলায় গাওয়া গানে তার মধুমৌলিকতা সর্বাধিক পরিস্ফুট। উর্দু গজলেও তিনি ভক্তির প্লাবন প্রবাহিত করেছেন। হিন্দি ভজনে তিনি এনেছেন বাংলা কীর্তনের আখর। রাগসঙ্গীতের উর্মিমালার সঙ্গে তিনি সার্গমের ফুলের গাঁথনি মিলিয়ে দিয়েছেন নূপুরকি ঝনকার, আজ সখি সুনো ইত্যাদি গানে। সম্প্রতি ক্যাসেটে প্রকা-শিত "অমরনাদ" শীর্ষক ইন্দিরা দেবী লিখিত হিন্দি ভজন গুলিতে এ বিশেষত্ব আরো দেখা গেছে। তার সঙ্গে পাঞ্জাবি নানকপন্থী গানের মুদ্রা বা তরকিপ-ও মিশে গেছে। কবির, মীরা, সুরদাস, নানক ব্রহ্মানন্দ—সকলের ভজনই

তিনি গাইতেন। বাংলায় হরে কৃষ্ণ এবং হিন্দিতে রামধুন গেয়ে তিনি ভক্ত সমাজের জনপ্রিয়ও হয়েছিলেন খুব বেশি।

সংস্কৃত স্তোত্র-স্তব-বন্দনাগীতি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। এ দিক থেকে তাঁর খুব বেশি মিল ছিল স্বনামধন্য সঙ্গীতাচার্য পঙ্কজকুমার মল্লিকের সঙ্গে। আধুনিক কালে সুরেলা কণ্ঠে সুরেলা ভঙ্গিতে স্তোত্র পাঠ আরম্ভ তথা প্রবর্তন করেন পঙ্কজবাবু তাঁর মহালয়ার অনুষ্ঠানে ও সারস্বত মঞ্জরীতে। বেতারে গীতাপাঠের সময় যাঁরা অশোকনাথ শাস্ত্রী মশাই-এর আবৃত্তি শুনেছেন, তাঁরাও কখনও ভুলতে পারবেন না সুরসহযোগে সংস্কৃত গীতি কি মহিমা অর্জন করে। দিলীপকুমার এই ধারায় অজস্র সৃষ্টি ক'রে গেছেন।

সঙ্গীতেই তাঁর শ্রেষ্ঠ দান হলেও সাহিত্যেও দিলীপকুমার অসামান্য লেখক ছিলেন। কেবল তীর্থঙ্কর বইটি তাঁকে অমরত্ব প্রদান করার যোগ্য। তাঁর ভূস্বর্গচঞ্চল প্রায় অলৌকিক রম্যরচনা। বাংলা সাহিত্যে সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌ-এর পর এর চেয়ে ভালো রম্যরচনা ভ্রমণকাহিনীকে উপজীব্য ক'রে আর প্রকাশিত হয় নি। তাঁর "ভ্রাম্যমাণ" তাঁকে অল্প বয়সেই লেখকরূপে বিখ্যাত করেছিল। আবার ভ্রাম্যমাণ, এদেশে-ওদেশে, দেশে দেশে চলি উড়ে প্রভৃতি বই চির-ভ্রাম্যমাণ "রমতা যোগী" দিলীপকুমারের সর্জন প্রতিভার পরিচায়ক।

কবি দিলীপকুমারের সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও শব্দ চয়ন শক্তি অতুলনীয়। তিনি বাংলা কাব্যে সম্পূর্ণ নতুন রকমের রূপকল্প রচনা করেছেন। তাঁর ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও অভিনব এবং বহুবিচিত্র। সত্যেন্দ্রনাথের মতো তিনিও নানা নতুন ছন্দে কবিতা লিখে বাঙালি পাঠককে নিত্যই নব রস সন্ধান দিয়েছেন এবং সত্যেন্দ্রনাথের মতোই এদিকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছেন গদ্যকবিতা পরায়ণ দলাদলিদক্ষ বাঙালি কবিসমাজে।

এটা একটা অদ্ভুত সবস্তরের লক্ষণকে, সত্যেন্দ্রনাথ-দিলীপকুমার-নিশিকান্তের আবির্ভাব সত্ত্বেও বাংলা কবিতায় ছন্দোজগতে নতুন নতুন ছন্দে কবিতা লেখার প্রবণতা দেখা না দিয়ে দুর্বোধ্য ছন্দোহারা কবিতার আসাছার প্রাচুর্য দেখা গেল। এর জন্য অবশ্য এক শ্রেণীর পূর্ববঙ্গীয় কবিদের গদ্য কবিতা লেখার অক্ষম প্রবণতা ও যূথবদ্ধ পত্রিকাদখল সামর্থ্যই দায়ী। ভারতবর্ষ, প্রবাসী, প্রবর্তক ইত্যাদি পত্রিতায় ঐতিহ্যবাহী ছন্দোময় কবিতার ধারাটি অক্ষুণ্ণ থাকলেও আনন্দবাজার, দেশ, অমৃত, বসুমতীর নব রূপ এই ধরণের পত্রিকায় বেশ আট ঘাট বেঁধে গদ্য কবিতার চাষ করা হয় সব সরস প্রাণবন্ত ছন্দোনিপুণ কবিতাকে বরবাদ ক'রে। যাই হোক, সাময়িক অবক্ষয় চরম কথা নয়। বর্ষায় মশা বেজায় বাড়লেও দোয়েল,—শ্যামা,—পাপিয়া,—কোকিলের বাংলাদেশে সমাদর হবেই, রসের কুঞ্জে চাষ-দিতে- আসার দলকে সরিয়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমারের ছন্দোবৈদগ্ধ্য সমাদৃত হবে ভবিষ্যতের কবিপ্রাণদের মধ্যে।

ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার, প্রবন্ধকার দিলীপ কুমারের সর্বতোমুখী প্রতিভা নিয়ে আপাতত আলোচনার সময় ও প্রয়োজন নেই। তাঁর সাহিত্যিক দক্ষতা সুবিদিত, এখন তাঁর জীবনের অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা নিয়ে আলোচনা করা উচিত। কারণ, এই অধ্যাত্মতাড়নায় তিনি অল্প বয়সে ঘর ছেড়েছিলেন। তারপর পথে-প্রবাসে প্রায় ষাট বছর কাটিয়ে ঐ আধ্যাত্মিক জীবনজিজ্ঞাসার আবেগেই তাঁকে স্বজনবর্জিত দূর প্রবাসে নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব কপর্দক শূন্য অবস্থায় মহাপ্রয়াণের পথে যেতে হ'ল সর্বরিক্ত সন্ন্যাসীর মতো। ঘর না ছাড়লে যিনি রবীন্দ্রনাথের পর বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিমান পুরুষ ব'লে প্রসিদ্ধ হতেন, তিনি প্রায় কিছুই না পেয়ে স্বজাতির ঔদাসীন্যের মধ্যে নীরবে চ'লে গেলেন। তাঁর গান ধ'রে রাখার মতো শিক্ষা বাঙালী গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে কোথায়? তাঁর ধারায় সাহিত্য রচনাই বা এখন কে করতে পারে? তাঁর সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ ও নৈপুন্য তো বড় ঘরের পয়সাওয়ালা ছেলেদের মধ্যেও একেবারে দেখতে পাওয়া যায় না। রামমোহন-ডিরোজিও-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র জগদীশচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রফুল্লচন্দ্র-শরৎচন্দ্র-মানবেন্দ্রনাথ-বিনয়কুমার-সুভাষচন্দ্র-দিলীপকুমার-নজরুল-আশুতোষ-শ্যামাপ্রসাদ ইত্যাদি মনীষীদের ধারা হঠাৎ শুকিয়ে গেল কেন, বাঙালীর দুর্মতি তার অধোগতির জন্য কতটা দায়ী, এ-আলোচনা না ক'রে দিলীপকুমারের ঘর ও দেশ ছাড়ার কারণটা চিন্তা করা যাক। শ্রেষ্ঠ বাঙালিদের একজন বাংলাদেশে উপযুক্ত আশ্রয় ও মর্যাদা পেলেন না কেন? পাণ্ডিচেরি ও পুনায় তাঁর জীবন অবসিত হ'ল কেন?

দিলীপকুমারের ব্যক্তিজীবন আমি যত দূর জানি উপন্যাসের মতো বিচিত্র ও রোমাঞ্চকর। ভবিষ্যতে তাঁর জীবন কাহিনী বহু উপন্যাসের উপজীব্য হবে নিঃসন্দেহ। নিজের কথা নিজের বহু উপন্যাসে ও দু-একটি গল্পে তিনি লিখেছেন। কিন্তু সব লেখা হয় নি। সেই অলিখিত কাহিনী থেকে তাঁর ঘর ছাড়ার রহস্য অনুধাবন করতে হবে।

বৈরাগ্যবাদী বিরক্ত বৈদান্তিক যে-কারণে ঘর ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়ে থাকে, তেমন কোন কারণে দিলীপকুমার

পণ্ডিচেরির আশ্রমে যান নি। তাঁর এক আত্মীয় অবশ্য এক কবিতায় তাঁকে "ওহে বিরক্ত সন্ন্যাসী" বলে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু কোনদিনই তিনি তা ছিলেন না। তাঁর রেশমি গেরুয়া তাঁর বৈরাগ্য বিলাস মাত্র। অথচ তিনি ভণ্ড বাবাজি বা মোহন্তও ছিলেন না। পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ-দিলীপকুমার পত্রাবলী পড়লে দেখা যায়, একদা কিছু লোক তাঁর সম্বন্ধে অকারণ অন্যায় কুৎসা রটিয়েছিলেন। রবীন্দ্র নাথের হস্তক্ষেপে তা নিরস্ত হয়ে থাকেবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কেন তিনি মাত্র ৩১ বছর বয়সে পূর্ণ খ্যাতি ও অপরিসীম সম্ভাবনার মধ্যে অরবিন্দের যোগাশ্রমের মতো একটা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে নিজের আখের খোয়ালেন?

অরবিন্দ আশ্রমে যাওয়া দিলীপকুমারের জীবনে এক মহা ভ্রান্তি নিঃসন্দেহ। আশ্রম তাঁর কাছে অনেক কিছু পেয়েছিল। কিন্তু তিনি আশ্রমের কাছে ভালো কিছু পান নি অরবিন্দের কাছে ইংরেজি কবিতার ছন্দোলিপি সম্বন্ধে কিছু সদুপদেশ পাওয়া ছাড়া। খারাপ অনেক কিছু তিনি সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন যা অসহ্য হওয়ায় তিনি গল্প ভারতী পত্রিকায় লিখতে বাধ্য হন। কিন্তু আমাকে সে সব কথা আলোচনা না করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে তিনি যে চিঠি লিখে গেছেন তার কথা ভেবে তাঁর আশ্রম জীবন নিয়ে এখন কোন কথা লিখব না। আশ্রমে না গেলে বিভিন্ন রূপসী তাঁকে নিয়ে টানাটানি করতেন, এটা অবশ্য সুবিদিত তথ্য।

ইন্দিরা দেবীর জন্যই দিলীপকুমার পণ্ডিচেরি ত্যাগ করে পুনায় যান। এটাও সুবিদিত পুনায় ইন্দিরা দেবী তাঁর পরিচর্যার ত্রুটি করেন নি। কিন্তু দিলীপকুমার স্পষ্ট লিখে গেছেন, মহারাষ্ট্রে গান গুনে এবং ধর্মের জন্য এখনও লোকে টাকা দেয়। বাংলাদেশে ও সব হয় না। এখানে পার্টি-রাজনীতি ও খেলার মাঠে ভিন্ন লোকে টাকা খরচ করে না। আর সিনেমার গানের কাটতি এখানে ভারতের অন্যান্য স্থানের মতোই। এখন কোন ধনী সহৃদয় সংস্কৃতিমান বাঙালি তখন জীবিত ছিলেন না যিনি ১৯৫০-৮০ সালে দিলীপকুমারের মর্যাদা রক্ষা করতে পারেন-রঞ্জন সেনের পরিবার অবশ্য অনেক করেছেন। কিন্তু তবু তাকে মহারাষ্ট্রেই দেহরক্ষা করতে হ'ল। তাঁর শেষ অধ্যায়ের বিস্তৃত বিবরণও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। সুদর্শন পত্রিকায় এ সম্বন্ধে ইন্দিরা দেবীর রচনায় আমরা সামান্য কিছু জানতে পারি। কিন্তু তিনিও স্পষ্ট করে কিছু লেখেন নি। "অলৌকিক" বলে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করা সর্বদা অসঙ্গত। বিবেকানন্দের মৃত্যুও ভক্তরা মহিমান্বিত করে দেখাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু "জব প্রাণ তনু সে নিকলে" তখন তাতে দিব্য বা মহান কিছু থাকা-না-থাকা দুই সমান। কারণ, মৃত্যুতে দৈহিক জীবনের পূর্ণ সমাপ্তি এবং দেহী মাত্রই জরা-মরণাদি ধর্মের একান্ত অধীন। মরবার সময় অলৌকিক কিছু না ঘটিয়ে বুদ্ধ-বিবেকানন্দ-কবির-দিলীপের মরা এদেশে বারণ। তাই শূকর মাংস খেয়ে অপচারে বা উদরাময়ে বা বার্ধক্যজনিত দুর্বলতায় বা পায়ের আঘাতে এদেশে মরাটা বড় লজ্জার। মরার পর মৃতদেহটা একরাশ ফুল হয়ে গেলে ভালো হয়। ধ্যানস্থ হয়ে কৃষ্ণ দেহে লীন হওয়া বা সমুদ্রের নীল জলে কৃষ্ণের নীলকান্তরূপ দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে মারা যাওয়াও বেশ ভালো। বাস্তবে এ সব হয় না।

ব্রংকাইটিস নিউমোনিয়া জাতীয় রোগে দিলীপকুমার ৬ই জানুয়ারি বেলা ৩,৪০মিনিটে পরলোক গমন করেন। সদানন্দ পুণ্যশ্লোক লোকটি সারা জীবন হাসিমুখে কর্তব্য-ভার বহন করে নিরভিমান চিত্তে চলে গেলেন। তিনি কারো শক্তিতে শক্তিমান হন নি, তিনি নিজেই সকলকে শক্তি বিতরণ করেছেন। যাঁরা বলেন, সাহানা দেবী, উমা বসু বা ইন্দিরা দেবী তাঁকে জীবনের কোন সময়ে শক্তি জুগিয়েছেন, তাঁরা বোঝেন না যে, দিলীপকুমার সাহানা, উমা, ইন্দিরা প্রভৃতির উৎস, তাঁরা দিলীপকুমারকে কিছু শক্তি দেবার মতো শক্তিমতী ছিলেন না। গুরুবাদ, অলৌকিকতায় বিশ্বাস, পৌত্তলিকতা, শক্তিসঞ্চারতত্ত্ব এই সব ভ্রান্ত মতবাদ রোমাল্লাঁ নিকসন বা কৃষ্ণ প্রেমের মতো দিলীপকুমারকেও অল্প বয়সে ভ্রান্ত পথের পথিক করেছিল। শেষ বয়সে তিনি নিজের বোনা ধর্মের জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন। প্রথম বয়সে নির্মলেন্দু লাহিড়ি, প্রমদাদাস গোস্বামী, নিকুঞ্জ মোহন লাহিড়ি শ্রী 'ম' প্রভৃতির প্রভাব তাঁকে তথাকথিত ধর্মের পথে টেনে এনেছিল। ঐ ধর্ম তাঁর স্বধর্ম ছিল না। রসমার্গের বৈষ্ণবীয় ভাবের আশ্রয়ে সঙ্গীত ও সাহিত্যের চর্চায় নিময় থেকে সুখী স্বচ্ছন্দ গার্হস্থ্য জীবন যাপনই তাঁর স্বধর্ম ছিল। শৈশবে মাতৃ-বিয়োগ, কৈশোরে পিতৃবিয়োগ, যৌবনে বিদেশে অবাধ স্বাধীনতা, ধর্মের নামে ভ্রান্তির হাতছানি—এই সবের সমন্বয়ে স্বধর্মচ্যুত হয়ে তিনি তথাকথিত পূর্ণযোগ ও মীরার অবতরণের খপ্পরে প'ড়ে যান। তাঁর বিপুল প্রাণশক্তি তাঁর গান ও সাহিত্যবোধ লুপ্ত হতে দেয় নি, কিন্তু ধর্মের প্রকোপ দুটিকেই ক্ষুণ্ন করেছিল নিশ্চয়। অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে আমি এ-বিষয়ে একমত যে, তাঁর ধর্ম প্রাণতা তাঁর বিদ্রোহী সত্তাকে ব্যাহত করেছিল।

স্তর

প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়

'জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছি ভাই ছেলেবেলায়'—একটা টোষ্ট মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে ম্যানেজার মশাই বললেন।

চেয়ার ছেড়ে উঠেছিলুম যাব বলে, আর তিনিও নিজের টেবিলে বসেই টিফিন সুরু করেছিলেন। কথাটা শুনেও বুঝলুম উনি একটু গল্প-স্বল্পের ভেতর দিয়ে টিফিনটা সমাধা করতে চান। বসলুম।

'কষ্ট পেয়েও হাল ছাড়িনি'—মুখের মধ্যে টোষ্ট থাকায় কথাগুলো অল্প জড়ান, 'সমানে ফাইট করে গেছি'।

'সে'ত বটেই, নইলে এত বড় হলেন কি করে...' বললুম একটু খোসামোদের স্বরে।

'সে নয়, কি জান, আমাকে কি যেন একটা পেয়ে বসেছিল, আর সেই আমাকে এইভাবে খাটিয়েছে।' টোষ্ট চিবোতে লাগলেন। 'খাটতে খাটতে এখন এমন হয়ে গেছি, যে কিছুই যেন আর আমাকে প্রলুব্ধ করতে পারে না। রোজগার করেছি জীবনে অনেক, লোকে দেখলে ভাবে আমি বুঝি খুব ভোগী আর বিলাসী, কিন্তু ভাই সত্যি কথা বলতে কি, ও তোমাদের মত ভোগ-বিলাসের দিকে এখন আর মন যেতে চায় না। অথচ যে যন্ত্রের মত শুধু নিজের কাজ ছাড়া আর কিছু বুঝিনা তাও না।'

আমি চুপচাপ শুনে যেতে লাগলুম। এঁরা যে আবার কাজ ছাড়া অন্য কিছু বোঝেন এ আমার ভাবতে সাহস হ'ল না।

'অবশ্য এক সময়ে ছিল, যখন আমার মনে, এই অফিসের কাজ আর লোকের কাছে টাকা দেখান ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু এখন দেখছি মনের মধ্যে যেন একটা পরিবর্ত্তন হয়ে যাচ্ছে। কাজটা যেন নিঃশ্বাসের মত সোজা আর বাইরে দেখি যেন সব কিছুই আমার মতই সাধারণ।

তিনি চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। আমার কাপটা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছল, তাই নিষ্কর্মার মত বসে বসে তাঁর মনোজগতের পরিবর্ত্তনের ইতিহাস শুনতে লাগলুম।

'সমস্ত কিছুই আমার কাছে যেন একটা ছবির মত মনে হয় বুঝলে, কিছুতেই আর আমাকে, মানে কি বলে, সে সেরকম মানে উদ্বিগ্ন করতে পারে না। এই দেখুন না, কয়েক মাস আগে একটা ব্যাপারে আমার প্রায় লাখ্ খানেক টাকা লোকসান হয়ে গেল, আর তারই কিছুদিন পরে আমার বড়ছেলেটা মারা গেল, অথচ আমাকে দেখে কেউই তা বুঝতে পারেনি।'

আমি অবাক। লোকটা মিথ্যে বলছে না'ত? নাঃ, সে রকম মনে হ'ল না। বুঝলুম সত্যিই ওঁর মনে একটা অদ্ভুত ভাব এসে গেছে।

'আমার মনে এখন আর কোন চাঞ্চল্য নেই। খিদে-তেষ্টা আমি এক এক সময়ে বুঝতে পারি না।'

'এই কয়েক দিন আগে এক অজ পাড়া-গাঁয়ে আমার এক গরিব আত্মীয়ের বাড়ী গিয়েছিলুম। ওদের ভাঙ্গা চালাঘরে দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে আর মোটা চালের ভাত খেয়েও আমি সত্যি বলছি কোন রকম অস্বস্তি বোধ করলাম না সাতদিন থেকেও।'

ওঁর টিফিন শেষ হয়ে গিয়েছিল। বেয়ারা একটা স্লিপ দিয়ে গেল, কে যেন দেখা করতে চায়। আমি উঠলুম ওঁকে নমস্কার জানিয়ে।

পথে বেরিয়েই শৈলেশের সঙ্গে দেখা।

'কিরে কোথায় ?' জিজ্ঞেস করলে।

'এই এসেছিলুম এইখানে। 'তোর খবর কি ?' অবশ্য ওর খবর কি তা আমার অনুমানে আসে। তবুও জিজ্ঞেস করলুম।

'সেই বিমর্ষ মুখ, সেও কোটরগত চোখ আর দৈন্যভরা চেহারা।

'কয়েকটা তাগাদায় গিয়েছিলুম একটু'—ও যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ল—অন্য-মনস্ক ভাবে বললে, 'দিলে না কেউই, কেবল ঘোরাচ্ছে।'

'তুই ও ছবির ব্যবসা ছেড়ে দে বাবা। একটা চাকরি-বাকরি দেখ, ছবি আঁকা সখের জন্য, ও দিয়ে কি আর সংসার চলে ?' আমার বিচারে যা আসে তাই বললুম, উপদেশ দিইনি। কিন্তু ও যা একগুঁয়ে, কোন দিনই কথা কানে তুললে না। কারও কথাই না! সেই এক গোঁ, ছবি এঁকেই চালাব, ওতেই আমার সব হবে।'

'তবে ঘোর। স্কুলের গণ্ডি ত' পেরিয়েছিস, একটা চাকরি কি আর চেষ্টা করলে পেতিস না ? না এখনও পাবার সময় চলে গেছে ?

ও কোন কথার জবাব দেয় না আজকাল। কথা ঘোরাবার জন্যও বটে, আর দরকারের জন্যও বটে, বললে, 'দুটো টাকা দিতে পারিস ?' ধার ও চায় না, জানে শোধ করা কত শক্ত ওর পক্ষে, তাই ও চেয়েই নেয়। বাল্যবন্ধু, তাই নিষ্ঠুর হতে পারি না, থাকলে দিই, ওকে নয়, ওর পরিবারবর্গকে ভিক্ষা নয় সাহায্য।

'তোর ছেলে-বৌ কেমন আছে ?'

'এই এক রকম আর কি ?' কথা না বাড়িয়ে বিদায় নেয়।

না, শৈলেশ ছেলেটা ভাল। মাঝে মাঝে দেখা হয়, আর কথা মানে কেবল ছবির গল্প। কঠোর তপস্যা বটে।

অবশ্য ও বলে, 'দেখ পয়সা না থাকলে সবই মিথ্যে, যতই সাধনা করি না কেন। নিয়মিত যদি স্থূল প্রয়োজন গুলো না মেটে তবে সমস্ত মনটাকে এই দিকে দোব কি করে ?

আমি উদাস ভাবে বলি, 'তা হলে এখন কি করবি বল দিকি ?' ও বলে, 'সাধনা ত' আমার পয়সার নয়, শিল্পের। যদি একটা বাঁধা আয় থাকে খুব সুবিধে হয়। কিন্তু তার জন্যে আলাদা পরিশ্রম দিতে রাজী নই।'

শুনে হাসি পায়। চুপ করেই থাকি। যা পারে করুক। ওর ছবিগুলো দেখি। মন্দ নয়, মোটামুটি ভালই বলা চলে। কাগজের ওপর, ক্যাম্বিসের ওপর ওর কত আগ্রহের, কত গভীর স্থির মনের রঙ তুলি বুলিয়ে গেছে, আর স্বপ্নময় কল্প-জগৎ রচনা করেছে। কিন্তু স্বপ্ন কি আর সত্যি হয় ? হ'লেও সেকি আর স্বপ্ন থাকে! ওর তপস্যাকে যেমন অস্বীকার করতে পারি না, তেমনিই ওর জীবনের এই অসম্পূর্ণতা তাকেও ক্ষমা করতে ইচ্ছে হয়না। শান্ত-নিঝুম পরিবেশে ও নিজের স্বর্গ রচনার চেষ্টা করছে। ওর স্ত্রী যেন সাক্ষাৎ নারায়ণী, তারও গভীর সহানুভূতি ও পেয়েছে এবং ভেতরেও, বোধহয় তাই এখনও ওর তন্দ্রা ভাঙেনি।

এর পর বাইরে বদলি হয়ে অনেক দূর চলে গিয়েছিলুম। সময়ও আমার অপেক্ষায় বসে না থেকে আপন পথে চলে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখি আমার জন্যে রেখে গেছে দশ বছরের পুরোন ইতিহাস। নতুন করে পরিচিতের সঙ্গে পরিচয়, পুরোণোর সঙ্গে নতুন করে পরিচয়ের পরশ। পরিবর্ত্তনের ভেতরেও আছে অপরিবর্ত্তন, বিস্মৃতির সরোবরে ফুটে ওঠে স্মৃতির শতদল।

অনেকের সঙ্গে দেখা করলুম বাড়ী গিয়ে। পুরোন দিনের আকাশ নতুন রূপ নিল সরস মাধুর্য্যময় স্মৃতির মন্থনে। একে একে সকলের সঙ্গে দেখা সেরে শেষে গিয়ে হাজির হলুম শৈলেশের বাড়ী সেদিন দুপুরে।

সেই শৈলেশ, আর ওর সেই বাড়ী। ভাঙা নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে ওর ঘরে ঢুকলুম। একটা ক্যাম্প খাটে ও ঘুমুচ্ছিল। আসবাবপত্র আর ঘরের অবস্থা যেন আগের চেয়েও মলিন আর বিবর্ণ।

না, ওর ঘুম বুঝি আর ভাঙল না। কবে ভাঙবে কে জানে। চেষ্টা করলুম ওর ঘুম ভাঙাতে, বহুবার করেছি, আজও করলুম।

ও উঠ'ল। আমায় দেখে অবাক হ'ল। তারপর হাসল —"কিরে তুই কোত্থেকে ? কখন ?"

অনেক কথা হ'ল ; কিন্তু শৈলেশকে দেখলুম নতুন করে, নতুন ভাবে।

'আছিস কেমন ? ছবি আঁকছিস না ছেড়ে দিয়েছিস ?"

'ছেড়ে দেওয়া বা ধরে থাকার বাইরে আমি এখন।'

'মানে ? কি রকম ?'

'মানে না হোক একটা কিছু ধরে নাও,' ওর মুখে একটা শান্ত ভাব, অনুদ্বেগ আর নিশ্চিন্তার ছায়া।

'তোর স্ত্রী কোথায় ? কেমন আছে ? ছেলেটা ?'

ও একটু চুপ করে থেকে বললে, 'ছেলেটা ইস্কুলে আর স্ত্রী মারা গেছে প্রায় চার বছর হ'ল।'

'তাই নাকি ?' আমার দুঃখ হ'ল শুনে। কিন্তু ওর মুখে যেন কোন বিকার নেই, ও নিশ্চিন্ত।

আমি একটু পরে বললুম 'তবে তোর ওপর দিয়ে একটা আঘাত চলে গেছে বল।' কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক থাকার পর বললে, 'নারে যা ভাবছিস তা নয়। আমি একটুও কষ্ট পাই নি। আজ প্রায় ছ' সাত বছর আমার মনে কোন কষ্ট নেই। আমি বেশ ভাল আছি। কি রকম যেন একটা ভাব এসে গেছে যাতে সব কিছু আমার কাছে এখন অতি সাধারণ ব্যাপার বলে মনে হয়। তোরা যে এত ছুটোছুটি করিস, এত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাস, অথচ আমার মন যেন এসব কিছুই একেবারে ছোঁয় না। কেবল মনে হয় যেন আমি বেশ ভাল আছি, বেশ সুখে আছি, আমার কোন কষ্ট নেই। আগে আমার মন পয়সার জন্যে বড় উদ্বিগ্ন হ'ত, কত ছুটোছুটি করেছি, কত ঘুরেছি, কিন্তু এখন আর মনে পয়সার আকাঙ্খা একেবারেই নেই। আগের মতই বেরোই তাগাদায়, আর আগেও যে ভাবে চলত এখনও সেই ভাবেই চলে, কিন্তু মনের শান্তি আমিও পেয়েছি।

বললুম—'তোর মনটা কঠিন হয়ে গেছে, আর নিরাশ হয়ে পড়েছিস' ও কি যেন ভাবলে, বললে, 'নারে তাও নয়। মন যে আমার কঠিন হয়ে যায়নি সেটা বুঝেছিলুম ছেলে-বৌ এর ব্যবহারে।'

ওর মুখেতে দেখলুম একটা শান্তির ছাপ। ও বললে 'দেখ, ক'দিন আগে একজনদের বাড়ীতে থাকতে হয়েছিল কয়েকদিন, ওই ছবি আঁকার ব্যাপার নিয়েই। বিরাট বড়লোক। বুঝলি আমায় যেন রাজার হালে রেখেছিল, খাওয়া' শোওয়ার, আর থাকার ব্যাপারে। সে এক এলাহী ব্যাপার। ও রকম বিলাসিতায় যে মানুষ থাকতে পারে, সে চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতুম না।' ও কি ভাবলে, ত'রপর বললে, 'কিন্তু দেখ তোকে সত্যি বলছি, আমার কিন্তু তার জন্যে মনে কোন রকম আনন্দ এল না। মনে হতে লাগল যেন এ অতি সাধারণ ব্যাপার। একবারও মনে একটা প্রলুব্ধ-ভাব এল না, মনে হচ্ছিল যেন এই ক্যাম্প খাটটাতেই শুয়ে আছি, আর আশেপাশে যা ঘটছে, যেন নিজের নিয়মেই ঘটে যাচ্ছে। সবই নিয়মের মধ্যে বাঁধা নিতান্তই গতানুগতিক ব্যাপার। ছবি আঁকতে আঁকতে এমন হয়ে গেছে যেন মনে হয় জগৎটাই একটা জ্যান্ত ছবির মত।'

ওর মুখের পরিতৃপ্তির ছায়া দেখে আমার অনেকদিনের পুরোন একটা স্মৃতি মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে গেল, যেন মুখের ওপর এই ছায়া আর এই কথা অনেকদিন আগে কারও মুখে যেন দেখেছিলুম।

মনে পড়ল সেই এক অফিসের প্রৌঢ় ম্যানেজারের কথা তবে কি সেই ম্যানেজারের সেদিনের মন আর শৈলেশের আজকের মন একই স্তরের ?

বোধহয় একাগ্র গতিপথে অনিবার্য্য এই শান্তির স্তর লক্ষ রকম বৈষম্যের ভেতরেও।

———

কবি

অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

দুটো বলাকা উড়ে যাচ্ছিলো কালো মেঘের কোল ঘেঁসে সেই দিকে তাকিয়ে একটা প্রেমের কবিতা লিখছিলেন বিদ্যাভূষণ। হঠাৎ তাঁর চিন্তায় ছেদ পড়লো। চেয়ে দেখলেন তাঁর খোলা বারান্দার সামনে একটা ভিখিরি এসে হাত পেতেছে, কিছু খেতে দেবে, বাবু?

বড় দুঃখ হলো ভিখিরিটাকে দেখে। বিদ্যাভূষণ লেখার টেবিল থেকে উঠে এগিয়ে গেলেন বারান্দার প্রান্তে। ভিখিরিটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। সত্যিই বড় করুণ। কিশোর বয়সের একটি ছেলে। শীর্ণ দেহ, চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে। পরণে একখানা শতছিন্ন গামছা আর একটা ময়লা গেঞ্জি। ক্ষিদে আর অবসন্নতায় ধুঁকছে ছেলেটা।

ওর অবস্থা দেখে বিদ্যাভূষণের কবি-হৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠলো। ছেলেটাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, কত দিন খেতে পাওনি তুমি?

—আজ তিন দিন হলো আমি কিছু খাইনি, বাবু। ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে বললো, কেউ আমাকে খেতে দেয়নি।

—আহা, কী কষ্ট! বিদ্যাভূষণের দুচোখ জলে ঝাপ্‌সা হয়ে এলো। তিন দিন কিছু খাওয়া হয়নি? তুমি আমার কাছে আসোনি কেন? কোথায় থাকো?

—ফুটপাথে।

—কিছু কাজকর্ম করতে পারো না? বিদ্যাভূষণ বললেন, ভিক্ষে করে কি দিন চলে?

—কে আমাকে কাজ দেবে, বাবু?

—আমি দেবো। বিদ্যাভূষণ বললেন, আমার বাড়ীতে কাজ করবে?

—করবো। ছেলেটা কৃতজ্ঞতার সুরে বললো, কি করতে হবে?

—কাজ তেমন কিছু নয়, দোকান-বাজারে যাওয়া আর সংসারের টুকিটাকি ফাই-ফরমাস। আমার বাড়ীতেই থাকবে, খাবে। জামাকাপড় দেবো, কিছু মাইনেও দেবো। রাজি আছো?

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো ছেলেটা। বিদ্যাভূষণ সোৎসাহে বললেন, কত টাকা মাইনে চাও?

—মাসে পঁচিশ টাকা হলেই চলবে।

—আমি তোমায় তিরিশ টাকা করে মাইনে দেবো। বিদ্যাভূষণ সেই দিন থেকেই কাজে বহাল করলেন ছেলেটিকে।

বিদ্যাভূষণের স্ত্রী সরমা অভিযোগের সুরে বললেন, কী কাণ্ড তোমার?

—কেন, হয়েছে কী? বিদ্যাভূষণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

সরমা বললেন, ছেলেটা চাইছে পঁচিশ টাকা মাইনে, আর তুমি তাকে দেবে তিরিশ টাকা করে? কেন?

—আরে বাপু, গরীবকে দুটো পয়সা বেশী দিতে হয়। বিদ্যাভূষণ তাঁর কবি-সুলভ উদারতার হাসি হেসে বললেন, গরীবের সুখ হলেই তো দুনিয়ার উন্নতি হবে।

সরমা মুখ ভাঁর করে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। বিদ্যাভূষণ জানেন, গিন্নী একটু পরেই শান্ত হবেন। তাঁর রাগটা যতটা প্রকৃত তার চেয়ে বেশী কৃত্রিম। চাকর পেয়ে মনে মনে হয়তো খুশীই হয়েছেন সরমা। আর বিদ্যাভূষণ নিজেও হাতের একজন দোসর পেয়ে খুব খুশী। তাঁকে আর দোকান-বাজারে যেতে হবে না। সব কাজ ওই ছেলে-

টাই করবে। আর তিনি তাঁর নিজের কাজ নিয়ে থাকবেন, অফিস থেকে ফিরে অবসর সময়ে মনের আনন্দে কবিতা লিখবেন।

ছেলেটার নাম ভোলা। নামটা কেমন শ্রুতিকটু লাগছিল বিদ্যাভূষণের কাছে। শ্রুতিমধুর করবার জন্যে তিনি ওই নামটার একটু পরিবর্তন করলেন—ভোলা থেকে হলো ভোলানাথ। এক মাসের মাইনেও অগ্রিম দিলেন ভোলানাথকে।

সরমা বললেন, চাকরকে নিয়ে তোমার আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচিনে।

বিদ্যাভূষণ বললেন, প্রেমই মানুষকে আপন করে সরমা। ছেলেটাকে যদি আমরা ভালবাসি, তাহলে দেখবে ছেলেটাও আমাদের ভালবাসবে।

সারাদিন খুব মন দিয়ে কাজ করলো ছেলেটা। আর বিদ্যাভূষণ মনের আনন্দে একদিনেই তিনটে কবিতা লিখে ফেললেন, কোনোটি প্রেমের, কোনোটি বা বিশ্বমানবতার। স্ত্রীকে ডেকে বললেন, দেখো কেমন সুন্দর কাজ করছে ভোলানাথ। ও যেন আমাদেরই ঘরের ছেলে। প্রেম আর ভালবাসা দিয়েই যে মানুষকে জয় করা যায়, এটা হচ্ছে তারই একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

কিন্তু পরদিন সকালেই সরমার কান্নায় চমকে উঠলেন বিদ্যাভূষণ। লিখতে বসেছিলেন খোলা বারান্দায় বসে, যেখানে এক ঝাঁক পায়রা এসে চালের ক্ষুদ খাচ্ছিলো খুঁটে খুঁটে। কাগজ-কলম ছেড়ে তাড়াতাড়ি ছুটলেন ঘরের মধ্যে, গিয়ে দেখলেন, সরমা দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে কাঁদছেন। তাঁর সামনে রয়েছে ছোট একটা ক্যাশ-বাক্স—ঢাকনাটা ভাঙা। ওই বাক্সের মধ্যেই সংসার খরচের টাকা থাকতো।

ব্যাপারটা বুঝতে আর বাকী রইলো না বিদ্যাভূষণের। খরচের টাকা সব চুরি হয়ে গেছে। কিন্তু ভোলা তখন নাগালের বাইরে। সে যে কখন নিখোঁজ হয়েছে, তা কেউ জানে না।

থানায় গিয়ে একটা ডায়ারী করলেন বিদ্যাভূষণ, পুলিশ অফিসারকে বিশদভাবে জানালেন তাঁর বিপদের কথা, তারপর রাস্তায় আর ফুটপাথে ঘুরে বেড়ালেন অনেক্ষণ ভোলার সন্ধানে। কিন্তু ফল হলো না কিছুই। তিন-চার ঘণ্টা পরে যখন বাড়ী ফিরলেন, তখন মনে হলো সারা বিশ্বের রূপ যেন পাল্টে গেছে তাঁর চোখের সামনে। সকালবেলায় সোনালী রোদ আর নেই, সূর্যটা হয়ে উঠেছে একটা দগদগে ঘায়ের মতো। বাতাসে বইছে সাপের বিষাক্ত নিঃশ্বাস। আর সমস্ত পৃথিবীটা যেন ভরে উঠেছে আবর্জনায়, চারদিকে শুধু নোংরা দুর্গন্ধময় আবর্জনা।

শত চেষ্টা করেও সেদিন আর প্রেমের কবিতা লিখতে পারলেন না বিদ্যাভূষণ। কবিতার ছত্রে ছত্রে একটা বিদ্রোহের সুর বেজে উঠলো—মানুষের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে।—

মেঘের কোলে একটিও বলাকার দেখা পাওয়া গেল না সেদিন। সকালবেলার সেই পায়রাগুলোও উড়ে গেছে কখন। তার বদলে শুধু একটা কাক তার রুক্ষ কর্কশ কণ্ঠে একটানা চীৎকার করে চলছে কা-কা করে।

টোডরা জীবন্ত ফসিল

বিমলেন্দু চক্রবর্ত্তী

১৯২২ খৃষ্টাব্দে বাঙালী প্রত্নবিজ্ঞানী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রহস্যময় এক নগরের ঘোমটা যেন টেনে খুলে ফেললেন। পৃথিবীর মানুষ চমক খেল প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক সভ্যতার পরিচয় পেয়ে। এমন পুরাতন তাম্র যুগের একটি নগর সভ্যতার কেন্দ্র মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে কোন প্রত্নবিজ্ঞানী কল্পনাও করতে পারেন নি। খোঁড়াখুঁড়ির ফলে যে সব তথ্য আত্মপ্রকাশ করলো তা বিস্ময়কর। আবিষ্কৃত হল আধুনিক যুগের মত গড়ে তোলা সুপরিকল্পিত নগর। নগরটি তৈরী করা হয়েছিল ছক তৈরী করে নিয়ে।

নগর প্রয়োজনের তাগিদে গড়ে ওঠে। নানারকম সুখ-সুবিধা এবং প্রয়োজনে মানুষের বসতি পর পর গড়তে গড়তে তা একটি নগরে পরিণত হয়। অবশ্য এখন পৃথিবীতে অনেক পরিকল্পিত নগর গড়ে উঠেছে কিন্তু তাম্র প্রস্তর যুগের সভ্যতায় পরিকল্পিত নগর বিন্যাস বিস্ময়কর এক নিদর্শন।

পণ্ডিতজনেরা মনে করলেন মহেনজোদড়োর নাগরিকরা এসেছিল ভারতের বাইরে থেকে। আসার সময় একটি নগরের পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে এসেছিল। একদল নাগরিক নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছিল। তারা পছন্দমত ভূখণ্ড পেয়ে পরিকল্পিত নগর তৈরী করে নতুন বসতিতে এসে বসতি শুরু করে।

মহেনজোদড়োর মানুষ কোন দেশ থেকে নগর পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে এসেছিল তার জবাব যথাযথ পাওয়া যায় নি। মহেনজোদড়োর সঙ্গে সব থেকে বেশী মিল মেসোপটেমিয়া সভ্যতার। মহেনজোদড়োর শীলের ছবি ছাপার পর পণ্ডিতমহলে আলোড়ন উঠেছিল। মেসোপটেমিয়ার শীলের সঙ্গে মিল খুব বেশি দেখে মহেনজোদড়োর বয়স স্থির করা হয়েছিল মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে বয়স মিলিয়ে।

পরবর্তী সময়ে এ ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ করা হয়। সাগর পাড়ি দিয়ে কিছু মানুষ আসতে পারে কিন্তু তারা বন্দরের পর বন্দর গড়ে তুললো এবং আর্যদের সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস তৈরী করেছে তা আর এখন কোন পণ্ডিত স্বীকার করেন না।

ভারতবর্ষের মানুষরাই ধাপে ধাপে অগ্রগতির পথে নগর ও বন্দর গড়ে তুলেছিল। তারা হতে পারে এক সময় ছিল বহিরাগত তাতে কিছু যায় আসে না। মানুষ প্রজাতির কোন দেশই তার স্বদেশ নয়, অন্য দিকে সব দেশই তার স্বদেশ। ভারত ভূখণ্ডে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে তার দীপ শিখা তারা নিজের হাতেই জেলেছিল। টোডদের বিষয়টিকে তর্কাতীত করে তুলেছে।

মহেনজোদড়োর সভ্যতা যে ভারতের মাটি ফুঁড়ে উঠেছিল এখন তা প্রমাণ করা আর কষ্টসাধ্য নয়। নবপলীয় সভ্যতা ধাপে ধাপে তাম্র প্রস্তর সভ্যতায় বিকশিত হয়েছিল। এক সময় ধারণা ছিল প্যালেস্টাইনের 'ডেসসী' এলাকায় প্রথম নবপলীয় সভ্যতার সূচনা হয়। ধাপে ধাপে বেলুচিস্থান, আফগানিস্থান হয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। সিদ্ধান্তটি এখন বাতিলের পর্যায়ে। নবপলীয় সংস্কৃতির একাধিক নমুনা সিন্ধু নদীর এলাকায় পাওয়া গেছে। উৎখটননের ফলে মহেনজোদড়োর ৮০ মাইল উপরে হরপ্পা নগরের নিচে পাওয়া গেছে নবপলীয় সংস্কৃতির পরিচয়।

মহেনজোদড়োর মানুষেরা মহেনজোদড়োতে নগর গড়ে তোলার আগেও নগর জীবনে বাস করতো তাতে সন্দেহ

নেই। ইরাবতী নদীর তীরে হরপ্পা নগর তার প্রমাণ রূপে উল্লেখ করা যেতে পারে। অনেকে মনে করেন আর্যদের বার বার উল্লেখ করা 'হরিপুরিয়া' হরপ্পার নামান্তর মাত্র। হরপ্পার প্রত্ন সম্পদ কম হলেও তার সূচনা মহেনজোদড়োর আগে। নবপলীয় সভ্যতার স্তর থেকে নগরটি গড়ে উঠেছিল। সিন্ধু উপত্যকা বাদ দিলে ভারতবর্ষের আর একটি প্রাচীন নগরের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে পশ্চিম বঙ্গের অজয় নদীর তীরে।

জন মার্শাল মহেনজোদড়ো নগর খোঁড়ার সময় একখানা বিচিত্র শীল খুঁজে পান। এক যোগী যোগাসনে বসে থাকার ছবি শীলে খোদাই করা আছে। শীলে দেখা যায় এক মঞ্চের উপর যোগীবর যোগাসনে বসে আছেন। তার পুরুষাঙ্গ উত্থিত। অণ্ডকোষ দুটি স্পষ্ট করে দেখানো। যোগীবরের মাথায় মহিষের দুটি শিং। শিংয়ের নিচে তিন দিকে তিনটি মুখ। বুকে ত্রিভুজাকৃতি পাঁচটি লহর। জন মার্শাল শীলের যোগীবরকে 'পশুপতী শিব' বলে সনাক্ত করেছেন। শিবের এক নাম যোগীশ্বর। ইনি হলেন আদি পিতা। তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা বোঝাতে উত্থিত লিঙ্গের বোধহয় অবতারণা।

আদি মাতারও স্মারক পাওয়া গেছে। মাতৃকা মূর্তির মাথায় বিচিত্র শিরভূষণ। মাঝখানটা বাটির মত। অনেকে অনুমান করেছেন আদি মাতার শিরস্থান প্রদীপ রূপে ব্যবহৃত হত। আদি মাতার বুক বেয়ে নেমেছে লহরে লহরে মালা। কোমরে ঝুলছে মালা। যৌনদেশ অনাবৃত। এটা নিশ্চয় জন্মক্ষেত্র বোঝাতে অনাবৃত রাখা হয়েছে। লাল রংয়ের ঈষৎ চিহ্ন যুক্তবলে সিদুরের কথা মনে আসতে পারে। বুকে কোমরে কড়ির মালায় মাতৃত্বের পরিচয় স্পষ্ট। ইনি শিবের শক্তি মহামায়া।

ভারতীয় জনজীবন এবং ধর্ম চেতনায়, আচার আচরণে আদি মাতা ও আদি পিতার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। কোন সময় কত বছর আগে ভারতীয় চেতনায় আদি মাতা আদি পিতার কল্পনা জেগেছিল তা নির্ণয় করার কোন উপায় নেই। তবে ভারতীয় দেবতা গোষ্ঠীর মধ্যে এরা দু জনেই আদিমতর।

আর্যরা বহিরাগত এটা প্রায় নিঃসর্ত স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। ভারতীয় সভ্যতার ভিত এমন শক্ত যে বহু জাতির আগমন ও মিশ্রণেও তা টাল খায়নি। তাই স্বীকার করা দরকার যে আর্য আগমন পূর্বেই তার শিকড় দৃঢ় ভাবে গেঁথে গিয়েছিল। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি আর্য পূর্ব্ব অধ্যায়েই দৃঢ়মূল হয়ে উঠেছিল তার সূচনাকাল কোন অতীতে? নিশ্চয় সংখ্যা তত্ত্ব দিয়ে প্রশ্নের জবাব হবার নয়। তবে কয়েক সহস্র বছর পার না হলে কোন সভ্যতা এবং সংস্কৃতি এমন দৃঢ়মূল হতে পারে না।

অথচ ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির উৎস খোঁজা হয় ভারতের বাইরে। সর্বক্ষেত্রে পণ্ডিতদের অভিমত হয়ে দাঁড়ায় বহিরাগতের। প্রতিটি নৃ-তাত্ত্বিক জাতিকে বলা হয় বহিরাগত। সভ্যতার অভিনব নমুনাও বিদেশী প্রভাবজাত অথবা বিদেশ থেকে আগত।

যে নাগরিক সভ্যতা প্রাক্ আর্য যুগে সুদূর প্রসারী হয়ে উঠেছিল তা যে দ্রাবিড়দের কীর্তি তা নিয়ে আর কোন বিতর্ক নেই। বলা হয় দ্রাবিড়রা আর্যপূর্ব্ব যুগে ভারতে প্রবেশ করে সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। অথচ দ্রাবিড়দের যে আদি নমুনা নির্ভেজাল নমুনা একমাত্র ভারতবর্ষেই বেঁচে আছে তাতো আমাদের স্বীকার করতে হবে দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী এবং ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম অধ্যায়ের বেশির ভাগই বহিরাগত!

টোড সম্প্রদায় এবং 'ব্রাহাই' ভাষার নমুনা পণ্ডিতজনদের অনেক ধারণাই যে গোলমেলে তা প্রমাণ করে দিচ্ছে।

পণ্ডিতজনদের মতে দ্রাবিড় মূল ভাষা থেকে নানা পরিবর্তনের পরে বহু ভাষা সৃষ্টি হয়েছে। মূল দ্রাবিড় ভাষা থেকে নানাবিধ ছড়িয়ে পড়া ভাষার শাখা তার প্রথম উদ্ভব ঘটেছিল ৬০০০ বছর আগে। ৬০০০ বছর আগে দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠী থেকে যে শাখা ভাষা তৈরী হয় সে ভাষার নাম 'ব্রাহাই'। ব্রাহাই ভাষাভাষি এলাকাও কিন্তু এই ভারতেরই উত্তর প্রদেশে।

দ্রাবিড়দের বসতভূমি এখন পৃথিবীর একাধিক

এলাকায় প্রসারিত। দ্রাবিড় এবং দ্রাবিড় গোত্রের জনগোষ্ঠীর সংখ্যাও আজ আর সামান্য নয়। পৃথিবীর জনগোষ্ঠীর এক বড় অংশ এখন দ্রাবিড় অথবা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষ। তাদের আদি নমুনা বা আদি জনগোষ্ঠী কি রকম ছিল তার একমাত্র জীবন্ত নমুনা টোডে সম্প্রদায়।

টোডরা বহিরাগত প্রমাণ করতে পারলে দ্রাবিড়রা বহিরাগত তা প্রমাণিত হয়।

টোড সম্প্রদায় নানা কারণে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেছে। অথচ তাদের জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশ জীবন্ত ফসিল হবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকেনি। তারা ছড়িয়ে পড়েছে মুক্ত পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায়। চড়াই উৎরাই পার হয়ে বিবর্তনের নানা দিকে এগিয়েছে। জীবনযাত্রায় নানা রকম পরিবর্তন এনেছে। মহিষকেন্দ্রিক ধর্ম অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে বিবিধ রকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান তৈরী করে নিয়েছে। বহু জাতির সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে নৃতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটিয়ে নিয়েছে। ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে সুদূরপ্রসারী এক জাতিতে পরিণত হয়েছে। ক্ষুদ্র এক জনগোষ্ঠী নীলগিরি পাহাড়ে আটকে থেকে জীবন্ত ফসিলে পরিণত হয়ে আছে তা বোঝা সহজ নয়।

টোডদের মহিষকেন্দ্রিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান অন্য একটা কথা মনে করিয়ে দেয়। মহেনজোদড়োতে যে পশুপতির আদি স্মারক পাওয়া গেছে তার মাথায় শিরস্ত্রাণ রূপে শোভা পাচ্ছে মহিষের দুটি শিং। টোডদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পুরোহিত যে সকল দেবদেবীর নাম উল্লেখ করে তার ভিতর অন্যতম শব্দ 'খোরজান' বা 'খোরশাম'। আশ্চর্যের কথা এখানে যে মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন দেবদেবীর নামের সঙ্গে শব্দ দুটি জড়িয়ে আছে। তাই বলে কল্পনা করা যাবে না যে মেসোপটেমিয়া থেকে দ্রাবিড়রা আগত।

দ্রাবিড়রা যদি বহিরাগত হত তবে তাদের অনুপ্রবেশ পথ হবে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ দিক। ভাষাতত্ত্ববিদরা দ্রাবিড়দের যাত্রাপথ উত্তর-পশ্চিম বা উত্তর থেকে দক্ষিণ মুখী তা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে দ্রাবিড় ভাষা দক্ষিণ দিক থেকে যাত্রা করেছিল উত্তর দিকে। একটি দ্রাবিড় ভাষাভাষি জনগোষ্ঠীর লোককথায় দক্ষিণ থেকে উত্তরে [illegible]থের সমর্থন মেলে। এ ভাষা গোষ্ঠীর মানুষরা 'বজুরুক' উপজাতি নামে চিহ্নিত। এরা এখন বাস করে মধ্যভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে। তাদের লোককথায় আছে তারা দক্ষিণ দিক থেকে চলতে চলতে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে এসে পড়েছে। আদি দ্রাবিড় রূপকথা বলে স্বীকৃত যে রূপকথাটি তাতেও আছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে যাত্রা করার কথা।

প্রাচীনতম নৌকোর নমুনা ভারতবর্ষ থেকেই পাওয়া গেছে। মহেনজোদড়োতে প্রাপ্ত নানা নকশার মধ্যে নৌকোর ছবিও আছে। মেসোপটেমিয়ার নগর খনন করার ফলে যে সব পণ্য পাওয়া গেছে তার অনেক গুলোই দ্রাবিড়দের। একটি চন্দন কাঠের নমুনা পাওয়া গেছে যা সবার আগে মনযোগ আকর্ষণ করবে তার কারণ এ রকম চন্দনকাঠ একমাত্র ভারতের মালাবার অঞ্চলেই জন্মায়। বলা বাহুল্য এ অঞ্চলেই বাস করে দ্রাবিড়দের আদি স্মারক টোডরা।

বোম্বে শহরের কাছে কাথিওয়াড় উপদ্বীপে আবিষ্কৃত হয়েছে পৃথিবীর সব থেকে পুরানো সমুদ্র বন্দর। সমুদ্র বন্দরের নাম 'লোথাল'। 'লোথাল' সমুদ্র বন্দর তৈরি হয়েছিল ৪০০০ বছর আগে। 'ব্রাহাই' ভাষার সূচনাকাল ৬০০০ বছর আগে। অনুমান করা যায় বন্দরটি তৈরী করেছিল কারা।

সুমেরিয়ান উপকথায় আছে তাদের দেশে সভ্যতা এসেছিল নৌকোয় বা মাছের উপর চেপে। জ্ঞানের অধিশ্বরী অর্দ্ধ মানব অর্দ্ধমীন। তিনি মীন মানব। সুমেরীয়ানদের দেবদেবীর নামের সঙ্গে টোডদের ধর্মানুষ্ঠানের উচ্চারিত কিছু নামের মিল আছে তা পূর্বে বলা হয়েছে। সুমেরিয়ানদের ভাষায় 'উর' শব্দের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। টাইগ্রীস নদীর নাম তাদের ভাষায় 'উড়িগলাত'। 'উড়' কথার অর্থ জল বা নদী। পেশা বোঝাতে নামের শেষে 'গার' শব্দটির ব্যাপক প্রচলন ছিল। 'এনগার' কথার অর্থ চাষী। 'নানগার' কথার অর্থ কাঠমিস্ত্রী। 'দাসগর' কথার অর্থ ব্যবসায়ী। দ্রাবিড় ভাষায় সার কথার

অর্থ হাত।

দ্রাবিড় ভাষা শাখা-প্রশাখা দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে গেছে। ভারতীয় ভাষার বেশির ভাগই দ্রাবিড় ভাষা থেকে সৃষ্টি অথবা দ্রাবিড় ভাষার সহযোগিতায় সমৃদ্ধ। অথচ দ্রাবিড় ভাষার উদ্ভবস্থান নির্বাচনে অনুসন্ধান চলে সুমার, ইলাম, ককেশাস পর্বতমালা পর্যন্ত! দ্রাবিড় ভাষার ৫০০ বেশি উপভাষা ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে।

নৃতাত্ত্বিকদের মতে মূল দ্রাবিড়দের সঙ্গে সব থেকে বেশি মিল টোডদের। দ্রাবিড়দের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এরাই রক্ষা করতে পেরেছে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে বাস করেছে বলে। টোডরা প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তামিলনাদের নীলগিরি পাহাড়ের উপত্যকায় এক জীবন্ত ফসিলের মত বাস করে। পাহাড় দিয়ে ঘেরা এলাকায় তারা নৃতাত্ত্বিকদের বিস্ময় হয়ে আজো বেঁচে আছে। অবশ্য বর্তমানে তাদের জীবনযাত্রায় নানা রকম পরিবর্তন এসেছে। তবুও তাদের নৃতাত্ত্বিক প্রাচীনত্ব বেশির ভাগই অব্যাহত আছে।

অনুমান করা যায় মানব বিবর্তনের এক অধ্যায় দক্ষিণ-ভারতের কোন অঞ্চলে অভিনীত হয়েছিল। তারাই আজ দ্রাবিড় নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয় নিয়ে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়ে আছে।

বস্তুত প্রত্নতাত্ত্বিক কোন আবিষ্কার অনুমানের স্বপক্ষে এখনও দাঁড়ায় নি। তাই বলে অদূর ভবিষ্যতে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যাবে না তা হলপ করে বলা যায় না। ইতিহাস দাঁড়ায় প্রমাণের উপর। তাই অনেক পণ্ডিত দ্রাবিড়দের উদ্ভব অধ্যায় খুঁজে না পেয়ে 'লিমুরিয়া' নামে এক ভূ-খন্ডের পরিকল্পনা তৈরী করেছেন। তাদের মতে 'লিমুরিয়া' ভূ-খন্ডেই মানুষ বর্গীয় জীবের উদ্ভব হয়েছিল। সে 'লিমুরিয়া' সমুদ্রের নিচে তলিয়ে গেছে। সেই তলিয়ে যাওয়ার স্মৃতি নানা জাতির রূপকথায় ধরা আছে। বিভিন্ন দেশের পুরাণে, উপকথায়, জল-প্লাবনের কাহিনীগুলি একটি বড় প্লাবনের ইতিহাস ধরে রেখেছে তাতে সন্দেহ নেই।

নীলগিরি পাহাড়ের উপত্যকায় অগ্রগতির ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন টোড সম্প্রদায় দ্রাবিড়দের আদিমতর নমুনার স্মারক হয়ে বেঁচে থেকে মানুষের সভ্যতার যে ইতিহাস তাতে নতুন চিন্তার জন্ম দিয়েছে।

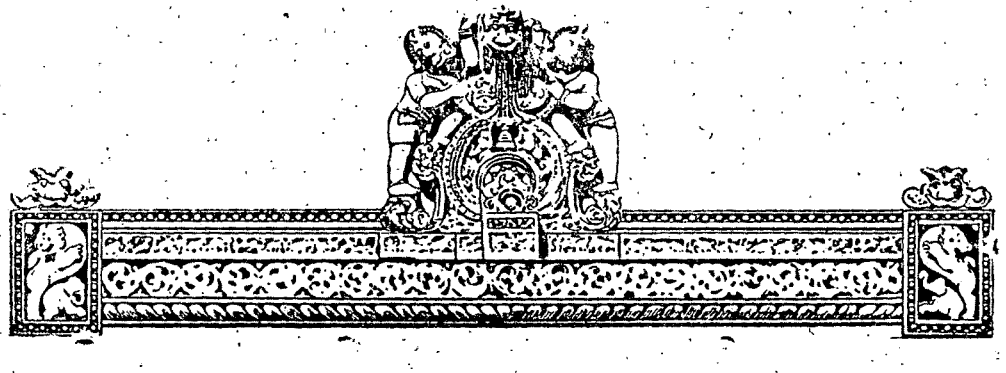

প্যাকেজ ট্যুরে দক্ষিণের মন্দিরে মন্দিরে

গৌরমোহন দাস দে

তিরুপতিনাথ দর্শন যে সহজ ব্যাপার নয়, তা আমি অনেকের মুখেই শুনেছি, বেশ কয়েক বছর ধরে। আমার রামেশ্বর ও কন্যাকুমারী দর্শনের বাসনা বহুদিন ধরেই মনে মনে ছিল। প্রায় তিরিশ বছর আগে, যৌবনের কোলাহলের দিনে, আশেপাশে শিশু পুত্র-কন্যাদের নিয়ে যখন দিনযাপন করছি তখন একদিন দেখলাম, আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুরমশাই ও শ্বাশুড়ী-মা, গাঁটরী-বিছানা বেঁধে, রামেশ্বর তীর্থের পথে রওনা দিচ্ছেন। তাঁদের মুখেই শুনেছিলাম দক্ষিণ-তীর্থ বেশ কষ্টসাধ্য। সেখানে উত্তরের তীর্থের মত আহার নেই। নেই বিশুদ্ধ ঘিয়ে তৈরী পুরী-পরোটা বা মুখরোচক মিষ্টি এবং ক্ষীরের পেঁড়া। তাঁরা ধর্ম্মশালায় থাকবেন, স্বপাকে আহার করবেন। সেজন্যে দেখলাম চাল, ডাল, গাওয়া ঘি থেকে আরম্ভ করে গুঁড়া-মশলা পর্য্যন্ত তৈরী করে নিয়ে যাচ্ছেন। কেন না তখন প্যাকেটে গুঁড়ামশলা পাওয়া যেতো না।

নাতি-নাতনীদের বার বার চুমো খেয়ে ও আমাকে যথেষ্ট সাংসারিক বিষয়ে উপদেশ দিয়ে, কান্নাভেজা চোখে তাঁরা তীর্থের পথে রওনা দিলেন সজল চোখে। আমি সেদিন তাঁদের বিদায় দেবার ক্ষণে, বুঝতেই পারিনি, তীর্থে গেলে কি হয় বা পরলোকে কি উপকারে লাগে। নতুন সংসারের আনন্দে আমি তখন বিভোর। পরে তাঁরা ফিরে এসেও বলেছিলেন, "বৌমা, এ-তীর্থ তুমি পারবে না, বড়ই কষ্টসাধ্য।"

তারপর বহু বছর কেটে গেছে। দেহ ও মনের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে নিজের জীবনে। দেশ-বিদেশ অনেক ঘুরেছি। উত্তরের হরিদ্বার, কাশী, গয়াতীর্থও দর্শন করেছি কয়েকবার। তবুও এই দক্ষিণতীর্থের পথে পা বাড়াতে সাহস করি নি। অবশ্য তাঁদের মুখে তিরুপতি নারায়ণের নাম মনে হয় শুনিনি। শুনেছি বন্ধুবান্ধব ও অন্য আত্মীয়-স্বজনের মুখে মুখে। তাঁরা সবাই বলেছেন, 'তিরুপতি' না টানলে, তাঁকে দেখার সৌভাগ্য মানুষের ভাগ্যে ঘটে ওঠে না। আমি যে খুব বিশ্বাস করেছিলাম, তা নয়। মনে মনে আমার ইষ্টদেবী কালীমাকেই ডেকে চলেছিলাম। সাধ ছিল দেখার স্বামী বিবেকানন্দের চরণ স্পর্শিত বিবেকানন্দ শিলা ও ত্রি-সাগরের মিলনক্ষেত্র কন্যাকুমারী ও মায়ের কন্যা রূপ। আমার জন্মভূমি, এই ভারতের শেষ সীমার অবর্ণনীয় রূপ দেখার বড়ই আশা ছিল।

মনের এই অবস্থায় নভেম্বরে এক বাঙালী সংস্থার সঙ্গে দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণের যখন সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে, যখন বিছানাপত্র বাঁধা-ছাদা সম্পূর্ণ, তখন আমার শ্রদ্ধেয়া শ্বাশুড়ী-মা পরলোকে চলে গেলেন। প্রবীণা হয়েছিলেন, মৃত্যু স্বাভাবিক সত্য, তবুও দক্ষিণ তীর্থ ভ্রমণে এই বাধা, মনের এক কোণে বিষাদের একটা কাঁটা ফোটাতে লাগল। আবার লোকমুখে শুনতে লাগলাম, 'তিরুপতি না টানলে, তাঁর দর্শন পাওয়া যায় না।'

এরপর থেকে প্রতিদিন আমি, আমার ঠাকুর ঘরে নারায়ণের পটের সম্মুখে বসে, তিরুপতি নারায়ণকে স্মরণ করতে লাগলাম। দর্শন দেবার জন্যে তাঁর কাছে আকুতি জানাতে লাগলাম। তীর্থ দর্শনের প্রস্তুতি চলতে লাগল আমার মনে মনে। মা-সারদা বলেছেন, 'সময়ের আম ও অসময়ের আমের স্বাদ কি এক প্রকার হয়? তফাৎ ত থাকবেই। দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ, আর দক্ষিণ-ভারতের

তীর্থে তীর্থে গিয়ে, শক্তি ও শিবের নানান রূপ দেখার বাসনার মধ্যে তফাৎ অনেক। মনের এই প্রস্তুতির পরে এই প্রবীণ বয়সে, তাই আমি শিব-শক্তির নানান রূপ দর্শনে মুগ্ধ হয়েছি। অভিভূত হয়েছি, সেই পুরাকালের সাধু-সন্ত ও ঋষিদের চরণ-রেণুমাখা পবিত্র স্থানের দর্শনে। মাথা নত করে অগণিত মন্দিরের চত্বরে চত্বরে প্রণতি জানাতে আমার অন্তরাত্মা পেয়েছে এক পরম আধ্যাত্মিক আনন্দ। এই দক্ষিণ দেশেই শঙ্করাচার্যের জন্ম। রামানুজ ও মধ্ব মুনির জন্মও এই দাক্ষিণাত্যে। সমগ্র বেদরাশির টীকা, যাঁর প্রতিভা, ত্যাগ ও পরিশ্রমের ফলে সৃষ্ট হয়েছিল, সেই 'পঞ্চদশী' গ্রন্থের রচয়িতা, সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্য মুনি সায়ণের জন্মভূমিও এই দক্ষিণ-দেশ। স্বামী বিবেকানন্দের বইএ পড়েছি—বৈষ্ণব ধর্মের জন্মও এই দক্ষিণদেশে। "তামিল নীচবংশোদ্ভূত শঠ কোপ হ'তে উৎপন্ন, যিনি 'বিক্রীয় সূপং সচচার যোগী।' এখনও এই তামিল ভক্তগণ সমগ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পূজ্য হয়ে রয়েছেন।

সাধুরা, শিষ্যদের কিছুদিন আশ্রমে বসবাসের পর তীর্থ ভ্রমণে যেতে আদেশ করেন। স্বামী বিবেকানন্দও পরিব্রাজক বেশে, ভারতের তীর্থে তীর্থে বহুদিন ঘুরে বেড়িয়েছেন। বিগ্রহ দর্শন করে ও পূজা করে যেমন তিনি আশীর্ঘাদধন্য হয়েছেন, তেমনই ভারতের অগণিত দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা চাক্ষুষ দর্শন করে, নিজের বেদনারক্ত হৃদয়ে সেবা ধর্মের বীজ বপন করেছেন। তবেই তাঁর বাণীতে শোনা গেছে—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে দয়া করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

গত ২৩শে মার্চ করমণ্ডল এক্সপ্রেসে, আমি ও আমার স্বামী দক্ষিণ-ভারত তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। এবারে আর বাঙালী কোন ভ্রমণ-সংস্থার সঙ্গে নয়। নিজেরাই ট্রেনের টিকিট কাটিয়ে বেরিয়ে পড়ি। এখান থেকে ট্যুরিষ্ট অফিসে একটু খোঁজ-খবর নেওয়া ছিল। এই ট্রেন বেশ দ্রুত চলে। যখন তখন, সিট রিজার্ভ না করে গাড়ীতে ওঠার মানুষের ভীড় নেই। নিজেদের রিজার্ভ করা সিটে, নিজেরা বসে বাইরের দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম। অন্য সঙ্গীরা কেউ বাঙালী নন, মাদ্রাজী। কলকাতায় কাজকর্ম করে। চলেছে ছুটিতে দেশে; গৃহে, স্বজনের সন্নিধানে, আনন্দ পরিবেশে। সঙ্গে রয়েছে কলকাতার সেরা মিষ্টি 'রসগোল্লা'। এক বৃদ্ধ তামিল ভদ্রলোক সঙ্গে নিয়েছেন কন্যার জন্যে একখানি রন্ধনের লোহকড়াই। তাঁরা চলেছেন নিজ আবাসে আর আমরা চলেছি পরবাসে, অজানার সন্ধানে, তীর্থ ভ্রমণে।

ভ্রমন-পিপাসু আত্মায় মোরে
বেঁধেছে এমন সোহাগ-ডোরে
পিছু পিছু ফিরি নেশার ঘোরে
মাতালের সম মেতে।
বাহির বিশ্ব বুকে দেয় দোলা,
পিপাসু আত্মার কাণে কথা বলা
সেই কারণেই পথে পথে চলা
সাথে সাথে সোহাগেতে ।।

ভ্রমণের মধ্যে যে আনন্দ, তা আমরা উপভোগ করি। মানুষের সঙ্গ আমরা ভালবাসি। আমার স্বামী আলাপী লোক সঙ্গী যাত্রীদের সঙ্গে, আলাপে মুখর হয়ে উঠেছেন। আমি দেখে চলেছি বাইরের দৃশ্যপট।

বাংলার শেষ সীমা মেদিনীপুরের খড়ের ছাওয়া, মাটির দোতলা বাড়ীগুলোকে দেখা যাচ্ছে। বাঁশঝাড়, পুকুর, বাগান সবই চোখে পড়ছে। ধানকাটা জমিতে খড় জমা করা রয়েছে। গরু-ছাগল ঘরে ফেরার আগে, জড় করা খড়ে মুখ লাগিয়ে চিবোচ্ছে। কোনও চাষের জমি কর্ষিত হয়েছে। নরম কালোমাটি উন্মুখ হয়ে আছে বীজের প্রত্যাশায়। এত চাষের জমি ও ফলিত শস্য দেখে বিস্ময় জাগে, প্রশ্ন জাগে মনে, এত শস্য থেকেও আমার দেশের অগণিত মানুষ, অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকে কেন?

পশ্চিম গগনে সূর্যদেব ঢলে পড়েছেন। রক্ত রাঙা আকাশকে বড়ই সুন্দর লাগছে। গাড়ীর মধ্যেই কফি বিক্রি হচ্ছে। এ'গাড়ীতে ভিতর দিয়ে প্রতি কামরায় যাওয়া যায়। রেষ্টুরেণ্ট কামরায় খাবার, কফি সব তৈরী

হচ্ছে। আমাদের সঙ্গে লুচি-তরকারি সন্দেশ ছিল। তাই দিয়েই রাতের আহার সারা গেল। রাতের অন্ধকারে চারদিক ভরে গেছে। আমরা যে যার সিটে শুয়ে পড়লাম ও গাড়ীর দুলুনীর সাথে সাথে চোখ ঘুমে ঢলে পড়ল।

পরদিন সকালে দেখলাম আমরা অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। দৃশ্যের পট বদল হয়ে গেছে। দূরে দেখা যাচ্ছে শৈলমালা। রুক্ষ প্রান্তরে তালগাছের ছড়াছড়ি। চাষের জমির মাঝে মাঝে আলের উপর দাঁড়িয়ে আছে সুদীর্ঘ তালগাছের সারি। তাল পাতার তৈরী বাড়ীতে চাষীদের বাস। শুনেছি অন্ধ্রপ্রদেশ এখনও অনুন্নত। দরিদ্র লোকের সংখ্যা এখানে খুবই বেশী। গাড়ী 'ওয়ালটেয়ারে' এসে থামল। বিশাখাপত্তনমের একটি সহর। 'বিশাখাপত্তনমে,' জাহাজ তৈরীর কারখানা আছে। 'ওয়ালটেয়ারে' আম পেয়ারা কলা প্রভৃতি ফল প্রচুর জন্মায়। ষ্টেশানে প্যাকিং করা ঝুড়িতে প্রচুর 'পেয়ারা ভারতের অন্যান্য জায়গায় রপ্তানি করা হচ্ছে। আমরা কয়েকটা রসাল পেয়ারা, কলা ও আমসত্ত্ব কিনলাম। এরপর আমরা 'রাজামুন্ডী' সহর পার হলাম। এর পরেই এল 'গোদাবরী ব্রিজ'। এই নদী ভীষণ চওড়া। খানিকটা বালির চড়া পড়া সত্ত্বেও প্রচুর জল রয়েছে নদীতে। নৌকা চলাচল করছে। ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীকে নিয়ে এই গোদাবরী তীরে বসবাস করে গেছেন। মনে এই কথা জাগতেই ভক্তিরসে আমার মন রসসিক্ত হয়ে উঠল।

'বিজয়াবাড়ে' আমাদের গাড়ী থামল। এখানেই আমাদের জন্যে ট্রেনের দুপুরের খাবার এল। উত্তর ভারতের চেয়ে এখানের ট্রেনের রেষ্টুরেণ্টের তৈরী খাদ্য অনেক উচ্চমানের। ছোট ছোট রেলওয়ে ষ্টেশান চলে যাচ্ছে। গাড়ী থামে না। আমরা এখনও অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। স্বাধীন ভারতে অনেক নাম বদল হয়ে গেছে। পূর্ব্বের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীকে এখন 'তামিলনাড়ু' বলে। তামিল ভাষাভাষী মানুষ এখানে বাস করেন। অন্ধ্রে ভাষা তেলেগু। কেরালার ভাষা মালয়ালাম ও কর্ণাটকেরও আলাদা ভাষা। তবুও এঁরা সকলেই দক্ষিণ ভারতীয় ও দ্রাবিড় জাতি। এদের সভ্যতা সর্বপ্রাচীন। এদের এক শাখা মালাবর উপকূল হয়ে অদ্ভুত মিসরী সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল। আর্য্যরা এই দাক্ষিণাত্যের মানুষদের কাছে অনেক বিষয়ে ঋণী। এই যুগেও জন্ম নিয়েছেন বহু বিদ্বান গুণী ভারত সন্তান এই দক্ষিন দেশে। রাষ্ট্রপতি ডঃ 'সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি ও স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল রাজা সোপালাচারী—এরা সবাই দক্ষিণ-ভারতেরই মানুষ।

গাড়ীর মধ্যেই বার বার হাঁক দিয়ে যাচ্ছে কফি ও বোতলের জল। মাদ্রাজীরা খুব কফি পান করে।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। 'নেলোর' সহর পার হয়ে গেল, এখনও আমরা অন্ধ্রপ্রদেশে রয়েছি। বেশ বড় সহর। মাদ্রাজ সহর এবার খুব নিকটবর্তী। বসতি চোখে পড়ছে। দেখা যাচ্ছে কলকারখানা। মোটরবাস তৈরীর কারখানা 'অশোক লেল্যান্ড' দেখা গেল। টেলিভিসানের এরিয়াল চোখে পড়ছে। সঙ্গের মাদ্রাজী সঙ্গীরা বিছানাপত্র বাঁধছেন। জানলাম গন্তব্যস্থলে নির্বিঘ্নে পৌঁছালাম। ভারতের বড় বড় সহর আমার দেখা হয়ে গেছে, শুধু দেখা হয়নি মন্দিরের দেশের রাজধানী এই মাদ্রাজকে। অধীর আগ্রহে দর্শনের প্রত্যাশায় রইলাম। সাগর দেখার ইচ্ছা ছিল। সাগর অনেক দূরে,তবে সাগরের জল বিস্তীর্ণ এলাকায় খাল কেটে এনে, তা থেকে লবণ তৈরী হচ্ছে দেখলাম। সাদা সাদা লবণের স্তূপ জমা করা রয়েছে। রাত্রি আট ঘটিকায় আমরা 'মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশানে' এসে পৌঁছালাম। ষ্টেশানের কাছাকাছি রাতের বিশ্রামের জন্যে 'বিশ্রাম' হোটেল পাওয়া গেল।

পরদিন সকাল আট ঘটিকায় তামিলনাড়ুর ট্যুরিষ্ট অফিসে গিয়ে, দুইখানা করে সাতদিনের প্যাকেজ ট্যুরের, ট্যুরিষ্ট বাসের টিকিট কেনা হ'ল। প্রথমটা 'তামিলনাড়ু ভ্রমণ ও পরেরটা 'সমগ্র দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ'। এই টিকিটে জায়গার নাম লেখা আছে। এই সকল প্যাকেজ ট্যুরের বাস, শনিবার ভোর ৬টায় ছাড়ে ও রাত সাতটায় যেখানে বাস থামে সেখানে বিশ্রাম। এইভাবে সপ্তমদিনে সমস্ত দর্শনীয় জিনিষ ও মন্দির দর্শনের পর শুক্রবার সন্ধ্যায় মাদ্রাজে ট্যুরিষ্টদের ফিরিয়ে আনা হয়। ট্যুরের টিকিটের মধ্যে দেখলাম তিরুপতি নারায়ণের নাম নেই। তাই আলাদা আবার দুখানা টিকিট কিনতে হ'ল। দর্শন ফি

পঁচিশটাকা সমেত এক একজনের নব্বই টাকা করে লাগল। তিরুপতিকে না দেখে রামেশ্বর-শিব বা কন্যাকুমারীকে দেখবো না এটাই মনে মনে স্থির করে এসেছিলাম।

বৃহস্পতিবার ভোর চারটের, কাকপক্ষী যখন জাগেনি, তখন উঠে স্নান সেরে, নতুন শাড়ী পরে দেবদর্শনের জন্যে তৈরী হলাম। ঠিক পাঁচটায় আমরা একখানা রিক্সায় চেপে বাস-ষ্টেশানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

ফুটপাতের মানুষের, তখনও ফুটপাতে রাস্তার ধারে ঘুমিয়ে রয়েছে। দু'একখানা রিক্সা ও অটোরিক্সা চলতে আরম্ভ করেছে এবং সহরতলীর প্রথম বাস সবে রাস্তায় নেমেছে। ঘুমন্ত-নিস্তব্ধ প্রভাতের মাদ্রাজ সহরকে আর একরূপে দেখতে লাগলাম। ঠিক ছ'টায় আমাদের ট্যুরিষ্ট-বাস ছাড়ল। গদিমোড়া পিঠের দিকে হেলানো বাস-গুলো বেশ আরামদায়ক। বাস ছুটতে লাগল। মাদ্রাজ সহরের অনেক কিছুই, আশেপাশে যা দেখা যাচ্ছে গাইড ইংরাজীতে তা বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। টেপ-রেকর্ডারে গান বাজতে লাগল। মনে মনে তিরুপতি নারায়ণকে স্মরণ করে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলাম।

প্রথম আমাদের বাস একটি ছোট দোকানের সামনে থামল, প্রভাতী কফিপানের জন্য। সেই দোকানের টয়লেট ব্যবহার করতে গিয়ে, আমার স্বামী ভাঙ্গা দরজায় ধাক্কা খেয়ে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়লেন। আমার সাহায্যে উঠে দাঁড়ালেন বটে, তবে মাথায় বেশ আঘাত পান ও পিঠে খানিকটা ছড়ে যায়। যাত্রার প্রারম্ভে এই বাধা মনটাকে খারাপ করে দিল। আঘাত গুরুতর নয়, সেজন্য আবার তিরুপতিকে প্রণাম জানালাম। দুজনে দুগ্লাস কফি পান করে সুস্থবোধ করলাম। পরে একা বড় শহরে প্রাতঃরাশের জন্য বাস থামলে সঙ্গীরা সকলেই ইডলী, ধোসা দিয়ে প্রাতঃরাশ সারলেন। আমরা কোনও খাদাই গলাধঃকরণ করলাম না। দক্ষিণ দেশে দেখলাম, দেবদর্শনে যাবার আগে উপবাসের কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নেই। আমরা অন্ধ্রপ্রদেশে চলেছি। মাদ্রাজ থেকে একশত-তেতাল্লিশ মাইল দূরে, অন্ধ্রের 'তিরুমালা' পর্ব্বতের উপর অবস্থিত এই তিরুপতি নাথের মন্দির। সাতটী পর্ব্বতের সংযোগে এই পর্ব্বতমালা। হাইওয়ে দিয়ে চলেছি। দূরে দুপাশে দেখা যাচ্ছে পাহাড়। আমরা একটি বড় সহর 'রেনিগুণ্টা' পার হয়ে গেলাম। পাহাড়তলীতে কিছু কিছু ঘরবাড়ী ও চাষের জমি দেখা যাচ্ছে। এরপর আমরা পাহাড়ের তলদেশে এসে উপস্থিত হলাম।

গাইড আমাদের সবাইকে ট্যুরিষ্ট বাস থেকে নামতে বললেন। ওখানকার ছোট বাসে পাহাড়ে ওঠা হবে। সকলে বাসে উঠলাম। সঙ্গের সঙ্গী মহিলারা আমাকে সতর্ক করতে লাগলেন। যত্ন করে দু'টী গুজরাটী তরুণ আমাকে তাদের পাশে মাঝের সিটে বসালো। কেননা 'আপ্টির' পাহাড়ে ওঠাকালীন মাথা ঘুরতে পারে। মনে মনে আমি হাসি। স্মৃতি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। পৃথিবীর নানা পর্ব্বতের চূড়ায় আমি উঠেছি এই বাস সহযোগে ও ধারের সিটে বসে বসে, উপভোগ করেছি বিরাটের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য। আমার কবিমন আনন্দে গেয়ে উঠেছে—

রূপ দেখে দেখে ভরে না যে আঁখি
পিপাসিত আমি তৃষিত চাতকী
জগতের রূপে তোমায় নিরখি
প্রণিপাতে নত হয়েছি॥

সন্তানতুল্য ঐ ছেলেদের মানা আমি মেনে নিলাম। ঘুরে ঘুরে বাসটি উঠছে পাহাড়ের গায়ে। একপাশে খাদ। সেখানে চাষের আবাদ রয়েছে। ছোট ছোট বাড়ীঘরও রয়েছে। ক্রমশঃ প্রচুর লালটালির ছাদের ছোট ছোট বাংলো বাড়ী চোখে পড়তে লাগল। জানলাম, এইগুলি যাত্রীদের বসবাসের বাড়ী। ভাড়া করে থাকা যায়। ভারতের সবচেয়ে ধনী এই তিরুপতি নারায়ণের মন্দির ও তার সংলগ্ন বাড়ী-ঘর, জায়গাজমি সবই এখানের সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে। ক্রমে আমাদের বাস এসে থামল।

ঐখান থেকে চটি-জুতো খুলে, আমাদের গাইডের সঙ্গে সঙ্গে যেতে হ'ল। পাথর দিয়ে বাঁধানো চত্বর, আশে পাশে মন্দির। প্রণাম করতে করতে চলেছি। ধর্ম্মশালা হোটেল সবই চোখে পড়ছে। আমরা মন্দিরের কাছাকাছি এসে

উপস্থিত হলাম। মন্দিরের চূড়ায় কলস খাঁটি স্বর্ণ-নির্ম্মিত। এত সোনা নাকি দক্ষিণের শ্রীরঙ্গমে, শ্রীরঙ্গনাথ মন্দির ছাড়া আর কোথাও নেই। মধ্যসূর্য্যের প্রখর রশ্মি ঐ স্বর্ণকলসে ছড়িয়ে পড়ায়, তাকে আরো উজ্জ্বল করে তুলেছে। পাথরে বাধাঁনো চত্বরের পাশে পাশে প্রচুর দোকান সাজানো রয়েছে তিরুপতিনাথের (ভেঙ্কটেশ্বর) ছবি, নানান মূর্ত্তি। পিতলের ও তামার তৈরী দেবদেবীর মূর্ত্তি ও হরেক রকমের পূজার সামগ্রী। আমি একটি পিতলের দীপাধার কিনলাম। একটি জায়গায় দেখলাম, মেয়ে পুরুষ অনেকেই মানসিক করা মাথার চুল কামিয়ে নেড়া হচ্ছেন। এর পর সকলে ওখানকার কুণ্ড বা পুকুরে স্নান করছেন। আমরাও সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নেমে ঐ পবিত্র বারি স্পর্শ করলাম। ঐ পুকুরের চতুর্দ্দিকে বাঁধানো চওড়া চওড়া সিঁড়ি রয়েছে। জলের মাঝখানে একটি পাথরের চাতাল, কারুকার্য্য খোদিত থাম দিয়ে ঘেরা ও মাথার উপরে ছাদ রয়েছে। ঐখানে উৎসবের দিনে বিগ্রহকে বসানো হয়। নৌকায় বসিয়ে ফুলে ফুলে সাজিয়ে জলে নৌকাবিহারও করানো হয়।

প্রথমেই আমরা মহালক্ষ্মী মন্দিরে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে এলাম। কেননা তখন শ্রীবালাজীকে দর্শনের সময় হয় নি।

এই মহালক্ষ্মী মন্দির ও তিরুপতি মন্দিরের বিষয়ে অনেক পৌরাণিক গল্প আছে। পুরাকালে ভৃগুমুনি যখন বৈকুণ্ঠে যান, তখন মহাবিষ্ণু অনন্তশয্যায় শুয়ে লক্ষ্মীদেবীর পদসেবা নিচ্ছিলেন। মুনিবর নারায়ণের সাদর অভ্যর্থনা না পেয়ে, অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে শ্রীহরির বুকে পদাঘাত করেন। বিষ্ণু শান্তভাবে শয্যা থেকে নেমে এসে ভৃগুমুনির চরণে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, 'মুনিবর আমার এই কঠিন বক্ষে পদাঘাত করে তোমার না জানি কত লেগেছে'। সঙ্গে সঙ্গে দর্পহারী মধুসূদন ভৃগুর পদতল থেকে তাঁর তৃতীয় নয়নটী খুলে নিলেন। এই তৃতীয় নয়নের জন্যে মুনি ভীষণ গর্ব্বিত ছিলেন।

এদিকে মহালক্ষ্মী তাঁর স্বামী নারায়ণের বক্ষে, যেখানে তাঁর বাসস্থান, সেখানে মুনিকে পদাঘাত করতে দেখে, ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করে ভূলোকে চলে আসেন। নারায়ণ, লক্ষ্মী লক্ষ্মী করে চীৎকার করতে করতে তিনিও মর্ত্তে নেমে আসেন। এখানে কলিযুগের এথম দিকে বরাহ অবতার রূপে শ্রীহরি অসুর হিরণাক্ষকে বধ করেন। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করতে থাকেন আকাশ থেকে এবং তাঁকে এই ভূলোকে থাকতে অনুরোধ করেন। শ্রান্ত শ্রীহরি এক তেঁতুল গাছের নিচে বল্মীক দেখে, সেখানে চিরদিনের মত বাস করতে ইচ্ছা করেন।

ব্রহ্মা ও মহেশ্বর, বিষ্ণুর এই ধ্যানস্থ অবস্থা দেখে তাঁর আহারের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন। মহালক্ষ্মীকে ডেকে, তাঁকে গো-রক্ষী সাজতে বলেন ও নিজেরা গাই গরু ও বাছুর সাজেন। চোলরাজা চন্দ্রগিরির নিকট মহালক্ষ্মী এইভাবে ঐ গাভী ও তার বৎসকে বিক্রয় করেন। ঐ গাভী, প্রতিদিন বল্মীকের নিকট গিয়ে শ্রীবিষ্ণুকে দুধ পান করায়। রাণী দুধ না পেয়ে গো-রক্ষককে খুব গালি-গালাজ করেন। অপমানিত দাস, একদিন লুকিয়ে এই দুধ দেওয়ার দৃশ্য দেখে, গাভীকে খুব আঘাত করে। নারায়ণ তখন বল্মীক থেকে বের হয়ে গো-রক্ষা করেন। তাঁর মাথায়ও আঘাত লাগে। তিনি এক আশ্রমে যান ও আশ্রমিকা বকুলদেবীর সেবাযত্নে সুস্থ হন। পরে একদিন যখন তিনি শিকারে যাচ্ছিলেন, তখন পথে আকাশরাজার কন্যা পদ্মাবতী ও তাঁর সখীদের দেখতে পান। পদ্মাবতীর রূপে মুগ্ধ নারায়ণ তাঁকে বিবাহ করতে চান। বকুলদেবী মারফৎ বিবাহের প্রস্তাব রাজার কাছে পাঠানো হয়। দেবতাদের পরামর্শে এই বিবাহের প্রয়োজনীয় অর্থ শ্রীহরি কুবেরের নিকট ঋণস্বরূপ নেন। কিছুদিন পদ্মাবতী ও নারায়ণ অগস্ত মুনির আশ্রমে বাস করেন। আকাশরাজের মৃত্যুর পর তার পুত্র যেখানে বিষ্ণু বল্মীকের তলায় ছিলেন, সেখানে 'আনন্দ নিলয়' তৈরী করে দেন। শ্রীবিষ্ণু ওখানে কিছুদিন পদ্মাবতীর সঙ্গে আনন্দ করার পর কুবেরের ঋণের কথা ভাবেন। লক্ষ্মীছাড়া নারায়ণ তখন লক্ষ্মীর সন্ধানে ঘোরেন। তাঁকে কোথাও না পেয়ে, দেবলোক থেকে সহস্রদল পদ্ম আনবার জন্যে বায়ুদেবকে আদেশ করেন। তিনি ঐ পদ্ম, পদ্ম-সরোবরে স্থাপন করেন ও নিজে লক্ষ্মীর ধ্যান করতে থাকেন। মহালক্ষ্মী পদ্মাসনারূপে

আবির্ভূতা হন। সেই দিনটা ছিল 'কার্ত্তিকেয় পঞ্চমী'। এখনও ঐদিনে এই তিরুমালায় আড়ম্বরের সঙ্গে উৎসব পালন করা হয়।

ভৃগুমুনি লক্ষ্মীদেবীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি শান্ত ও প্রসন্ন হন। ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের প্রার্থনায় লক্ষ্মীনারায়ণ আনন্দনিকেতনে প্রবেশ করেন।

নারায়ণ লক্ষ্মীকে বলেন তুমি এই কলিযুগের শেষ পর্য্যন্ত এই তিরুমালা পর্ব্বতে থাকবে ও ভক্তদের স্বাস্থ্য, অর্থ, সুখ ও শান্তি দেবে। আমাকে তারা যেন কিছু অর্থ প্রণামীস্বরূপ দেয়। আমি সেই অর্থ কুবেরকে সুদ দিয়ে যাব বৎসরে বৎসরে। মহালক্ষ্মী সম্মত হলেন। আজও তিরুপতি মন্দিরে বৎসরে একদিন ঐ উৎসব পালিত হয়।

আমরাও এসেছি নারায়ণ মন্দিরে তাঁকে প্রণামী দিতে, তাঁকে দর্শন করতে। গাইড আমাদের জন্যে টিকিট কাটতে চলে গেছেন। এমন সময় মন্দিরের মধ্যে বাঁশী, শিঙা, কাড়া নাকাড়া বেজে উঠলো, বাদ্যযন্ত্রের ঐক্যতানে বাজছে দক্ষিণ ভারতীয় মাঙ্গলিক সুর, বিবাহের সুর। মন্দিরের মধ্যে হচ্ছে লক্ষ্মীনারায়ণের বিবাহ। শুনলাম, প্রতিদিন এই 'আনন্দ নিলয়ে' তাঁদের বিবাহ দেওয়া হয়। মন্দিরের সিংহদরজা দিয়ে তাকিয়ে থাকি উন্মুখ নয়নে। দেখি দেবদেবী পাল্কীতে প্রদক্ষিণ করছেন। দেখতে পাচ্ছি স্বর্ণ-নির্ম্মিত পাল্কী ও তার বাহকদের। আমার প্রাণে-মনে জাগছে এক অপূর্ব্ব আনন্দের শিহরণ। দর্শনের আর বিলম্ব নেই। বহুদিনের আশা পূর্ণ হতে চলেছে। দিনে নিলাম একটা পূজার ডালা। তাতে রয়েছে একটী নারিকেল, ফুল, ধূপ ও একটা কলা। গাইড টিকিট নিয়ে এলেন। না এখনও দেরী আছে। এখনও ভোগ দেওয়া হয়নি।

রূপার নক্সাকাটা পেটের তৈরী সিংহদরজা। মাথা কামানো টিকিধারী পূজারী ব্রাহ্মণেরা দরজার নিকট ঘোরা-ফেরা করছেন। ভিতরে হোমের জন্যে চলেছে বোঝা বোঝা কাঠের টুকরো। ঘড়া ঘড়া ঐ পবিত্র কুণ্ডের জল মাথায় করে নিয়ে চলেছে ব্রাহ্মণসন্তানরা। দর্শনার্থীর ভিড় ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। দরজার বাঁদিকের অনেকটা লম্বা জায়গা লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা, অবশ্য মাথায় ছাদ আছে। গরমে রোদে কষ্ট হবার কোনও ভয় নেই। ভিতরে আছে সিমেন্টের তৈরী বেঞ্চ, সারি সারি, মুখোমুখি। এই খাঁচার মধ্যে আছে দুটি ভাগ। বিনা টিকিটের দর্শনার্থী ও অর্থমূল্যে টিকিট ক্রয়ী দর্শনার্থী। আমরা আমাদের নিজ নিজ টিকিট হাতে নিয়ে ঐ খাঁচার মধ্যে ঢুকলাম। দেখি বিনা টিকিটের ঘরে প্রচুর দর্শনার্থী বসে আছেন। তাঁদের বেশীর ভাগেরই মাথা কামানো। দক্ষিণ দেশেরই ধর্ম্ম ভীরু মানুষ। এসেছে প্রণতি জানাতে জাগ্রত দেবতাকে।

খাঁচার ভিতরে বেশ ঠাণ্ড। বেঞ্চে বসে পড়লাম। তারকেশ্বরের শিবমন্দিরে শিবরাত্রি ও অন্যান্য উৎসবে বাঁশ দিয়ে ঘিরে স্ত্রী-পুরুষের আলাদা লাইন তৈরী করা হয়। বাঁশের তৈরী ঐ লাইন অস্থায়ী কিন্তু এই দক্ষিণের তিরু-পতির মন্দিরে স্থায়ী ব্যবস্থা। লোহার তৈরী বেড়া।

মনে মনে জপ করে চলেছি। কামনা অবশ্য কিছুই করিনি। শুধু হরিনাম। ওপাশের বেড়ার মধ্যেও নামের রোল জেগে উঠেছে। হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। এই নামের তরঙ্গে আমরা সবাই ভেসে চলেছি মন্দির প্রাঙ্গণে। দেবদরজা খুলে গেছে। দরজা পর্য্যন্ত দু'ভাগ। ভিতরে আমরা সকল দর্শনার্থী মিলে মিশে এক হয়ে গেলাম। সেখানে অর্থের বাধা নেই। একই লাইনে সবাই চলেছি দেবদর্শনে। পাইপে করে প্রচুর জল ঢালা হচ্ছে মন্দিরের চাতালে। উত্তপ্ত পাথরের রাস্তায় ও মন্দির চত্বরে চলাফেরা করায় পায়ের তলা জ্বালা করছে। এই শীতল-বারির স্পর্শে আমার চরণযুগল অনেকটা শীতল হ'ল।

এইবার সেই পরম-মুহূর্ত্ত এল। তিরুপতিনাথকে দর্শনের ক্ষণ। মন্দিরের ভিতর অন্ধকার। কালো কষ্টি পাথরের নারায়ণকে খুব বেশী বোঝা যায় না, কিন্তু তাঁর মাথার মণি-মুক্তাখচিত স্বর্ণতাজ অর্থাৎ মুকুট চোখকে ঝলসে দিল। মনে মনে ভাবছি কোথায় নারায়ণ, কোথায় নারায়ণ দেখতে পাচ্ছি না কেন? এমন সময় সেই শুভমুহূর্ত্তে দেখতে পেলাম—কালো অঙ্গে, শ্রীমুখের কপালে বৃহৎ সাদা 'তিলক'। তলায় আরো মূর্ত্তি রয়েছে কিন্তু আমি ঐ তিলক ও তাজের দিকেই চেয়ে রইলাম।

লাইনে ঠেলা পড়ল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে গেলাম। একজন পূজারী ব্রাহ্মণ, আমার মাথায় একটী রূপার মুকুট বা তাজ স্পর্শ করালেন ও অন্যজন হাতে দিলেন চরণামৃত। সেই সুগন্ধি পবিত্র চরণামৃত সেবনে ও স্পর্শে আমি ধন্য হলাম।

হাতের পূজার ডালি হাতেই ধরা রইল। পূজারীরা মাথা নাড়লেন। বাইরের দিকে হাত দেখালেন।

গাইড জানালেন প্রসাদ দেওয়া হচ্ছে। আমরা আবার লাইন করে এক জায়গায় দাঁড়ালাম ও পাতায় দেওয়া ভোগ নিলাম। সেই পায়সান্নের এক অপূর্ব স্বাদ। একজায়গায় দেখলাম অনেকে ভোগ খাচ্ছেন। পয়সার বিনিময়ে ভোগ কিনে খেতে হয়। সাইনবোর্ডে লেখা আছে কোন্ ভোগের কত দর। সারাদিনের উপবাসী আমরা, একটাকা করে অন্ন-ভোগ কিনে খেলাম। তিনটাকা করে একটা 'লাড্ডু' মহাপ্রসাদ হিসাবে কিনে ব্যাগে রাখলাম। এই লাড্ডু বিশুদ্ধ ঘি, বাদাম কিস্‌মিস্ দিয়ে তৈরী। বহু দিন রাখা যায়। সঙ্গের এক ভদ্রমহিলা, বেশ অনেকগুলি লাড্ডু কিনে ব্যাগে ভরলেন।

এবার দেখি একজায়গায় 'হুণ্ডিতে' টাকা-পয়সা দেবার ধুম পড়ে গেছে। প্রচণ্ড ভিড়। কোনওরকমে, ঠেলেঠুলে ঢুকে একটী টাকা ঐ বিরাট হুণ্ডির থলির মধ্যে পুরে দিলাম। দক্ষিণ ভারতে এই 'হুণ্ডি' প্রথম জানলাম বা দেখলাম। পরে সব মন্দিরেই এই-ব্যবস্থা দেখেছি। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে, মন্দিরের মধ্যে স্তূপাকার অর্থ দেখেছি। ময়দা-চালার চালুনীর মত বড় বড় চালুনীতে পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা, সিকি, আধুলি সব আলাদা আলাদা করে রাখা হচ্ছে দেখলাম। এই ভাবে অর্থ সংগ্রহ আর কোথাও দেখিনি। মন্দিরের বাইরে এলাম। অনেকের মুখে শুনে ও দেখে, বাণরে যে উঁচু উঁচু পিতলের পিলশুজ রয়েছে, সেখানে পূজার জন্যে কেনা নারিকেলটী ভেঙে ওখানে জল ঢেলে দিলাম। প্রসাদী নারিকেল ব্যাগে রাখলাম। আর কিনে নিলাম একঘটী পুণ্যতীর্থের পবিত্র বারি।

পায়ের অবস্থা ভয়ঙ্কর। ফোস্কা পড়ে গেছে পায়ের তলায়। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। একটী ঔষধের দোকান থেকে উনি ব্যাণ্ডেজ কিনে এনে দিলেন। ফোস্কায় লাগিয়ে চলতে আরম্ভ করলাম। গাইড মশাই ডাকাডাকি করছেন। জোরে চলতে পারছি না, ঘেমে উঠছি। অবশেষে বাসে এসে উঠলাম। ঘামে-ভেজা মুখকে পরিস্কার করবার জন্যে হাত ব্যাগটি খুলে দেখি, আমার ব্যাগের ভিতরের মণিব্যাগটি নেই। চুরি গেছে। তন্নতন্ন করে খুঁজেও পেলাম না। সযত্নে লুকানো আড়াইশো টাকা ও একগোছা চাবি তার মধ্যে ছিল। চাবির ডুপ্লিকেট আমার কল্যাণীর বাড়ীতে আছে জেনে, আমার স্বামী আমাকে সান্ত্বনা দিলেন। টাকার জন্যে মনখারাপ করতে বারণ করলেন।

বাস পাহাড় থেকে নীচে নামছে। আমি চুপচাপ বসে ভাবতে লাগলাম। তবে কি জাগ্রত ভগবান এত টাকা থাকা সত্ত্বেও, মাত্র একটাকা হুণ্ডিতে দেওয়ার জন্যে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন! সন্তানদের স্বাস্থ কামনায় অর্থ মানসিক না করার জন্যে কি তিনি নিজে থেকেই তা আদায় করে নিলেন! নাকি ভবিষ্যতের কোনও ভীষণ ক্ষতি দেখতে পেয়ে, দয়ালু ভগবান আমার এই সামান্য ক্ষতি ঘটিয়ে তা দূর করলেন! বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাই।

এরপর নানা জায়গায়, নানা মন্দিরে ঘুরেছি কিন্তু কখনও কোথাও কোনও ক্ষতি হয়নি। আজ সেই জাগ্রত তিরুপতি নারায়ণকে মনে মনে স্মরণ করে প্রণাম জানাই। 'নমঃ নারায়ণায় নম' ॥

মানসিক রোগ—জাতি, শিক্ষা ও স্ত্রী-পুরুষ ভেদে

সন্তোষকুমার দে

মানসিক ব্যাধি হল এক সাধারণ সংজ্ঞা। মানুষের বিচার; আবেগ; আচার, আচরণ; প্রক্ষোভ ও ব্যক্তিত্ব বিষয়ক সমগ্র ব্যবহারের যখনি কোণ গোলমাল দেখা দেয় তখনি তাকে মানসিক ব্যাধি বলা হয়। এই মানসিক ব্যাধি নানা ধরণের এবং এর পরিধি উৎকট উন্মত্ততা থেকে মৃদু ধরণের মনের রোগ (যাকে হাইলোম্যানিয়া বলা হয়) পর্যন্ত বিস্তৃত। হাইমোস্যানিয়া পর্যায়ের মানসিক ব্যাধি কমই দেখা যায়। এই সব রোগীর মনের গতি হয় অতি উত্তেজনা-পূর্ণ। সম্ভব অসম্ভব নানা রকমের চিন্তা দ্রুত গতিতে সাধারণ চিন্তার সঙ্গে মিশে গিয়ে সুস্থ চিন্তাশক্তিতে বাধা জন্মায়। রোগী চোখ মিট্‌মিট করে, হাসির কারণ না থাকলেও খিলখিল করে হাসতে থাকে। রোগীকে সব সময় ব্যস্তবাগীশ বলে মনে হয়। একটা কাজ সারতে না সারতে আর একটা কাজে হাত দেয়। ফলে কোনটাই শেষ করতে পারে না। শত শত কাজের অভিসন্ধি করবে আর শেষ পর্যন্ত কোনটাই না করে অসমাপ্ত অবস্থায় ছেড়ে দেবে।

মানসিক জীবনের এই সব গণ্ডগোল নানা কারণে হতে পারে। গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের মস্তিষ্কে কোন রকম আঘাত বা প্রসবের সময় শিশুর মস্তিষ্কে কোন ক্ষতি; স্নায়ু-তন্ত্রের কোন অনিষ্ট; থাইরইড গ্ল্যান্ডের উপযুক্ত নিঃসরণের অভাব (যাকে cretinism বলা হয়) প্রভৃতি নানা কারণে হতে পারে। মানসিক ব্যাধিকে মোটামুটি দুটি দলে ভাগ করা হয়ে থাকে ঃ—(১) যান্ত্রিক (অরগ্যানিক গ্রুপ) আর (২) কার্য বিষয়ক (ফাংশনাল গ্রুপ)। স্নায়ুতন্ত্রের অবক্ষয় বা আঘাত জনিত যে সব মানসিক রোগ সেগুলি সবই এই দলে পড়ে।

দ্বিতীয় দলটিকে আরও ছোট ছোট দলে ভাগ করা চলে যেমন উত্তেজনা, অবসাদ, স্বাভাবিক চিন্তা ও অনুভব করবার শক্তির অভাব ও বহির্জগতের সঙ্গে অর্থপূর্ণ সংযোগ রক্ষা করবার অক্ষমতা প্রভৃতি প্রক্ষোভগত গণ্ড-গোল।

ফাংশনাল গ্রুপের অন্তর্গত মানসিক ব্যাধিকে অনেকে আবার মাত্র দুটি দলে ভাগ করতে চান—(১) নিউরসিস (২) সাইকোসিস। অনেকে আবার বাস্তব কারণে এই বিভেদ মানতে রাজি নন।

বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করার অক্ষমতা সজ্ঞানেও হতে পারে। সজ্ঞানে হলে তাকে আবেগ জনিত (bsessional) কিংবা অরেগজনিত বাধ্যকরী অবস্থা (obsessional compulsive state) বলা হয়। আবার অজ্ঞাতসারেও হতে পারে যেমন হিষ্টিরিয়া। এ ছাড়া একটা তৃতীয় দলেরও কল্পনা করা চলে যেমন কিশোর বয়সের দোষত্রুটি, যাকে ইংরিজীতে ডিলিংকুইন্সি বলা হয়।

মানসিক ও প্রক্ষোভগত এই সব বিশৃঙ্খলা দেহগত (ফিজিওলজিক্যাল) অপেক্ষা মনোগতই (সাইকলজিক্যাল) বেশি। অবশ্য প্রক্ষোভগত অবস্থা স্থায়িত্বে ও তীব্রতায় প্রবল হলে শরীরগত কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষিত হয়; যেমন মুখ বেঁকে যায়, মুখ থেকে লালা ঝরতে থাকে, কণ্ঠস্বরের অস্পষ্টতা লক্ষ্য করা যায়, হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়, চোখের তারা বড় দেখায়, নাড়ির গতি দ্রুত হয়। এইজন্যে যে সব শিক্ষক কিশোর ও বালকদের শিক্ষা কাজে নিযুক্ত আছেন তাঁদের এই সব ব্যাধির সঙ্গে কিছু কিছু পরিচয় থাকা ভাল। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক এডলারের

মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, "শিক্ষক ও মনোচিকিৎসকেরনি নধ্যে বিড় সহযোগিতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। মনোচীকিৎসক যা জানেন শিক্ষকের তার প্রত্যেকটি জানা দরকার, যাতে কিশোরদের সমস্ত সমস্যা জানার পর আর কারও সাহায্য ছাড়াই তিনি তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে পারেন। যদি কোন অপ্রত্যাশিত সমস্যা এসে উপস্থিত হয়, তাহলে কি করা উচিত তিনিই ঠিক করবেন, ঠিক মনোচিকিৎসক উপস্থিত থাকলে তিনি যেমন করতেন।" (১)

এখানে আমরা সব রকম মানসিক ব্যাধির বিশেষত্ব নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি নে; সেটা মানসিক চিকিৎসকদের গণ্ডির মধ্যে পড়ে। আমাদের এখানে আলোচ্য বিষয় হল,—বয়স, জাতি, স্ত্রী-পুরুষ ভেদে ও সংস্কৃতি এবং সভ্যতার পটভূমি মানসিক ব্যাধির ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করে কি না সেইটা দেখা। কোন কোন মনচিকিৎসকের অভিমত এই রকম:—

তাঁরা বলেন, পুরুষ হতে নারী বিভিন্ন ভাবে গঠিত। [illegible] গ্রন্থির নিঃসরণ বিষয়ে ভিন্ন হওয়ায়, তাদের ভিন্ন ধরণের প্রক্ষোভজনিত চাপের সম্মুখীন হতে হয় এবং তার প্রতিক্রিয়াও হয় ভিন্ন ভাবে। যেমন বলা যেতে পারে গর্ভাবস্থায় এবং সন্তান প্রসবের সময় তাদের পুরুষ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করতে হয়। এর ফলে তাদের যে মানসিক ব্যাধি হতে পারে তা থেকে পুরুষ জাতি সম্পূর্ণ মুক্ত। তাই বলতে হচ্ছে যে—মানসিক ব্যাধিতে নারীদের ভুগতে হয় সেই শ্রেণীর মানসিক ব্যাধি পুরুষের হওয়া সম্ভব নয়, তাই তারা ঐ-জাতীয় মানসিক ব্যাধি হতে মুক্ত।

তারপর দেখা যায় বয়সভেদেও মানসিক ব্যাধি ভিন্ন রকমের হতে পারে। বয়স্ক লোকের যে সব মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা, বালক বা কিশোরদের সেই শ্রেণীর মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এটা যে যৌবনে শারীরিক ক্ষমতা বেশি থাকে আর গ্রন্থিক্ষরণ ভালভাবে হয় আর বার্ধক্যে তা স্তিমিত হয়ে আসে সেই জন্যেই নয়। বিভিন্ন বয়সে মানুষের আবেগ, উত্তেজনা, সমস্যা, জীবনের দায়-দায়িত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের হয়, তারই ফলে মানসিক রোগও যুবক ও বৃদ্ধের যে-শ্রেণীর হবে, কিশোর ও বালকদের সেই শ্রেণীর মানসিক ব্যাধি নিশ্চয়ই হবে না। টমাস মান তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রচনা সাংকেতিক উপন্যাসে যাদু-নাহারে (Der Za wbn berg) শিল্পকলার সঙ্গে মানসিক ব্যাধির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে গভীর ভাবে আলোচনা করেছেন।

অনেক সমাজ বিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানী আজকাল বলছেন, বিশেষ বিশেষ ধরণের মানসিক ব্যাধি বিশেষ বিশেষ জাতি এবং সভ্যতা ও কৃষ্টি বিষয়ক গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। Dr. B. F. Skinner-এর একটা মন্তব্য এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন মানুষের আচরণ দুটি উপাদানের ফলে নিয়ন্ত্রিত হয়। একটি হল জন্মসূত্রে প্রাপ্ত শক্তি আর একটি হল পরিবেশ। বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর মানসিক ব্যাধি অন্য জাতি বা ভিন্ন কৃষ্টি-গোষ্ঠীর লোকের হয় না। এ তত্ত্বের সত্যাসত্য নির্ণয় করা খুব কষ্টকর। এ বিষয়ে গবেষণা একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকাতেই করা সম্ভব; কেন না সেখানে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জাতি, উপজাতি এবং বিভিন্ন সভ্যতা ও কৃষ্টির ধারক ও বাহক বহু লোক বহুকাল ধরে এক সঙ্গে পাশাপাশি বাস করেও নিজ নিজ দেশ ও কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য সমান ভাবে বজায় রেখে আসছেন। আমেরিকায় এ-বিষয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধানের কাজ কিছুকাল ধরে চলেছে। এখন তাঁরা জানতে পেরেছেন যে, আমেরিকায় বসবাসকারী অন্যান্য সব জাতের চেয়ে আইরিসরা সুরাপানজানিত বায়ু রোগে (alcoholic psychosis) খুব বেশি ভোগেন। তাঁদের সংখ্যা অন্যান্য জাতির তুলনায় দ্বিগুণ বলা চলে; অপর দিকে উন্মাদের সংখ্যা তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে কম। সুরাপান-জনিত বায়ুরোগ আমেরিকায় বসবাসকারী ইহুদি জাতির মধ্যে নেই বললেই চলে; আর মানসিক অক্ষমতা বা দুর্বলতা তাঁদের মধ্যে খুব কম, কিন্তু নানাবিধ ঔষধ অপরিমিত ভাবে ব্যবহারের ফলে তাঁদের মধ্যে নানা রকম স্নায়বিক রোগ খুব প্রসার লাভ করেছে।

অত্যধিক সুরাপান ও ঔষধ সেবনে মানসিক বিশৃংখলা উপস্থিত হতে পারে সে কথা আবার কোন কোন চিকিৎসক স্বীকার করেন না। তবে বেশির ভাগ চিকিৎসক এটাকে সত্যি বলে মেনে নিয়েছেন। যে সব মনোচিকিৎসক হাসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাঁদের বেশির ভাগই বলেন, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মানসিক হাসপাতালে যে সব রোগী ভর্তি হত তাদের মধ্যে ১৫%—২৫% রোগীর মানসিক রোগ ছিল অত্যধিক মদ্যপান জনিত। তবে সেই সঙ্গে তাঁরা এ কথাও স্বীকার করেছেন যে, এইসব মানসিক রোগীর বেশির ভাগের মদ্যপানটা ছিল রোগের লক্ষণ (Symptom) কারণ (Cause) নয়। মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক (Dr. Lesli Moser Z) ও বলেন, "মাত্রাধিক মাদক দ্রব্য সেবনে মানসিক রোগে আক্রান্ত লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম; তবে একথা সত্যি যে অত্যধিক সুরাপানে মানসিক জীবন যে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাও একেবারে ফেলনা নয়। (২) Prof. Matt বলেন, মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত যে সব রোগী হাসপাতালে মারা গিয়েছিলেন, মৃত্যুর পর সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্যে তাঁদের মস্তিষ্ক ধৌত করে জানতে পারেন, ২০০০ রোগীর মধ্যে মাত্র ৬ জন মদ্যপান জনিত মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। আজকাল যে সব অনুসন্ধান চলছে তা থেকে জানা যায় ৫ শতাংশের কম লোক মদ্যপান জনিত মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন।

কৃষ্টি ও সভ্যতার সঙ্গে মনে হয়, মানসিক ব্যাধির বেশ খানিকটা সম্বন্ধ আছে। অনেক মনোবিজ্ঞানী বলেছেন, সব দেশের অসভ্য আদি অধিবাসীদের মধ্যে মানসিক রোগ দেখা যায় না যা খুবই কম দেখা যায়। নৃতত্ত্ববিদ্ Molinowski ট্রোবিয়াণ্ড দ্বীপের Trobiand অধিবাসীদের মধ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখতে পেয়েছেন, ঐ দ্বীপের আদি অধিবাসীরা কেউ উন্মাদ রোগে ভোগে না, ভুগলেও তাদের সংখ্যা অতি নগন্য। কিন্তু মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং (Jung) ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি উত্তর আমেরিকার এবং কেনিয়ার মাউণ্ট এলগনের সানুদেশে আদি অধিবাসীদের বিষয়ে এবং তারপর আমেরিকায় এবং মেক্সিকোতে পুবেলো ভারতীদের Pueblo (Indians) মধ্যে তাদের আচার-আচরণ ও মানসিক গতি প্রকৃতি বিষয়ে এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পান স্যালিনো-ভস্কির মন্তব্য ঠিক নয়। Emil Kracpetin নামে আর এক জন মনস্তাত্ত্বিকও এক সমীক্ষা চালান। তিনি ইয়ুং-এর বক্তব্য সমর্থন করেন। এঁরা দুজনে স্বাধীন ভাবে যে সমীক্ষা চালান তাতে তাঁরা জানতে পারেন যে, য়ুরোপ এবং পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা যেমন নানা রকম স্নায়বিক ও মানসিক রোগে ভুগে থাকেন, আদি অধিবাসীরাও ঠিক সেই রকম নানাবিধ স্নায়বিক রোগে ভুগে থাকে। তাঁরা বলেন, সভ্যতার সঙ্গে মানসিক রোগে কোন কার্য-কারণ সম্বন্ধ নেই।

ইয়ুং একজন বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক। তাঁর কথার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। তবু মনে হয়, এখানে তাঁর মন্তব্য নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা যায় না। কারণ আমাদের দেশে দেখা যায় কোল, ভিল, সাঁওতাল, ওঁরাও প্রভৃতি জাতি যারা পশু-পালন বা কৃষি জীবন যাপন করছে, শহুরে সভ্যতার সংস্পর্শে যারা আসেনি তাদের মধ্যে মানসিক রোগের কথা বড় একটা শোনা যায় না।

আমাদের মনে হয়, বর্তমান জটিল সভ্যতার আবর্তে পড়েই মানুষের স্নায়ুর ওপর চাপ অত্যন্ত বেড়ে গেছে। সহজ সরল গ্রাম্য জীবন যাপন করতে পারলে এইসব ব্যাধির হাত থেকে অনেকটা পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। তাই আবার বলছি, মানসিক বিশৃংখলা, বায়ুরোগ; স্নায়ুরোগ প্রভৃতি যাঁরা শহর থেকে দূরে, গ্রামে থেকে গ্রাম্য জীবন যাপন করেন তাঁদের মধ্যে এর প্রাদুর্ভাব কম। এ আশা মনে মনে পোষণ করলে খুব ভুল হবে না। গ্রামে মানুষ ক্ষেত খামারে কাজ করে, পশুচারণ করে, জন-মজুর খেটে জীবন যাপন করে। শহরের শ্রমজীবিদের মত স্ট্রাইক, লক-আউট প্রভৃতির ফলে কাজ ছুট হয়ে যাবার, বেকার হয়ে পড়বার ভয় খুব কমই থাকে; ফলে দুর্ভাবনা, চিন্তা তাদের মন ও মস্তিষ্ককে অকারণে আলোড়িত করে না। এছাড়া গ্রামে পারিবারিক বন্ধন অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হওয়ায়, সন্তানের সঙ্গে পিতামাতার এবং পিতামাতার সঙ্গে গ্রামের আত্মীয়-

স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে এক নিবিড় সংযোগ থাকায় জীবন চলে মন্দাক্রান্ত তালে। ফলে এই সব রোগের কথা কেউ বড় একটা শুনতে পায় না।

কিন্তু শহরের চিত্রটা হল সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে সমাজ বন্ধন ও পারিবারিক সম্পর্ক শিথিল। তৈল, তণ্ডুল, লবন, ইন্ধন চিন্তায় পিতামাতার মধ্যে খিটিমিটি লেগেই আছে। যেমন পিতামাতার মধ্যে তেমনি সন্তানের সঙ্গে পিতমাতারও সম্বন্ধ অনেক সময় খুব সুখের হয় না। শহর-সমাজে কেবলই দ্বেষ হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, খুনো-খুনি, রাহাজানি, ছিনতাই, মারপিট, পথ দুর্ঘটনা হল নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। তার ওপর আছে লাউডস্পীকার ও মাইক্রোফোনের ভয়াবহ মুখরতা। এ সব কি মানুষের স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি করে না? জনমানসের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য স্নায়বিক বিকারে বিপর্যস্ত হয় না? নিশ্চয়ই এরা মানুষের মনোজীবনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। তারা ভাবনা-চিন্তা, নৈরাশ্যকে বাড়িয়ে তোলে। এ সব দেখে শুনে মানুষ পাগলের মত হয়ে যায়।

এ ছাড়া আছে নৈরাশ্য, মনোভঙ্গ। শহরে যে যেকাজে আছে তাতে সে সন্তুষ্ট নয়; চায় আরও উন্নতি, আরও অর্থ। কিন্তু চাইলেই পাওয়া যায় না। মানুষ দিন রাত নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে থাকে। ফলে সব দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা সজ্ঞান মন থেকে নির্জ্ঞান মনে তলিয়ে যায়। সেখানে তারা যেন সব রকম মানসিক রোগে আত্ম-প্রকাশ করবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে। সমাজ জীবনেই হোক আর ব্যক্তিগত জীবনেই হোক নৈরাশ্য আর হতাশা মানুষের মনকে নিরানন্দ ও দুর্বিষহ করে তোলে এবং ধীরে ধীরে তা স্নায়বিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে মানসিক রোগে পরিণতি লাভ করে।

গত ৫০/৬০ বছর থেকে আমাদের দেশে মানসিক রোগীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। তবে এতে খুব ভয় পাবার কারণ নেই, কেন না আজকাল মানসিক চিকিৎসার ও অনেক উন্নতি হয়েছে। শহরে ভাল মনো-চিকিৎসকের অভাব নেই। ঠিক সময়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে এ রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হওয়া সম্ভব এবং রোগীও আবার পূর্বের মত সুস্থ জীবন ফিরে পাওয়া অসম্ভব নয়। আজকাল হাত-পা ভেঙ্গে গেলে তা যেমন সারানো সম্ভব, মানসিক রোগও সারানো তেমনি সম্ভব।

সব রকম মানসিক ব্যাধি ও স্নায়ু রোগের জন্যে এ দেশেও মনসমীক্ষাসম্মত চিকিৎসার প্রচলন হয়েছে; আর এই চিকিৎসাই হল সর্বোৎকৃষ্ট। এ ছাড়াও ভৌত চিকিৎসারও (ফিজিক্যাল ট্রিটমেণ্ট) বেশ চলন আছে। এই ভৌত চিকিৎসা, বিশেষ করে তিন রকমের বিশেষ ধরনের ভৌত চিকিৎসাকে যুগান্তকারী বলা চলে। এই তিন ধরণের চিকিৎসা হল:—

১) ইনসুলিন চিকিৎসা (২) Electroplexy বা Electroconvul ive Therapy (3) Operation of leucotomy on prefrontal Lobot my। Goltingen-এর Dr. Heinz Arnde যে সমস্ত রোগী মানসিক অস্থিরতায় ভুগছেন, কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে পারেন না, আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, অত্যন্ত বিমর্ষ ও অবসাদ গ্রস্ত তাদের Testosterona (এটা একটা মেল হরমন, দেহের ভেতরের অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস) ইনজেকসন করে আরাম করেছেন।—

Poul De kruij, The Male Hormone p-158 দ্রষ্টব্য, এই যুগান্তকারী ভৌত চিকিৎসা বিষয়ে এখানে আলোচনা করার অবকাশ নেই।

---

1. "We need the most intimate corperation between the prychiatrist and the teacher. The teacher must know anything the psychiatrist knows, so that after discussing the child's problem he can proceed on his own without further help. It any unespected problem turns up, he should understand what to do, just as the prychiatrist would is he were present."
—Adler; What Life should mean to you.
2. Certainly the number of those who subber severe mentals crisis under drugs is relatively few, but since the damage done is so horribly severe, we can not poss obblightly.
—Prof. Leslie E. Moser—The struggle for Human Dignity. pp 117.

বিজ্ঞান বিস্ময়

শ্রী কে, পি, পাত্র

শনিগ্রহের রহস্য ঃ

বিজ্ঞানের নানান ব্যাপারে আমাদের সবাইএরই আগ্রহ আছে। আমি এখন সবাইকে বিজ্ঞানের কিছু নতুন আবিষ্কারের কথা জানাচ্ছি।

মহাকাশ রহস্যের উদ্ঘাটনে গ্রহ-উপগ্রহে স্পেস্‌ক্রাপ্ট পাঠিয়ে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদল নানারকম গবেষণা চালাচ্ছেন।

চাঁদের অনেক রকম রহস্য জানা গেল। কিছুটা বোঝা গেল মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের পরিবেশ ও মাটির উপাদান। এখন শনিগ্রহের কিছু রহস্য জানতে পারা গেছে।

আমেরিকান স্পেস্‌ক্রাপ্ট পাইওনিয়ার-১১ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ শনিগ্রহের খুব কাছে পৌঁছে গেল। সেখানে রয়েছে শনিগ্রহের বলয়, পৃথিবী থেকে ১.৯মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে। সেখান থেকে কয়েকটা ফোটোগ্রাফ পাঠিয়ে দিল পৃথিবীতে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সমেত পাইওনিয়ার-১১ স্পেস্‌ক্রাপ্টের ওজন ২৬০ কে. জি., এটার গতি প্রতি ঘন্টায় ১,৭১,০০৭ কিলোমিটারের মত।

শনিগ্রহের রহস্য ব্যাপারে গবেষণারত বিভিন্ন বিজ্ঞানী-দের মধ্যে রয়েছেন কলোরাডো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মিঃ ল্যারী এস্‌পোসাইট, অরিজেনো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মিঃ থমাস্‌ গেহেরেলস্‌ ইত্যাদি।

শনিগ্রহের উত্তর মেরুটা দেখতে লালচে, কিন্তু বাকি অংশটা হলুদ আভার। এতদিন জানা ছিল শনিগ্রহের পাঁচটি বলয়, কিন্তু পইওনিয়ার-১১এর পাঠান ফোটোগ্রাফ থেকে জানা গেল আরও একটা সরু বলয় যার সঙ্গে রয়েছে একটা চাঁদ। ছটি বলয় সমন্বিত শনিগ্রহের চতুর্দিকে মোট চাঁদের সংখ্যা দাঁড়াল বারোটা। পাইওনিয়ার-১১এর পাঠান বিভিন্ন তত্ত্ব থেকে বিজ্ঞানীরা জানতে পারলেন শনিগ্রহের বলয়ে রয়েছে বরফের টুক্‌রো, বা কণা স্তূপ তার সঙ্গে রয়েছে আকাশের কোন উল্কা-ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি।

শনিগ্রহের বাইরের চাঁদটার নাম দেওয়া হ'ল 'ইমপেটাস' যার ফোটোগ্রাফ ৩০শে আগষ্ট, ১৯৭৯ পাইওনিয়ার-১১ থেকে পৃথিবীতে পৌঁছেছে।

শনিগ্রহ থেকে বার লক্ষ কুড়ি হাজার কিলোমিটার দূরে রয়েছে শনিগ্রহের সবচেয়ে বড় চাঁদ ধেটার নাম হল 'টাইটান'। টাইটান উপগ্রহের ব্যাস ৫,৫০০ কিলোমিটার। পাইওনিয়ার-১১ থেকে ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ তারিখে চাঁদের পাঁচটা ফটো পৃথিবীতে পৌঁছেছে তার থেকে টাইনানে কোন জীবের বা জীবনের অস্তিত্ব পওয়া যাচ্ছে না; সেখানে কিন্তু বায়ুমণ্ডলের চাপ অনেকটা পৃথিবীরই মত। চাঁদে বা মঙ্গলেও এখন কোন জীবনের অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি।

টাইটানে রয়েছে সিথেন গ্যাস, এর থেকে হয়ত কোন অর্গানো অণু সৃষ্টি হতে পারে যার থেকে বিজ্ঞানীদের অনুমান টাইটান উপগ্রহে জীবনের স্পন্দন ঘটতে পারে।

এ ব্যাপারে আরও বিস্তৃত গবেষণার জন্য ১৯৮১ সালের মধ্যে দুটো স্পেসক্রাপ্ট ভয়েজার-১ এবং ভয়েজার-২ টাইটানে পাঠান হবে বলে আমেরিকান বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

শনির সবচেয়ে বড় টাইটান উপগ্রহে হয়ত কোন জীবনের অস্তিত্ব পাওয়া যেতে পারে।

পরমাণু রহস্য উদ্ঘাটনে 'লিওন-কণার' আবিষ্কার—

পরমাণু রহস্যের উদ্ঘাটনে আন্তর্জাতিক এক বিজ্ঞানী দল লিওন কণার আবিষ্করে সফলতা অর্জন করলেন।

মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ হল পরমাণু। পরমাণু সমবায়ে অণু আর বিভিন্ন পরমাণু সমবায়ে গঠিত হয় যৌগিক পদার্থের অণু। পরমাণুর কেন্দ্র নিউক্লিয়াসে আছে প্রোটন ও নিউট্রন কণা যাদের ভর ১·৬৭—১০-২৪ গ্রাম। প্রোটন ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত কিন্তু নিউট্রন কণার কোন তড়িৎ আধান নেই। এই কণাগুলিকে বিজ্ঞানে 'হ্যাড্রন' বলে অভিহিত করা হয়েছে। পরমাণু নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে বৃত্তাকার ও উপবৃত্তাকার বিভিন্ন কক্ষপথে রয়েছে ঘূর্ণমান ইলেকট্রন।

হ্যাড্রন কণাগুলি আবার আরও ছোট কণা সমবায়ে গঠিত বলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করলেন, তাঁরা কল্পনা করলেন কোয়ার্ক কণার, গবেষণা চালাতে লাগলেন। লিওন কণার আবিষ্কারে এখন তার বাস্তব রূপায়ন সম্ভব হল। এই আবিষ্কারে বিজ্ঞানে চতুর্বলের 'ইউনিফিকেশন থিয়োরী' আরও সুদৃঢ় হল। বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন জীবনের শেষভাগে এইসব তত্ত্বের উপর গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন।

জীবন্ত আলো—

বিভিন্ন জীবের ইন্দ্রিয় বা অঙ্গ থেকে নানারঙের আলোর ঝলকানি, বিকিরণ বা প্রভা দেখা যায়। আগুনের আলো বা বৈদ্যুতিক আলোতে বেশ কিছুটা তাপের সৃষ্টি হয়; কিন্তু জৈব-প্রভা বা জীবন্ত আলো হল ঠাণ্ডা আলো। এতে তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় ·০০১ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড।

জোনাকী জাতীয় জীবের প্রভা-নির্গমন ইন্দ্রিয়টি ব অঙ্গটি দুটি কোষ সম্বম্বিত স্তরে গঠিত, একটি আলো সৃষ্টির আর অপর অন্তঃস্তরটিতে রয়েছে নিউরিন বেসের সূক্ষ্মকণা সম্ভবতঃ ইউরেট। মাছ জাতীয় জীবের আলোক বিকিরক ইন্দ্রিয় বা অঙ্গটি চোখের নীচে, সেখানে নলাকার স্তরে ব্যাক্টেরিয়া পূর্ণ কোষগুলি সজ্জিত আছে। আলো বিকিরক স্বপ্রভ ইন্দ্রিয় ছাড়াও 'সিম্বায়োটিক' ব্যাক্টেরিয়া ইন্দ্রিয়ে বা অঙ্গে আলো সৃষ্টি করতে পারে।

জৈব-প্রভার রহস্য উদ্ঘাটনে আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মি. ই এন. হারভে এবং জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের মি. ডব্লিউ. ডি, ম্যাকেনরয়, মিঃ এইচ্ এইচ্ সোলসার প্রমুখ বিজ্ঞানীরা নানারকম গবেষণা থেকে জানতে পারলেন এক বিশেষ জৈব জারণের ফলে যে রাসায়নিক শক্তি উদ্ভূত হয় তাহাই বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের (৪০০০—৭২৫০ আঙ্গষ্ট্রম) আলো বিকিরণ করতে থাকে।

লুসিফেরেস্ এনজাইমের উপস্থিতিতে লুসিফেরিন জৈব-পদার্থের রাসায়নিক জারণ বিক্রিয়ায় নির্গত শক্তি থেকে আলোর সৃষ্টি হতে থাকে। আলো সৃষ্টিকারী জৈব পদার্থ লুসিফেরিন বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম রাসায়নিক গঠনের হয়, ফলে নির্গত আলোর রশ্মি বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের (৪০০০—৭২৫০ আংষ্ট্রম) বিভিন্ন রঙের হয়। লুসিফেরিণের রাসায়নিক জারণে উদ্ভূত শক্তি থেকে আলট্রা-ভায়োলেট বা অতি বেগুনী রশ্মি (১০০০-২০০০ আঙ্গষ্ট্রম) পাওয়া যায় না। কোন ইনফ্রারেড (১০৪—১০৬ আঙ্গষ্ট্রম) কিংবা তাপ তরঙ্গও (১০৬—১০৮ আঙ্গষ্ট্রম) বিকীরণ হয় না। এতে কোন তাপ সৃষ্টি হতে পারে না তাই জৈব-প্রভা বা জীবন্ত-আলো ঠাণ্ডা হয়।

কতটুকু জানি

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

(২)

অম্বিকা, রাধিকা, কালিকা তিন ভাই। সর্ব-জ্যেষ্ঠ কালিকাচরণ চক্রবর্তী ইংরেজির এম, এ। সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করেন। সরকারী কোয়ার্টারে থাকেন। প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে বিপত্নীক হয়েছেন। তারপর আর বিয়ে করেননি। মেজ রাধিকা চরণ চক্রবর্ত্তী এম, এস,সিতে ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট। একটা ক্যালিকাল কোম্পানীতে ভাল চাকুরী করেন। তাঁর স্ত্রী সুপ্রভা সুন্দরী,স্বাস্থ্যবতী, নিঃসন্তানা আধুনিকা। কালিকাচরণের ফ্ল্যাটেই তাঁরা থাকেন। নইলে বিপত্নীক ভাসুরকে দেখবে কে? অম্বিকার খেলা-ধুলোয় মতি ছিল বেশী, তাই লেখাপড়া বেশী করেন নি। কোনও রকমে দারোগার চাকুরীটা জোগাড় করেছেন —কিন্তু কাজ করে যাচ্ছেন রাজার হালে। তিন ভায়ের চেহারা তিন রকম। কালিকার শরীরের গঠন মাঝারি, কিন্তু আহারে অত্যধিক রুচি বশতঃ উচ্চ রক্তচাপের সম্ভাবনায় ভুগছেন। দ্বিতীয় রাধিকা শীর্ণদেহ, গৌর বর্ণ, রোগে ভুগেন মাসে পনর দিন। সর্বদা রোগের ভয়ে সন্ত্রস্ত। স্বাস্থ্যে স্বভাবে, ও রুচিতে তাঁর স্ত্রী সুপ্রভার তিনি ঠিক বিপরীত। কনিষ্ঠ অম্বিকা স্বাস্থ্যে-স্বভাবে ঠিক দারোগা। তাঁর সঙ্গে অপর দুই ভায়ের কোন তুলনা চলে না। বড় দুই ভায়ের প্রতি খুব ভক্তি থাকা সত্ত্বেও শৈলজা আর সুপ্রভার মধ্যে ঘোরতর কলহ বেধে যায় বলে তিনি পুলিশ কোয়ার্টারে ভিন্ন ভাবেই থাকেন। তবে প্রায়ই দাদা দুজনের খবর নিতে যান। আর মেজ বৌদি সুপ্রভার আদেশ-নির্দেশ পালন করে আসেন।

মেজ বৌদি সুপ্রভার এখন বড় কাজ অম্বিকাচরণের তিন কন্যার জন্যে পাত্র দেখা। মাঝে মাঝে একটি দুটি ছেলে তিনি নিয়ে আসেন মালবিকা, মাধবিকা,ও বাসবিকা— এ-তিনজনের মধ্যে কারোর সঙ্গে যদি তাদের ভাব হয়ে যায়। এ-কাজের ভার তাঁর উপর ন্যস্ত করেছেন দারোগাবাবু। চোর-ডাকাত-এর উপর তাঁর নজর দিবারাত্র। কখন তিনি যাবেন পাত্র খুঁজতে! আমি এ-বাড়ীতে থাকা কালে সুপ্রভা দেবী প্রথম যেদিন এলেন সেই দিনই আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। আমার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সব সংবাদ তিনি নিয়েছেন দারোগাবাবুর কাছ থেকে—। তারপর যে দিন তাঁদের চাকরানী নিত্যর মাকে তার স্বামী এসে নিয়ে গেল আসামে, তিনি হাজির হলেন অম্বিকাবাবুর কাছে। আমাকে একবার নিজের চোখে দেখে নিলেন, তারপর পাঁচটি টাকা দিয়ে বললেন, 'যা মিষ্টি কিনে নিয়ে আয়।' এ বাড়ীতে এলেই তিনি দেবর, জা, ও ছেলে-মেয়েদের মিষ্টি কিনে খাইয়ে যান। সকল আদর-আপ্যায়ন শেষ হলে আমি যখন অন্য কাজ করছি তখন দেবর অম্বিকাকে ধরে বসলেন, ঠাকুরপো তোমার এ চাকরিটিকে আমার চাই কিছু দিনের জন্যে।'

'কেন, বৌদি? তোমার নিতার মার কি হলো?'

'ও তার স্বামী এসে নিয়ে গেছে। এবার সে আসামে চলে যাবে।'

দারোগাবাবু কথা বলবার আগেই মৃদু আপত্তি তুললেন শৈলজা দেবী—'যাদু চলে গেলে এত বড় সংসার আমি কি করে চালাব, দিদি। তাছাড়া যাদু কি তোমার বাড়ীর কাজ-কর্ম পারবে—একেবারে আনাড়ী-জংলী।

রাস্তায় ভিক্ষে করত, উনি তুলে নিয়ে এসেছেন রাস্তা থেকে।'

'না শৈলজা, তোর ঘরে লোক আছে। একা মালবিকা বা মাধবিকাই সংসার চালাতে পারে। বাজারের ফরমাস তুই দু-একটা দিবি। তা ঠাকুরপো করে দেবেখন।'

"সেই জন্যেই তো বলেছিলুম, দুটি মেয়েকে পুষ্যি নিয়ে নাও।"

'আবার সেই বাজে কথা?' বলে ধমক দিলেন দারোগাবাবু।

"তা হলে যাদুকে তোমরা দিচ্ছ আমার সঙ্গে?"

'তা তুমি নিয়ে যাও বৌদি—তোমার যখন ইচ্ছা হয়েছে।" দারোগাবাবু তাঁর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন। শৈলজাদেবী দারোগাবাবুর কথায় প্রতিবাদ জানাতে পারলেন না।

(৩)

সুপ্রভাদেবীর সংসারে এসে বড় চমৎকার লাগল। বড় ভাল লাগল আমার। শৈলজাদেবীর সংসার থেকে এ সংসার বেশ কয়েক ধাপ উঁচু। দু-ভায়ের রোজগার আসছে। খরচ করবার লোক মাত্র একজন—সুপ্রভাদেবী। তাঁর যা চালচলন তা শিখতে শৈলজাদেবীর অনেক দিন লাগবে। সুপ্রভাদেবী সুন্দরী, আধুনিকা, শিক্ষিতা, নিঃসন্তানা। তাঁর বন্ধু-বান্ধবীর আর যেন অন্ত নেই। বাড়ীতে এসেই তাঁকে যে ভাবে টেলিফোনে ছুটে যেতে হ'ল তা' থেকেই তা' বুঝতে পারলুম। টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে এসে আমার সামনে স্মিত হাস্যে দাঁড়ালেন, প্রশ্ন করলেন,—'শৈলজাকে তুমি কি বলে ডাকতে?'

'গিন্নী মা।'

'বলো কি হে, গিন্নী মা? এখানে এসব চলবে না। মেমসাহেব বলবে। বুঝলে। ভাসুর মশাইকে বলবে বড় সাহেব, কর্তাকে মেজ সাহেব। আর তোমার আগেকার মনিব যখন আসবেন তাঁকে ছোটবাবু বলবে, বা দারোগাবাবুও বলতে পার। তিনি এ সব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামান না। বুঝলে?'

আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম 'বুঝেছি'।

সুপ্রভাদেবীর মেজাজ খুব ভাল। সারাদিন বন্ধু-বান্ধবীদের যোগাযোগের অন্ত নেই! কেউ না কেউ কোথা থেকে অনবরত টেলিফোন করে যাচ্ছে। তিনি একা সব টেলিফোনের জবাব দিচ্ছেন। সব সময়ে হেসে জবাব দিচ্ছেন। সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার আমার খুব ভাল লাগল। তিনি আমায় টেলিফোন ধরা শেখালেন। ধরে বলতে হবে—হ্যালো, তারপর জিজ্ঞেস করবে কাকে চাইছেন, কত নম্বর চাইছেন? তারপর বড় সাহেব, মেজ সাহেব কাকে ডাকছেন বুঝে নেবে। যাঁর কল তাঁকে ডেকে দেবে। আমার কলই খুব বেশী পারে। তখন আমায় ডেকে দেবে? বুঝলে?'

সুপ্রভাদেবী রান্না করেন নিজে। অর্থাৎ সেটা নামমাত্র নিজে। আমাকে সব করতে হয়; তিনি মাঝে মাঝে রান্না ঘরে গিয়ে ওটাতে এটা দাও। এই কর সেই কর বলে যান। আমি তা' মনোযোগের সঙ্গে করে যাই। তিনি কাজ দেখে খুশীই হচ্ছেন মনে হলো।

সেদিন বিকালে সুপ্রভাদেবী তিনটি জোয়ান ছেলেকে নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁর বসার ঘর সাজানো হলো, শোবার ঘর সাজানো হল। অনেক ভালো ভালো মিঠাই কেনা হল। দারোগাবাবুর তিন মেয়েকে খবর দিয়ে আনানো হল। মালবিকা, মাধবিকা, বাসবিকা, তিনজনই অনেক কাজ করল। সুপ্রভাদেবী তিনজনকে ভাল করে সাজালেন—নিজের শাড়ী গয়না দিয়ে। সেই সাজে যেন তিনজনকে পরীর মত দেখতে লাগল। ওরা যে এত সুন্দর দারোগাবাবুর বাসায় বসে যেন তা বুঝে উঠতে পারিনি। বিকাল চারটে না বাজতেই একে একে তিন জন যুবক এসে হাজির হলো। এদের সাজ-পোষাকেরও বাহার কম নয়। এরা যেন দেশী রঙ করা বিলেত বা আমেরিকার সাহেব। তিনজনেই পাইপ টানছে। সুপ্রভাদেবীর সামনেও। ওরা আসতেই সুপ্রভাদেবী মালবিকা, মাধবিকা ও বাসবিকার সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন—

ইনি হচ্ছে রায় সাহেব রতন রায়ের নাতি সমীর রায়, আই, এ, এস, কেণ্ডিডেট।—

ইনি সতীশ বাঁড়ুজ্জের বড় ছেলে রতীশ বাঁড়ুজ্জে, বড় বিজনেস মেগনেট।—

ইনি কাশীমবাজার ষ্টেটের মেজ কুমারের মেজ ছেলে শ্যামনারায়ণ চৌধুরী।

আর এরা হচ্ছে আমার দেবরের মেয়ে মালবিকা, মাধবিকা, বাসবিকা।

প্রথমে ওরা সকলে সবার সঙ্গে আলাপ করলো। তারপর তিন বোন পর পর এক একখানা গান করে গেল। গানের শেষে সুপ্রভাদেবী তিনজনকে তিন বোনের সঙ্গে জোড় পাতিয়ে দিলেন। সেই মুহূর্তে আমাকে তিনি একটা জরুরী কাজের জন্য বাড়ীর বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। জোড় পাতিয়ে দেবার পরেরকার ঘটনা আমি আর বলতে পারি না।

যখন ফিরে এলুম আমার কাজ সেরে, মেমসাহেব মালবিকা আর মাধবিকাকে দিয়ে সর্বাঙ্গ ম্যাসেজ করাচ্ছেন শুয়ে শুয়ে। তিনি খাটে উপুড় হয়ে বুকের নীচে একটা বালিশ রেখে শুয়ে আছেন। বাসবিকা একটু দূরে টেবিলে বসে বই পড়ছে বিরস বদনে। সুপ্রভাদেবীর মুখটা একটু ক্লান্ত। একটু যেন নিরাশার ছায়া তাতে মিশে আছে। তবু তার ওষ্ঠের কোণে মৃদু হাসিটি লেগে আছে। আমি আসার পর তিনি যেন কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন মনে হল। মনে হলো, তিনি তিনজনকেই মায়াজাল ভাল ভাবে বিস্তার করতে পারে নি বলে মৃদু ভৎর্সনা করছিলেন। আমি হঠাৎ এসে পৌঁছতেই সুর পাল্টে তিনি বললেন—'তোদের মাকে তাই আমি কত বলি মেয়ে তিনটি আমার কাছে থাকুক। তোরা এসেছিস তাই ঘরটা ভরে উঠেছে। আমার এমন যত্ন করে একজন আমার পা টিপে দিচ্ছিস। আর একজন কোমর টিপছিস। এমন সেবা আমার কে করবে বল। আজ আমার যা কোমর ব্যথা হয়েছে তাতে তোরা না এলে যাদুকেই মালিশের কাজে লাগাতে হত। সে কি তোদের মত এমন ভাবে পারত? শত হোক পুরুষ মানুষ তো। তারপর এসেছে এখানে নতুন। এখনও লজ্জা-সরম ভাঙে নি।' বলেই তিনি আমার দিকে স্মিত হাস্যে তাকালেন। আমি লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিলুম। বুঝলুম এ-সব কাজেও আমার উপর আদেশ জারী করা হবে ধীরে ধীরে। এ হল শুধু তার মুখবন্ধ মাত্র।

পরের দিন আমাকে মালবিকাদের বাড়ী পৌঁছে দিতে যেতে হল। গিন্নীমা আমার খবর জানতে চাইলেন। কি রকম কাজ করতে হচ্ছে।' মেমসাহেবের মর্জি মাফিক চলতে পারছি কিনা, ইত্যাদি। ছেলে-মেয়েরা একটু দূরে সরে যেতেই আগ্রহভরা সুরে জিজ্ঞেস করলেন—কি রকম দেখলে ছেলেদের? ওদের সঙ্গে মালু, মাধু বাসু ওরা আলাপ করলে?

আমি সবিনয়ে জানালুম, ঐ সময়টাতে তো আমি বাড়ী ছিলুম না—আমাকে বাজারে যেতে হয়েছিল কাজে। আমি কোন সংবাদ দিতে পারলুম না বলে বড় নিরাশ হলেন তিনি। এমন সময় বাসু এসে পড়ল আমাদের মাঝখানে। গিন্নীমাকে জিজ্ঞেস করলেন—'কি কথা হচ্ছে মা, যাদুর সঙ্গে?

বলছি, তোরা নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেদের সঙ্গে আলাপ করলি?'

'আলাপ আমরা করব কি? জেঠাইমাই তো সমস্ত সময় ওদের নিয়ে ব্যস্ত। ওদের সঙ্গে কথা বলছেন, খিল খিল করে হাসছেন। আমাদের ডেকে গান করতে বললেন মেজ জেঠাইমাও আমরা তিনজনে তিনটে গান করলুম। তারপর তাঁদের তিন জনের সঙ্গে বসে তাস খেললেন জেঠী। আমরা তাদের চা করে খাওয়ালুম। ড্রয়িং রুমে জেঠাইমার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ওরা একের পর এক চলে গেলেন। আমরা দোতলার বড় জেঠুর পড়ার ঘর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। তারপর সবাই চলে গেলে পদ্ম বড়দি মেজদি জেঠাইমার পদসেবা করতে বসে গেল।

'আর তুই?' প্রশ্ন করলেন গিন্নীমা।

'আমার ও সব ভালো লাগে না। আমি বসে বসে একটা বই পড়লুম।

'গল্পের বই বুঝি?'

হ্যাঁ—না—খুব ভাল বই।

কি করে বুঝলে ?

তা না হলে বড় জেঠু কিনে এনে এমন উপহার দিয়েছেন ? আণ্টিকে আণ্টি না বললে জেঠাইমা রেগে যান।'

'দেখ মেয়ের পাগলামি !' বলে এক ধমক দিলেন গিন্নীমা। ধমক খেয়ে ছুটে পালিয়ে গেল বাসবিকা।

কিছু দিনের মধ্যেই আমি বুঝতে পারলুম, আমার মালিকত্রয় অর্থাৎ কালিকা, রাধিকা ও সুপ্রভাদেবীর মধ্যে সম্পর্কটা যেন কেমন। আমি সেদিন রাতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসে বসে মেমসাহেবের পা টিপতে টিপতে গল্প শুনলাম। অনেক পরিবারের গল্পই তিনি বলে গেলেন খুব যত্ন সহকারে রেখে ঢেকে। কিন্তু তার মধ্য থেকেই আমার মনের কাছে ধরা পড়ল সুপ্রভা-দেবীর মনের কোমল গভীরের রূপ। দেখলুম সেখানে যেন অর্জুনের জন্য আগ্রহান্বিত দ্রৌপদীর মনের মত ভাসুরের প্রতি সহানুভূতিতে সিক্ত সুপ্রভাদেবীর মন। দৌপদীর কথা কেন আমার মনে পড়ল, তার কারণ আমি পরে বুঝেছি। সুপ্রভা দেবী আমায় বোঝালেন, ভদ্রলোকের মত এমন দুর্ভাগা আর কে আছেন ? যৌবন শেষ হতে না হতেই স্ত্রী মারা গেলেন। দিদি মারা যেতেই ভাসুর মশাইর কি কান্না। আমি তার ছোট ভাই-এর স্ত্রী, আমিই তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে, স্নেহ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখি।'

এমন সময় সেখানে একটু যেন পানাতিশয্যে বিহ্বল ভাবে এসে হাজির হলেন অধ্যাপক কালিকাচরণ চক্রবর্তী। তিনি আসতেই আমি সুপ্রভা দেবীর পদপ্রান্ত থেকে সরে এলুম। কালিকাবাবু ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পড়লেন। সুপ্রভাদেবীর ইঙ্গিতে আমি সে ঘর থেকে চলে এলুম। তিনি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে আসার আগেই শয্যা ছেড়ে কালিকাবাবুর কাছে এগিয়ে গেলেন। কালিকা বাবু তখন চক্ষু মুদে রয়েছেন। আমি এক পলক পেছনে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই, শুনলাম দরজা ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

পাশের ঘরে বিছানায় শুয়ে ছিলেন রাধিকাবাবু। দেয়ালে তাকিয়ে যেন তিনি ভাবছিলেন। গভীর ভাবে ভাবছিলেন, বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে ভাবছিলেন। আমি তার পায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে 'চা করে দেব সাহেব ?' বলতেই যেন একটা ঝটকা খেয়ে জ্ঞানলোকে ফিরে এলেন। চক্ষু মেলে এক দৃষ্টে তাকালেন আমার দিকে, বললেন 'চা ?' আচ্ছা দে, কিন্তু তার আগে আমায় বল,—আমি কে ? তুই কে ? সুপ্রভা কে ? কালিকা কে ? অম্বিকা কে ?—বল।

তাঁরা আবার কে হবেন সাহেব, তাঁরা তাঁরাই। তারপর একটু ভেবে বললুম আপনি আমার মনিব, কালিকাবাবু আপনার দাদা, মেমসাহেব আপনার স্ত্রী, অম্বিকাবাবু আপনার ছোটভাই, তাঁর স্ত্রী আপনার বৌমা, তাঁর ছেলে-মেয়ে আপনার ভাইপো, ভাইঝি।'

'দূর গাধা' বলে আমায় তিনি ধমক দিলেন হেসে। 'যা চা নিয়ে আয়।'

আমি চা করে নিয়ে এলুম পটে করে, তাতে চার কাপ চা ধরে। রাধিকাবাবুকে কাপে চা ঢেলে দিতেই তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, 'যাদু রাগ করেছিস নাকি, গাধা বললুম বলে ? তুই এমন জবাব দিলি আমার মুডটা নষ্ট হয়ে গেল। আমি ভাবছিলুম একটা গভীর আধ্যাত্মিক প্রশ্নের কথা—আমি কে ? আর তুই কিনা হাবার মত বললি—আপনি আমার মনিব' ওসব বাজে কথা বলে আমার সব চিন্তা মাটি করে দিলি !

'আমি কি অত সব তত্ত্ব কথা বুঝি ?'

কিন্তু আমার মনে হয় তুই বুঝিস। মনে হয়, তুই আরও কঠিন কঠিন কথা মাঝে মাঝে ভাবিস। মনে হয় তুই সব বুঝে-শুঝে ভূত হয়ে বসে আছিস।

'না সায়েব, আমি অত বুঝতে পারলে এ-বাসার চাকর হতে যাব কেন ?'

'কিন্তু চাকর কে নয় বল ?

'ঐটাই হচ্ছে একটা মস্ত বড় সান্ত্বনা।'

ততক্ষণে সুপ্রভা দেবীর ডাক এলো কানে—'যাদু।'

'যাই, মেমসাহেব' বলে রাধিকাবাবুকে ফেলে ছুটে চললুম সুপ্রভাদেবীর ঘরে।

কালিকাবাবু শ্রান্তভাবে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আগে যেমন শুয়েছিলেন—তেমনি শুয়ে আছেন। সুপ্রভা দেবী

খাটে বসে আছেন তার দিকে তাকিয়ে। আমি সেখানে যেতেই তিনি আদেশ করলেন 'সাহেবের জন্যে চা নিয়ে এসো।'

আমি আগেই জানতুম, কালিকাবাবু সুপ্রভা দেবীর ঘরে যেদিন এক ভাবে বসে থাকেন, সেদিনই কিছুক্ষণ বাদে চায়ের আদেশ আসে। তাই রাধিকাবাবু যখন এক কাপ চা চেয়ে ছিলেন, তখনই ওদের জন্যে আমি চা তৈরী করে রেখেছিলুম। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে গেলুম ট্রে-তে করে দু-কাপ চা। সুপ্রভাদেবী এত তাড়াতাড়ি চা পেয়ে খুশী হলেন, অবাক হলেন। 'কিরে, এত তাড়াতাড়ি চা আনলি কি করে?

'তৈরী করে রেখেছিলুম, জানতুম আপনি বলবেন।'

'ও, তাই।' বলে একটু স্মিত হাসলেন সুপ্রভা। বড় সায়েবের মুখেও একটা স্নিগ্ধ হাসি দেখা গেল। চা পানের সময়ও তা পরিস্ফুট ছিল। আমি তা লক্ষ্য করলুম, 'বাদুটার বেশ বুদ্ধি আছে।' লেখাপড়া জানলে বড় চাকুরী করতে পারত।' মন্তব্য করলেন। তিনি। প্রশংসায় উল্লসিত হয়ে আমি সেখান থেকে চলে এলুম।

ঘরের বাইরে আসতেই মেমসাহেবের ডাক শুনতে পেলুম। তিনি খুব কোমল স্বরে ডাকছেন—বাদু! আমি নিঃশব্দে তার কাছে গিয়ে হাজির হলুম।

'বলত বাদু, জগতটা কি?

'মায়া,' ঝট করে বলে ফেললুম। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে যে তুলসীদাস পড়ে শুনায় পণ্ডিতজী তাকে জলের মত তরল করে কতবার বুঝাতে শুনেছি 'জগৎ মায়া—আর কিছু নয়।

মেজসাহেব ভাবতে লাগলেন। আমি কাজে চলে গেলুম, আবার তাঁর মিঠে ডাক শুনে ফিরে এলুম। তিনি প্রশ্নোত্তর শেষ না হতে চলে যাওয়ায় রুষ্ট হয়েছেন। সরোষে প্রশ্ন করলেন - মায়া মানে মিথ্যা? জগৎ মিথ্যা।

'মিথ্যে কেন হবে সায়েব? মায়া সত্যও নয়, মিথ্যেও নয়—মায়া।'

মেজসাহেব যেন একটু খুশি হলেন বলে মনে হলো। আবার প্রশ্ন করলেন মনের খুশিটাকে চাপা দিয়ে, 'বলতো তা হলে একটি গাছে দুটি পাখী একটি ফল খায়, আর একটি কি করে?

'আর একটি দেখে।' বিদ্রূপের সুর জবাব দিলুম আমি।

'বাঃ বাঃ' বাদু আমার সব জানে।

"কিন্তু আর একটি পাখী এত বেরসিক কেন? সে শুধু দেখে কেন? সে তো ইচ্ছে করলেই খেতে পারে। কেন সে খায় না, কেন তার ভোগের ফল অন্যে খায়? আর সে শুধু দেখে? উৎসাহ পেয়ে প্রশ্ন করলুম আমি।

"সেইটেই তো সমস্যা যাদু; বলতে পারিস এর সমাধান কি? সমাধান? আমার তো মনে হয় যার ফল সে খাবে সেই সমাধান—অন্য কেউ তার নিজের ফলে ভাগ বসাতে পারবে না। বসাতে চাইলে সে তার প্রতিরোধ করবে।

"কিন্তু ফল যদি নিজে অন্যের খাদ্য হতে চায়, তবে?"

"তবে সে ফলকে ত্যাগ করতে হবে। অজস্র ফল পাখীর অপেক্ষায় বসে আছে। তাদের মধ্য থেকে একটিকে বাছাই করে দিতে হবে।"

"এতে যদি বিরোধ আসে—সংঘাত আসে?"

"সে সংঘাতের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। নইলে পাখী হয়ে কি লাভ?"

"তুই তো বললি যাদু কিন্তু আমি কি করি?

"কি করবেন, শক্ত হন ভাল মানুষের ছদ্মবেশে যখন অনাচার আসে তাকে দৃঢ় হস্তে প্রতিহত করুন।" কি সব বলে ফেললুম, যা আমার মুখে মোটেই শোভা পায় না। চাকরের মুখে বড় কথা! ভুলেই গিয়েছিলুম, আমি চাকর—দুদিন আগে পথের ভিখারী ছিলুম। ছোট মুখে এত বড় কথা। আমার গলার আওয়াজে নিশ্চয়ই ঝাঁক ছিল। নিশ্চয়ই এ সব কথা মেমসাহেব বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনেছেন। বিছানা ছেড়ে তিনি উঠে এলেন—শুধু নাইট গাউনটা মাত্র তাঁর গায়ে। কি সব তত্ত্ব কথা হচ্ছে সাহেবের সঙ্গে? বলে তিনি মেজসাহেবের খাটের পাশে এসে বসলেন। আমি তখন তার পা টিপছি, কোমর উরু মেসেজ করে দিচ্ছি।

"যাদু আমাদের অনেক বুঝে, অনেক জানে, অনেক

বলতে পারে।" আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন মেজসাহেব।

"তা' বেশ হয়েছে,—তোমার সঙ্গে হেঁয়ালি কথা, বলার লোক পেয়েছ। অনেক তো তোমাকে ম্যাসেজ করেছে। তুমি এবার ঘুমাও—ও থাকলে তুমি কেবল কথা বলবে। তোমার ঘুম হবে না। আমারও হবে না।

এ বাড়ীতে তিনখানা শোবার ঘর। একটা ধসার ঘর আর একটা চাকরের। তিনখানা শোবার ঘর পাশাপাশি। সব ঘরের দরজা খোলা থাকে। বড় সাহেব, মেজ সাহেব ও মেমসাহেব তিনজন তিন ঘরে শয়ন করেন। আমি আমার সাধারণ শয্যাটি পেতে বসার ঘরে শুই। এ-ঘরের দরজা খোলা থাকে। প্রত্যেকের বিছানায় কলিংবেল রয়েছে। বেল বাজালেই আমাকে আদেশ শোনবার জন্যে ছুটে যেতে হয়। রাত্রেও বিচিত্র রকমের আদেশ পালনের জন্যে তৈরী থাকতে হয়। আমার ঘুম বড় কমে গেছে এ-বাড়ীতে এসে। সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। কার কখন ডাক আসে। এরই উদ্বিগ্নতার মধ্যেই একটু ঘুম এসে যায়। তারপর ইঁদুর চলার শব্দে ঘুম যায় ভেঙে—তখন নির্জীবের মত শুয়ে থাকি। আর অচেতন মনের গভীর থেকে কত কথা বুদবুদের মত ফুটে উঠতে থাকে।

বালক কালে মাকে হারিয়েছি। মানুষ-অমানুষ যা হয়েছি তা মামার বাড়ী মাসীর বাড়ী—শিক্ষকের বাড়ীতে থেকে। মাসী ছিলেন রুগ্না-মাসীর সংসার ছিল বড়। কাজের লোকের অভাব ছিল। তাই আমাকে কাজ করতে হয়েছে। আজ যে যদু যে-কাজে যায় তাই করতে পারে তার জন্যে আমি মামীর আর মাসীর কাছেই ঋণী। তাঁরা গঞ্জনা দিয়ে কাজ না করালে, আমি এখন এমন কাজ করতে পারতুম না। তাঁরা এখন কে কোথায় আছেন জানি না। হয়ত স্বর্গে আছেন—হয়ত বেঁচে আছেন কোথাও, দিন কাটাচ্ছেন দুঃখে, কে জানে তা?

মনটা কেমন অশ্রুতে ভিজে যায়। ফেলে আসা দিন গুলি যতই বেদনা ভরা হোক না কেন বড় মধুর হয়ে যেন ফিরে আসে। মনে পড়ে মা মারা যাবার দিনটি। কিসে মা মারা গিয়েছিলেন তা' মনে নেই। তার বিশেষ কোন রোগ ছিল না। গ্রামে ডাক্তার ছিল না। আমার ধারণা তার বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয়েছে। গ্রামের বুড়ীদের টোটকা ঔষধ খেয়ে। মায়ের মারা যাবার আগেকার দিন কটা আমার বিশেষ করে মনে পড়ে। মাত্র তার কিছুদিন আগে আমার মাসতুত দাদা সুরেশ মার কাছে বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেন সহরে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিতে। কুমিল্লায় তখন পুলিশের প্রচণ্ড উৎপাত। স্বদেশী ছেলেরা জেলে যাচ্ছে, মার খাচ্ছে, মরছে। সুরেশদারও বাল্যকালে মা মারা গিয়েছিলেন। তারপরে তিনি আমার মার কোলে মানুষ হয়েছেন। গ্রাম থেকে হেঁটে গিয়ে সহরের স্কুলে পড়েন। সহরে নেতাদের বক্তৃতা শুনে তাঁর মনে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটাবার প্রবল ইচ্ছা জাগল। তাঁর চোখের সামনে অনেক ছেলেকে পুলিশের মার খেয়ে রক্ত বমি করে মরতে দেখলেন, তাতে যেন তার নেশা চেপে বসল মাথায়—নিজেকে বিলিয়ে দেবার নেশায়। মা অনেক করে বারণ করলেন সুরেশদাকে। কিন্তু সুরেশদা নাছোড়বান্দা। মাকে সারারাত তিনি বুঝালেন, ইংরেজ এ-দেশ ছেড়ে চলে গেলে স্বরাজ আসবে। স্বরাজ এলে দেশটা কেমন সুখের হবে। আমাদের সকলের ঘরে আর অন্ন-বস্ত্রের অভাব থাকবে না। চোর-ডাকাত থাকবে না, দরজা খুলে রেখে দিলেও চুরি হবে না। গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক পাঠ-শালা থাকবে। দাতব্য চিকিৎসালয় থাকবে। শুনতে শুনতে মার চোখে জল এল। আমার চোখে জাগল একটা সুন্দর স্বপ্ন—সারাটা দেশের একটা সুন্দরী মোহিনী মূর্তি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমার ইচ্ছে হল আমি যদি সুরেশদার সঙ্গে যেতে পারতুম। মা চোখের জল মুছতে মুছতে সুরেশদাকে অনুমতি দিলেন: বললেন, বিজয়ী হয়ে ফিরে আয়; আর তোকে বলে রাখছি, খোকা যখন বড় হবে, তখন তোরা ওকে তোদের দলে নিয়ে যাবি। সুরেশদা আনন্দে লাফিয়ে উঠে মাকে প্রণাম করেছিলেন। তাঁর উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে আমিও মাকে প্রণাম করছিলুম। সুরেশদা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। গ্রামের আরও কয়টি ছেলে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল। সেই যে সুরেশদা মার কাছে বিদায় নিয়ে আন্দোলনে যোগ দিতে কুমিল্লা গিয়েছিলেন

আর ফিরে আসেন নি। সাতদিনের মধ্যে পুলিশ সুপারের নিজের হাতে ডাণ্ডা খেয়ে তিনি জেলে গিয়েছিলেন। জেলে যাওয়ার দশদিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

এরপর মা বেশিদিন বাঁচেন নি। যত দিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন আমার কানে মন্ত্র পড়েছেন, সাহেবদের যদি মেরে তাড়াতে না পারিস খোকা তোরা মানুষ নস—পশু।

তার বেশ কিছুদিন পরের কথা। কলেজের পড়া শেষ হয়ে গেছে। চাকুরীর বাজারে বড় দুর্দিন। তারপর যাদের বাড়ীতে পুলিশের কুনজর রয়েছে তাদের চাকুরী হওয়া কঠিন। তবু চেষ্টায় আছি। যাঁরা স্বদেশী করেন গোপনে তাঁদের সহায়তা করি—আদেশ পালন করি। কত রকমের উদ্ভট চিন্তা করি—মেরে তাড়াতে হবে ইংরেজদের।

মনে পড়ে—লোহার রড চালিয়েছিলুম, কেমন তড়িৎ-গতিতে পোণ্ট অফিসের ওভার-সিয়ারের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলুম টাকার থলেটা। মাথায় লেগেছিল ভীষণ। মৃত্যু হয়েছিল তাঁর। কিন্তু ওর মাথাটা তো আমার চোখের সামনে ছিল না সেদিন,—ছিল সেই ইংরেজ পুলিশ সুপারের—যার ডাণ্ডায় কত শত স্বদেশী ছেলের মাথা ভেঙেছে।

মাত্র দশহাজার টাকা ছিল থলেতে। রাত্রির আঁধারে লুকিয়ে সে টাকা পৌঁছে দিয়েছিলুম সুমিতাদির হাতে। স্বরাজ এসেছে তার অনেকদিন পরে তবু সুমিতাদি যেমন মধুর হেসে আমার হাত থেকে টাকার থলেটা নিয়েছিলেন সেই হাসিতেই আমি পেয়েছিলুম একটা বিরাট যুদ্ধজয়ের পুরস্কার। ইংরেজকে পরাভূত করে তাড়িয়ে দেবার পুরস্কার। তারপর থেকে আমি নিখোঁজ খুনী আসামী। আমি অজ্ঞাতবাসী।

এলোমেলো স্মৃতিমন্থনের মাঝে কেমন তন্দ্রা এসে গেল। সহসা চাঁদের আলোতে যেন ঘর ভেসে উঠল। সেকি চাঁদের আলো? সূর্যের আলো? না বিজলীর আলো? না সব আলোতে মেশানো আলো? সে আলোতে তন্দ্রা টুটে, মূর্চ্ছা ছুটে। আমি অসুর বিজয় দেবতাদের সাহায্য করেছি। আমি মর্তের বীর। আমার কাছে সেই আলোতে ভর করে নেমে এলেন স্বর্গের অপ্সরী। আমি দেবসভায় সিংহাসনে বসে আছি। তিনি এসে দাঁড়ালেন আমার চারপাশে। আমার উচ্চকিত মনে কিসের ঝড় বয়ে গেল। আমার চোখের সামনে ঘন কৃষ্ণ মেঘের এ-কী সমারোহ। অর্দ্ধ চন্দ্র দুলছে তার নীচে। দুটি কালো ভ্রমর যেন নাচছে। রজনীগন্ধার বৃন্ত। পর্বতের দুটি শৃঙ্গ, মাঝে তার প্রকাণ্ড গহ্বর,—তার সানুদেশ—তারপর খাদ, মসৃণ তৃণবৃত অঞ্চল। দুটি কদলী বৃক্ষ, পরিপূর্ণ একটি ফেনিল মদের পাত্র, সমুদ্রের ঢেউ বড় ক্ষিপ্ত, বড় ক্ষুব্ধ, একটা প্রচণ্ড ঝড়ের হাওয়ার ভর করে ভেসে এল মহুয়া ফুলের গন্ধ—আম্র-মুকুলের সুবাস। সকলের রূপ-রস গন্ধ আমার একাদশ ইন্দ্রিয়কে তন্দ্রাচ্যুত করল। অবশেষে সব যেন ঘণীভূত হয়ে আমার সামনে দাঁড়াল। বুঝতে পারলুম মদোন্মত্তা বিবসনা সুন্দরী সুপ্রভা আমায় টেনে হেঁচড়ে নিয়ে চলেছেন তাঁর শয়ন ঘরে। দু-পাশের দু ঘরে তখন তাঁর স্বামী আর ভাসুর গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

ক্রমশঃ

সুদূর নীহারীকা

অরূপকুমার দাস

আমার অভিশপ্ত জীবনের সভ্য ক্ষমতাকে ম্লান করার প্রয়াসে জীবনের সাধ, স্বপ্ন, আশা, আকাংখাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে জীবিকা অন্বেষণে হন্নে হ'য়ে পৃথিবীর মানচিত্রের সূক্ষ্ম রেখাকে অনুসরণ ক'রে এগিয়ে চললাম, দিশাহীন পথ-প্রান্তরে। সংকীর্ণ, বিপদসংকুল পথ—আলোক বিহীন অনন্ত দুর্ভেদ্য বনারণ্যের কোন সুদূর সীমায় আমার হারিয়ে যাওয়া খুসীর নিমন্ত্রণ। কোথায় আমার মুক্তির অনাবিল আনন্দের বয়ে যাওয়া নির্ঝরের কুলু কুলু নিনাদ? বিরামহীন আমার এ-চলার শেষ কোথায়? সুবিশাল এই ভূখন্ডের কোন্ ঠিকানায় আমার শান্তির স্বর্গভূমি? মেখানে নিত্য বসন্ত বাতাসে মাধবী, মল্লিকার সুমধুর সৌরভে অলিকুল চঞ্চল, দিশেহারা। পল্লবিত সবুজ, স্নিগ্ধ, শীতল ছায়ায় ঘেরা আমার শান্তির উপনিবেশ। সে অজানা পথের কে দেবে আমায় নিশানা? ওগো অকরুণ তোমার সকরুণ ক্ষমতায় আমার ক্লান্তিভরা জীবনে দাওগো এনে শান্তির স্বপ্নোচ্ছ্বাস।

ভাগ্যকে মানতে আমি বদ্ধপরিকর। তাই অতর্কিতে আবির্ভাব দীনতাকে অঙ্গীকার করে নিতে বিন্দু মাত্র বিচলিত নই। আমার বিদ্যা, বুদ্ধি বিবেককে বিসর্জন দিয়ে অসত্যের কঠিন, পথে ধাবমান হবার প্রবৃত্তি আমার নেই; সে পরিকল্পনাও নেই। কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণার ক্লান্তি-ভরা হৃদয় আমার কেমন ক'রে অসত্যের সংগে সংগ্রাম ক'রে মহান সত্যকে অক্ষুন্ন রাখবে। তার শক্তি, সামর্থই বা কোথায়?

হে মহান সত্য! আজ আমি কত নিরুপায়। তোমার আমার আন্তরিকতার নিরবচ্ছিন্ন বন্ধনকে কারা প্রতিহিংসায় যেন ছিন্ন করে দিতে চায়। 'হে বন্ধু, বুভুক্ষুপীড়িত কাঙাল হৃদয় আমার আজ বড় অসহায়। আমায় তুমি ভুল বুঝো না। আমার চোখের কোল বেয়ে বয়ে যাওয়া নীরব অশ্রুধারায়, বিভেদের রাজপথ আজ বড় পিচ্ছিল। সে পথ বাইব কেমনে বল? কি বন্ধু, তুমি নিরুত্তর? ওঃ বুঝেছি তোমার গোপন মনের অভিলাষ। চাওনা তুমি আর আমার সংগে সম্পর্ক রাখতে। বন্ধু এ তুমি কি করলে? এমন নিষ্ঠুর স্বার্থপরতায় আজ আমায় জগতের কাছে হীন প্রতিপন্ন করলে। তবে তাই হোক বন্ধু তাই হোক! আমার নিষ্ঠুর দীনতাই হোক্ বিচ্ছিন্নতার প্রধান কারণ। সেই আমার সুখ, সেই আমার সান্ত্বনা।

সত্য আমার জীবন থেকে নিয়েছে বিদায়। বিদায় নিয়েছে আমার পল্লবিত সবুজ, স্নিগ্ধ, সুন্দর বসন্ত। জরা-জীর্ণ বিশীর্ণ হৃদয়ের শূন্য শাখা-প্রশাখায় আজ মৃত্যুর অব্যক্ত যন্ত্রনা। সংকুচিত জীবনে হয়ত নেই আর সবুজ পল্লবে, পূর্ণতার গৌরবে বিকশিত হ'য়ে ওঠার কোন সম্ভাবনা। আমি এক অকাল বৃদ্ধ—তপ্ত মরু। আমার অস্তিত্ব আজ জলে পুড়ে ছারখার—খান্ খান্—চূর্ণ-বিচূর্ণ।

কিন্তু সহসা কে যেন অসীম ক্ষমতায় আমার চূর্ণ-বিচূর্ণ উপকরণগুলোকে সযত্নে তুলে নিয়ে আমার বিধ্বংসিত অস্তিত্বকে পুনরায় গড়ে দিলে। আমার তপ্ত মরুর বুকে করলে শান্ত, শীতল ছায়াদান। সেই হিমেল বাতাসে আমার তপ্ত হৃদয় গেল জুড়িয়ে। আমার তপ্ত মরু আকাশে মেঘের আঁচল ছড়িয়ে রিমিঝিম অবিরাম বারিধারা ঝরিয়ে আমার শুষ্ক, কঠিন হৃদয়কে করে দিলে কোমল।

কাঙাল তরুর শাখা-প্রশাখা সবুজের সমারোহে একি চঞ্চল। ভাষাহীন বোবা প্রাণে ফুটে উঠল শতদল। আমি ধন্য, আমি মুগ্ধ! আনন্দে গেয়ে উঠি গান। মৌমাছিরা গুঞ্জরণে শুনিয়ে যায় গান। আনন্দের আতিশয্যে আমি বিহ্বল।

দৃষ্টির অন্তরালে নিরাকার, অদৃশ্যমান যে ভাগ্যদেবী আমার গতিবীন, স্তব্ধ, মৌন ভাগ্যকে করলে নিয়ন্ত্রণ সেই তুলনাহীনা, বিশ্বজননীকে জানাই আমার গভীরতম হৃদয়ের নিঃশেষিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি।

আমার চিরধন্যা, চির সহনশীলা মায়ের আকুল প্রার্থনায় হয়ত বা সে দেবী বিচলিত হয়েছিলেন। সে দেবীর চরণে নিবেদিত মায়ের দেওয়া শুচি, স্নিগ্ধ শ্রদ্ধা ও ভক্তির অঞ্জলি ভরা পাত্রকে গ্রহণ না করে পারলেন না। জীবনে শ্রেষ্ঠত্বের পেলাম তাই চরম পুরস্কার। পেলাম 'মেডিসিন সেল্‌স্ রিপ্রেজেনটেটিভের কাজ।

কাজ পাওয়া মাত্র কোথাও বিন্দুমাত্র বিলম্ব না ক'রে বাড়িতে এসেই মাকে জড়িয়ে ধরলাম আবেগে, আনন্দে।

অতর্কিত আমার এই আনন্দ, উচ্ছ্বাসে মা বারপরনাই বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, "কিরে এত আনন্দ কিসের?"

মুহূর্তে মাকে ছেড়ে দিয়ে মায়ের চরণ স্পর্শ ক'রে বললাম, "মাগো, তোমার অপদার্থ ছেলে আজ চাকরী পেয়েছে।"

সুপ্ত অনাবিল আনন্দে মায়ের শূন্য হৃদয় যেন ভরে গেল। চাকরীর সংবাদ মায়ের কাছে যেন স্বর্গীয় স্বপ্নের মত মনে হোল। তপ্ত মরুর বুকে যেমন বৃষ্টির অঝোর ধারা নেমে এলে শান্তির প্লাবন বয়ে যায়, চাকরীর এই প্রাপ্তিতে মায়ের দেহমনে ঠিক তেমনি যেন আনন্দের ঝরণা ধারা বয়ে গেল।

হঠাৎ মা যেন কেমন স্তব্ধ, মৌন হয়ে গেলেন। সজীব সুন্দর প্রকৃতি সহসা যেমন প্রলয়ের আশংকায় স্তব্ধ, মৌন হয়ে যায়, মা আমার ঠিক তেমনি স্তব্ধ, মৌন হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই দেখি মায়ের দুচোখ শ্রাবণের অশ্রুধারায় প্লাবিত। জানি না সে অশ্রু আনন্দের না দুঃখের—না অন্য আর কিছুর।

দীর্ঘ দিনের জমে থাকা অসংযত বেদনা নীরব কান্নার জলেই হোক তবে আজ অবসান। দুঃখ, কষ্টের অসীম সহ্যের হৃদয় কি আজ আনন্দ সংবাদে অশ্রু না ঝরিয়ে পারে।

শান্ত, ধীর কণ্ঠে শুধালাম, "মাগো তুমি কাঁদছ? জানি না তোমার ওই কান্না দুঃখের না আনন্দের। যদি দুঃখের হয় তবে আজ তোমার চরণ স্পর্শ করে এ শপথই করছি আজীবন তোমার ওই অশ্রু প্লাবিত নয়নে আনন্দের অশ্রুতে প্লাবিত করে দেব।"

মা সযত্নে আমার মাথাটাকে তাঁর একান্ত বক্ষে টেনে নিয়ে চেপে ধরে বললেন, "পাগল ছেলে আমার।"

স্রোতে ভেসে যাওয়া কোন ফুলের মত আমিও ভেসে চললাম। এই অপরিবর্তনশীল চলায় আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। হৃদয় আমার অবসাদে গেল ভরে। জীবনের বৈচিত্র্য গেল হারিয়ে। বৈচিত্র্যহীন জীবনের পটভূমিকায় নিত্য ছন্দহীন সংগীতের অনুরনন। সজীব সবুজ শাখা-প্রশাখা ফুলহীন শূন্যতায় রিক্ত, নিঃস্ব। পরিপূর্ণ বিকাশের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় হৃদয় বড়ই আকুল। হাজার ফুলের স্নিগ্ধ সৌরভের হে সুদূর বসন্ত তুমি আর কতদূর! মৃদুমন্দ মলয় বাতাসে কবে তুমি আমার হৃদয়ে জাগাবে শিহরণ? ব্যাকুল বন-বীথিকায় কবে তুমি নব জাগরণের সাড়া তুলবে? নতুনের ছন্দে হৃদয় উঠবে মেতে কবে? হে চির সুন্দর, চির নবীন শ্যামল সবুজ বসন্ত —সৌন্দর্যের প্রতীক, আমার অলস দেহমনে কবে তুমি বাজাবে বাঁশি। তোমার স্নিগ্ধ সৌরভ ভারে করবে আমায় বিচলিত, বিমুগ্ধিত?

খুশীহীন দিগন্তে ম্লান সূর্যালোকে বেদনার প্রতিচ্ছবি যেন স্বচ্ছ। ধূসর ধরায় কোন পথচারীর অনুপস্থিতিতে জনসমুদ্র যেন স্তব্ধ, গতিহীন, অচঞ্চল। উত্তাল তরঙ্গ-মালার নেই কেমন উচ্ছ্বাস। প্রাণহীন, মৌন প্রকৃতির সাজসজ্জা আজ শৈথিল্য। পৃথিবীতে আলো আঁধারের একি লীলাময় খেলা।

সহসা আমার ছন্দপতন জীবনে এল সুর-সংযোজন গানের রেলা। নিরুত্তাপ, নিরুৎসাহী দেহ মনে আজ একি

অভূতপূর্ব শিহরণ। কে তুমি বসন্তের দূত! আমার স্তব্ধ, কঠিন হৃদয়কে দিলে আজ সজোরে নেড়ে। অতীতের জীর্ণ-মলিন, শুষ্ক যত পত্র ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল ধরণী ধূলিতে। বিরহ বেদনার হল অবসান। তপ্ত মরুর বুকে করলে ছায়াদান। আমার তৃষিত হৃদয় আজ পরম পরিতৃপ্ত। সে শুধু অরুন্ধতির জন্য। অরুন্ধতির শান্ত, স্নিগ্ধ, মায়াময় দুটি নয়ন আমায় করলে ধন্য, বিমুগ্ধিত। কি অসহ্য মধুর যন্ত্রণা!

জুজারসা উচ্চ বিদ্যালয়ের হাজার মেয়ের মধ্যে আবিষ্কার করলাম ওই অরুন্ধতিকে। অরুন্ধতির সহজ, সরল দৃষ্টির সংগে হ'ল আমার দৃষ্টির বিনিময়। উভয়েই বিমূঢ়, বিমুগ্ধ। অরুন্ধতির শান্ত, উন্নত, ভালে প্রেমের জয়টীকা এঁকে দেবার প্রবল বাসনায় মন আমার প্রলুব্ধ হ'য়ে উঠল। কিন্তু সে সৌভাগ্যের রাজপথ যদি হয় সংকীর্ণ, সে পথ অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌঁছাব কেমনে? সে পথ সুপ্রশস্ত, সুমসৃণ ক'রে দিতে পারে একমাত্র ওই অরুন্ধতিই। কিন্তু কেমনে জানাব সে গোপন আবেদন। আবেদনের সে ভাষা যে আমার মূক বধির। আড়ম্বরহীন আমার নিমন্ত্রণে ও যদি না দেয় সাড়া?

স্কুলের সম্মুখেই হাজরা এণ্ড কোম্পানীর ঔষধের দোকান। মেডিসিনের ব্যাপারে সপ্তাহে আমাকে একবার উক্ত দোকানে আসতেই হয়। উক্ত দোকানের দুজন কমপাউণ্ডারের সংগে আমার যথেষ্ট সদ্ভাব হয়ে গিয়েছে। আমার গোপন মনের অভিলাষ অবলীলাক্রমে ওদের সামনে প্রকাশ করলাম। স্বচ্ছন্দে ওরা তাতে সায় দিল। যোগাযোগ স্থাপন করে দেবার সে গুরুভার বিনা দ্বিধায় ওরা স্কন্ধে চাপিয়ে নিল। বন্ধুত্বের এই অবদান যদিও দুর্লভ কিন্তু স্বার্থত্যাগের এই দৃষ্টান্ত আমাকে কৃতজ্ঞতার ঋণে ঋণী করল। একজনের নাম যোগেশ অপরজনের নাম রাঞ্জং। গাত-প্রকৃতি যদিও দুজনের ভিন্ন তবে সেটা চোখে ধরা পড়বে না।

রাঞ্জং কখনও হয়ত রসিকতা করে বলত, "বৌদি কবে আসবে অরূপ?"

আমি মৃদু হেসে বলতাম, "সে মজি তো তোমাদের, তোমরা যেদিন এনে দেবে।"

যোগেশ হয়ত কখনও বলত, "কিরে অরূপ কত মিষ্টি খাওয়াবি?"

প্রত্যুত্তরে জবাব দিতাম, "তোমার শূন্য উদরে যতটা ধরবে, ততটা।"

যোগেশ পিঠে হাত চাপড়ে বলত, "তথাস্তু।"

উক্ত দোকানের ডাক্তার অরুণ হাজরা আমাদের গোপন আলোচনাকে সহজ ভাবে মেনে নিতেন না। তাঁর দৃষ্টি যেমন ক্ষুরধার তেমন তীব্র। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। দৃষ্টির অন্তরালে যেন কটু ব্যঙ্গোক্তি লুকিয়ে থাকত। আমরা সংগে সংগে সচেতন হ'য়ে আলোচনা ভঙ্গ করে দিতাম।

শুধুমাত্র গোপন আলোচনার মধ্যে যখন কোন কিছুরই সমাধান হ'ল না তখন রঞ্জিৎ একদিন ডেকে বলল, "অরূপ একটা কাজ করা যাক, আমার বন্ধুর ভাই কমলের সংগে বরং তোকে পরিচয় করে দিই, সে এই স্কুলেই পড়ে। আমার মনে হয় তাকে সব কিছু খুলে বললে অতি সহজেই মনে হয় কাজটা ফলপ্রসূ হতে পারে। তুই বরং পরের সপ্তাহে আয় আমি ওকে সব কিছু বলে ঠিকঠাক করে রাখব।"

যদিও ব্যর্থতার বেদনায় হৃদয় আমার জর্জরিত তবু আমার প্রচ্ছন্ন আলোকে নীরব আশ্বাসে সেদিন নীরবেই ফিরে এলাম।

সাতদিন দারুণ অস্থিরতার মধ্য দিয়ে দিনগুলি কাটালাম। নিশীথ নিরব প্রহর বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে আজ ভোর হতেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। সারারাত্রি জাগরণে দেহ-মন ক্লান্তি আর অবসাদে আচ্ছন্ন। উত্তরের হিমেল বাতাসে দেহ শিরশির করতে লাগল। অলস আঁখির তারায় প্রকৃতির শান্ত মূর্তি যেন কেমন বিস্বাদে ভরা। কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরের আকাশ সম্পষ্ট। ভোরের শিশিরে সিক্ত তৃণদল। আজ প্রকৃতি যেন বিগত ব্যথায় মৌন মহান। জানি না ভাগ্যে আমার কি আছে। বিমর্ষ মনে কত প্রশ্নের উদ্ভব। কত সুন্দর বিচিত্র স্বপ্নের অনিন্দ্য অনুভূতি কি এক মুহূর্তেই ঘটে যাবে পরিসমাপ্তি। না না, না এত নিষ্ঠুর নিশ্চয়ই সে নয়। বিশ্বরূপের মতই সে যে পবিত্র, নির্মল তার চোখে মুখে

সরল, নিষ্পাপতার চিহ্ন প্রস্ফুটিত। মে মে বসন্ত বাতাসে ফোটা ভোরের স্নিগ্ধ শিশিরে সিক্ত অপরূপা, মনোরমা পুষ্প। কোমল গান্ধারে করেছে সে আমার উন্মাদ। সে যে উর্বশী; সে যে মহৎ মহান। আমাকে অস্বীকার করার সে হীন প্রবৃত্তি নিশ্চয়ই তার নেই এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ত্বরায় স্নান সেরে পরিপাটি করে পোষাক পরে রওনা হলাম গন্তব্যস্থলের অভিমুখে।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছতেই রঞ্জিৎ আমার সাদর অভিনন্দন জানাল। রঞ্জিতের চোখে মুখে দেখি আজ আশার দীপ্ত ছটা। তৎক্ষণাৎ আমার দেহ-মনে আনন্দের ঝরণা বয়ে গেল। এক অসীম পরিতৃপ্তিতে দেহ-মন পুলকিত হয়ে উঠল।

রঞ্জিৎ পুলকিত হ'য়ে বলল, "অরূপ তুই ঠিক দশটার সময় এখানে এসে পৌঁছাবি। কমল ঠিক দশটার সময় আসবে। এখন তোর অন্য কাজগুলো সেরে আয় গে যা।"

রঞ্জিতের এই উত্তম প্রস্তাবকে সর্বান্তকরণে মেনে নিয়ে এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে সংগত আনন্দে চলে এলাম বাকী কাজ সমাপন করে নিতে।

বিশ্বব্যাপী আজ অপরূপ সৌন্দর্য্যের অপূর্ব বিকাশ। নিঃসীম, নিঃলিমা উজ্জ্বল, নির্মল ফনাকালোকে উদ্ভাসিত। বিশাল উত্তাল জন-সমুদ্রে পেয়েছি আমি আমার ঠিকানা। অনুভূত কম্পমান আমার অস্তিত্ব। আমার প্রেম-পূজার মন্দিরে আজ পবিত্র অর্ঘের উপকরণে সুসজ্জিত। নিবেদিত পুষ্পের মনিহার চরম মুহূর্তের প্রতীক্ষায়। ব্যর্থতার গ্লানি নিমেষে অন্তর্হিত পুষ্পের স্নিগ্ধ সুগন্ধে।

অনিচ্ছায় সমস্ত কাজ সমাপন করে ঠিক দশটার সময় হাজির হ'লাম নির্দিষ্ট স্থানে। রঞ্জিৎ তখন কি কাজে ব্যস্ত ছিল ওকে বিরক্ত না করে একটা বিদেশী ম্যাগাজিনের পাতা অনর্থক ওলটাতে-পাল্টাতে লাগলাম। প্রায় মিনিট দশেক পরে একটি ছেলে এসে রঞ্জিতের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে কি সব কথা বলতে দেখলাম। ছেলেটি লম্বা, ছিপছিপে। বয়স আন্দাজ ষোল কি সতের। ক্ষীণকায় চোখে মুখে ক্লান্তির আভাস। শান্ত, ধীর। কুচকুচে কালো একরাশ কোঁকড়ানো চুল মাথায়। চোখ দুটো ছোট ছোট। ঠোঁট দুটো যদিও মোটা, কিন্তু দেহের সঙ্গে এমন ভাবে মানিয়ে গেছে মোটা বলে ভ্রম হবে না।

যাই হোক রঞ্জিৎ আমাকে ডেকে বলল, "এই সেই কমল, যার কথা তোকে বলেছিলাম।"

আমি ছেলেটিকে সাদর সম্ভাষণ জানালাম। ছেলেটি সাগ্রহে দেখি সমর্থন করল। অত্যন্ত খুসী হলাম।

কোন ভূমিকায় অবতীর্ন না হ'য়ে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম, "কমল, তুমি এই স্কুলে পড়?"

কমল শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, "হ্যাঁ আমি এই স্কুলে পড়ি।' একটু হেসে বলল, 'কি ব্যাপার বলুন তো?"

আমি একটু সলজ্জ হয়ে বললাম, "তুমি ভাই আমার একটা উপকার ক'রে দিতে পারবে? যদিও তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোট, এই কাজের ভার দেওয়া আমার অত্যন্ত অনুচিত কিন্তু আমি এমনই নিরুপায়—"

কমল উৎসাহিত হয়ে বলল, "আপনি বলুন না কি করতে হবে।"

কমলের এতটা আগ্রহ দেখে আমি অত্যন্ত খুসী হ'লাম। খুসী হ'য়ে বললাম, "তুমি কোন্ ক্লাসে পড় ভাই?"

কমল সহজভাবেই উত্তর দিল, "ক্লাস টুয়েলেভে।"

আমি বিনীত ভাবে বললাম, "তোমাদের স্কুলের একটি মেয়েকে চিনিয়ে দিতে পারলে তার সম্বন্ধে কিছু আমায় জানাতে পারবে?"

কমল একটু ভীত হ'য়ে বলল, "কাজটা যদিও কঠিন, তবু আপনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব। আচ্ছা মেয়েটিকে চিনিয়ে দিন না, দেখাই যাক্ না কতদূর কি করা যায়"?

দূর থেকে একদল মেয়েকে আসতে দেখে আমি থমকে গেলাম। চমক ভেঙ্গে যেতে কমলকে বললাম, "ওই যে দূরে একদল মেয়ে আসছে, ওদের দলের মধ্যেই সে আছে"। আমাদের সামনাসামনি ওরা প্রায় এসে পড়েছে, কমলকে ইশারায় বললাম, "ওই যে নীল রংয়ের ছাপা শাড়িটা পরে যে মেয়েটি—ওরই কথা তোমাকে বলছিলাম।"

কমল আশ্চর্য হয়ে বলল, "ওর নাম তো অরুন্ধতি। আমরা তো একই ক্লাসে পড়ি। ওর সংগে আমার যথেষ্ট আলাপ-পরিচয় আছে।"

আমি খপ করে কমলের একটা হাত ধরে বললাম, "ভাই তুমি যদি একটু—"

কমল মনে হয় আমার অসহায় অবস্থাটা বুঝতে পারল,। আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "অরুপদা জানি না আপনার জন্য আমি কতটা কি করতে পারব, তবে চেষ্টার অন্ত রাখব না"। একটু থেমে বলল, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি ওর সংগে কথা বলে আসছি"—বলে কমল চলে গেল।

আমি বিমূঢ়ের মত সেখানেই ধীর, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কমলের ফিরে আসার পথের দিকে চেয়ে অধীর প্রতীক্ষায় উৎসুক হয়ে রইলাম।

অরুন্ধতিকে আমার হৃদয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার প্রবল বাসনায় মন আমার অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়ে উঠল। সংযমী মনে আজ আমার একি চঞ্চলতা, অস্থিরতা! আবেগে ও উদ্বেগে আমি দিশেহারা। শুচিস্নিগ্ধ আমার এই প্রেমের মূল্যই বা কতটুকু? অরুন্ধতি কি আমার এই পবিত্র প্রেমের দেবে মর্য্যাদা?

আধুনিক সভ্য জগতে যদিও জানি পবিত্র প্রেম মূল্য-হীন। স্বার্থের প্ররোচনায় মানুষ আজ আদর্শভ্রষ্ট। আদি, অনাদি অনন্ত কালের সে পুণ্য প্রেম আজ বাস্তবের কঠিন সংঘাতে ক্ষুণ্ণ।

এই সব এলোমেলো নানান চিন্তায় মনকে ধীর, স্থির রাখতে পারলাম না। মনে হচ্ছে আমার আশা-প্রত্যাশার অন্তরালে নিষ্ঠুর নিয়তির প্রচ্ছন্ন ইংগীত যেন বারে বারে ব্যঙ্গ করে উঠছে। তবে আমি কি ব্যর্থ হয়ে যাবো? আমার অভীষ্ট সাধনা কি তাহলে সফল হবে না?

হঠাৎ দেখি কমল স্কুল গেট পেরিয়ে আমার দিকেই আসছে। আমি বিচলিত হ'য়ে উঠলাম, আমার বুকে সজোরে স্পন্দন শুরু হ'ল। শিরা-উপশিরায় কি এক তরল যন্ত্রনা যেন প্রবাহিত হতে লাগল।

কমল কাছে এসে বলল, "আমি ওকে আপনার কথা বললাম"।

আমি ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, "আমার সম্বন্ধে কি বলল অরুন্ধতি?"

কমল উৎসাহিত হ'য়ে বলল, "আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যাঁরে অরুন্ধতি, আজ স্কুল গেটের সামনে যার সংগে কথা বলছিলাম তুই ছেলেটাকে চিনিস?" ও স্বচ্ছন্দে বলল "হ্যাঁ চিনি" তারপর বললাম, ওঁর সংগে প্রায়ই তোর চোখে চোখ হয়? ও বলল "হ্যাঁ তা হয়।" একটু অধৈর্য হয়ে বলল, "কিন্তু কেন বলত।" ওর কথার মধ্যে বুঝতে পারলাম আপনার প্রতি নিশ্চয়ই ওঁর সুপ্ত দুর্বলতা আছে। তাই সাহস করে বললাম, "তোর সংগে একটা গোপন কথা আছে, তুই আমি ছাড়া আর কেউ যেন না জানে।" ও ঘাড় নেড়ে মৌন সম্মতি জানাল। হঠাৎ দূরে একদল মেয়েকে আসতে দেখে বললাম, "আজ থাক কাল বলব।"

আমি আনন্দিত হ'য়ে বললাম, "আচ্ছা কমল তোমার কি মনে হয় বলত? ও নিশ্চয়ই আমাকে—"

আমার অসমাপ্ত কথা উপলব্ধি করে কমল বলল, "তাইত মনে হয়"।

আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম, "একটা চিঠি দিলে ভাল-হয় না কমল? তুমি চিঠি দিলে দেবে তো ওকে?"

কমল বলল, "দিতে আমার কোন আপত্তি নেই কিন্তু ও যদি না নেয়?"

আমি বললাম, "না নেবার কি আছে। ওর ভাব-প্রকৃতি দেখে কি মনে হচ্ছে ও তা প্রত্যাখান করবে? আমাকে প্রবঞ্চনা করবে?" কমল নিরুত্তর হয়ে রইল। একটু পরে বললাম, "তুমি ভাই একটু অপেক্ষা কর আমি এখুনি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি।"

যাই হোক একটা কাগজ যোগাড় করে তো বসলাম লিখতে, কিন্তু ভাব-ভাষা ছন্দহীন মনে চিঠি লেখার প্রবন-তাই বা জাগবে কেমন করে? মনের সংগে অনেক সংগ্রাম করে অযথা সময় নষ্ট না করে লিখলাম—

অরুন্ধতি,

যে দৃষ্টির আলোয় তোমার, হৃদয় আমার ঝলমল করে উঠল, তোমার শান্ত, স্নিগ্ধ বিনম্রতার পরিপূর্ণতায় হৃদয়

আমার আজ ধন্য, মুগ্ধ শুধু ক্ষণিকের এই চাওয়া দিয়ে যদি আমার সব কিছুর নিষ্পত্তি করে দিতে চাও তবে তোমার ওই অসংযত দৃষ্টিকে সুযত্নে, পরিহার করে নিও, কেমন।

যে দৃষ্টি আমার অদূর ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্নের দেয় না কোন স্বচ্ছ ইংগীত কি প্রয়োজন অরুন্ধতি, ক্ষণিক মোহ-বশীভূত দৃষ্টির ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করা।

পত্রশেষে শুধু এইটুকু অনুরোধই করব, আজ বয়সের সুদীর্ঘ আর কার নিয়ে নিজেকে প্রেমের সিংহাসনে অভিষেক করার বিজয়ী আনন্দে আমাকে কেন অপরাধের কাছে হীন প্রতিপন্ন করো না, কেমন। আর কি। ভালবাসা জানানোর যদিও দাওনি এখনও আমার কোন নৈতিক অধিকার কিন্তু সে স্পর্ধা, সে দুঃসাহস দিয়েছ বুকে আমার এঁকে। তাই দ্বিধায় জানালাম ভালবাসা। তুমি তা গ্রহণ করো অরুন্ধতি।

পত্রের প্রত্যুত্তরের রইলাম চরম প্রতিক্ষায়।

ইতি—অরূপ।

কমলের হাতে চিঠিখানা দিয়ে অনুরোধের সুরে বললাম, "তোমার হাতেই আমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে।"

কমল মৃদু হেসে বলল, "কার দ্বারা কার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ হয় সে কি বলা যায়, তবে এটুকু সত্য আপনার পুণ্য কর্মফলই আপানার ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করবে।"

কমল চলে যেতে উদ্যত দেখে বললাম, "চিঠির উত্তরটা কবে পারো কমল?"

কমল একটু ভেবে নিয়ে বলল, "আপনি আগামী সপ্তাহে আসছেন তো, তবে আশা করি তখনই পেয়ে যাবেন।"

কমল আর কোন কথা না বলে চলে গেল।

এক অদম্য অদৃশ্য প্রাণশক্তির আকর্ষণে জুজারসা পঞ্চানন তলায় মনকে আমার নিয়ত টেনে নিয়ে যেতে চায়। ইচ্ছা থাকলে এবং প্রাণশক্তি যথেষ্ট থাকলেও আমি অসহায়। তাই সপ্তাহে একটি দিনের জন্যই অরুন্ধতির চোখের তারায় তারায় আমায় চাতকদৃষ্টি ধীর, স্থির হ'য়ে যায়। এক অপূর্ব সুখানুভূতিতে সেদিন দেহ-মন আমার আপ্লুত হয়ে যায়।

যাই হোক পূর্বের নির্দ্ধারিত দিনটিতে আবার রওনা হলাম জুজারসা পঞ্চানন তলায়। বাস থেকে নেমেই একেবারে কমলের চোখোচোখি। কিন্তু ওকি! কমল আমাকে দেখে কেন নিজেকে আত্মগোপন করার জন্য সচেষ্ট হ'য়ে উঠল? কিছু না বুঝতে পেরে 'কমল' বলে ডাক দিলাম। কমল আমার ডাকে অনিচ্ছার সাথে দাঁড়াল।

ধীর পায়ে আমার কাছে এসে বলল, "অরুদা, আমায় তুমি ক্ষমা করো। নিরুপায় হ'য়ে আজ তোমায় এই অনুরোধ করছি, আমাকে এ সব ব্যাপারে আর কোন কথা কোন দিন বলতে আসবেন না। আমি এ-সব ঝামেলায় নিজেকে আর জড়াতে চাই না।" কমলের এমন রূঢ়, কঠিন কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার বুকে কে যেন হানলে বজ্র কঠিন বাণ। পলকহারা নিমেষে হৃদয় আমার বেদনায় আপ্লুত হ'য়ে উঠল। মনে মনে ভাবলাম সুখ নিয়েই যে জীবন গড়া, এই সুবিশাল পৃথিবীতে অগণিত মানুষের কাছে ভালবাসা পাবার ভাগ্য নিয়ে তো সে জন্মায়নি। মানুষের রূঢ়, কঠিন কথা শোনার জন্যই তো তাদের জীবন। মানুষের দরবারে নালিশ জানানোর নেই তাদের নৈতিক অধিকার।

যে ফুল অনাদরে অবহেলায় ফোটে সবাকার প্রবঞ্চনা, উপেক্ষায় সে যে নীরবেই যাবে ঝরে, নিষ্ঠুর মানুষের পদ-সঞ্চারে দলিত হ'য়ে মিশে যাবে ধরণীর রুক্ষ ধূলিতে।

আমি কমলকে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললাম, "কমল, ভুলেও তোমায় আর কোনদিন অনুরোধ করব না, তুমি এই বিশ্বাসটুকু অন্তত আমার প্রতি রেখো, যদি আপত্তি না থাকে জীবনের শেষ অনুরোধ করছি, একটা কথায় উত্তর দেবে কমল?"

কমল ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

—"চিঠিটা দেওয়ার পর অরুন্ধতি কি বলল কমল?"

কমল মাথা নীচু করে বলতে লাগল, "আপনার দেওয়া চিঠিটা নিল ও স্বচ্ছন্দেই। পরের দিন চিঠির উত্তর চাইতেই দেখি ওর অন্য এক মূর্তি। দেখলাম এ অরুন্ধতি

আর সে অরুন্ধতি নেই। রূঢ় কঠিন কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ চিঠির উত্তর দেওয়া নিশ্চয়ই আমার কর্তব্য কিন্তু চিঠির উত্তরটা হবে এই, আমাকে চাইবার স্পর্ধা যেন কোনদিন তার না হয়। হ্যাঁ, আমি চিঠিটা আমার বাবার হাতেই তুলে দিয়েছি। আর কমল তোকে সতর্ক করে দিচ্ছি এর পরে ওসব সম্বন্ধে কোন কথা বলতে এলে আমি কিন্তু তোর বাড়ীতে জানাতে বাধ্য হবো, আশা করি সেটুকু আত্মসচেতনে নিশ্চয়ই থাকবি।"

আমি ব্যর্থতার বেদনায় জর্জরিত হ'য়ে বললাম, "কিন্তু কমল, আমি তো তার কাছে কোন দাবী করিনি, আমি তো তার ভালবাসার রাজদরবারে শুধুমাত্র আবেদন করেছিলাম। তবে কি অরুন্ধতি আমার চিঠির যথার্থ মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি?"

কমলের যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, ক্ষিপ্ত হ'য়ে বলল, "না অরুপদা, এ আপনার ভুল ধারণা, চিঠির মর্ম উপলব্ধি করার ওর যথেষ্ট জ্ঞান আছে, আসলে কি জানেন এটাই হয়ত ওর জীবনের একটা মস্তবড় 'ট্রাডিশান'। এটাই হয়ত ওর জীবনে আদর্শের মহত্ব।"

অশ্রুজড়িত কণ্ঠে বললাম, "কমল, ভবিষ্যতে অরুন্ধতির সম্বন্ধে কোন কথা জানতে চেয়ে তোমাকে আর বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলব না, এটুকু বিশ্বাস অন্তত রেখো। আর সর্বোপরি এই যে, সম্পর্কের যে বন্ধনে করেছি তোমায় আবদ্ধ আমাদের অবিচ্ছিন্ন বন্ধন যেন চিরমলিন, শাশ্বত হ'য়ে থাকে।"

কমলের চোখে মুখে সমবেদনা, নীরব ভাষা স্পষ্ট। আমার সঙ্গে কথা বলার তার সব প্রয়োজন যেন ফুরিয়ে গেছে, তাই শান্ত ধীর কণ্ঠে বলল, "আজ তাহলে আসি অরুপদা।"

আমি মাথা নেড়ে নীরব মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করলাম। কমলের চলে যাওয়া পথের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। আমার অযাচিত আশাচিত অসংযত অশ্রুধারা চোখের কোল বেয়ে টপ্ টপ্ করে রুক্ষ ধরার ধূলায় ঝরে পড়তে লাগল। শুষ্ক ধূলিকণায় আমার বেদনার অশ্রু নিমেষে শুকিয়ে যেতে লাগল।

আমার বুকভরা আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাধের স্বপ্ন, স্বর্গ আজ অরুন্ধতির নির্মম, নিষ্ঠুর উপেক্ষায় চূর্ণ-বিচূর্ণ। অরুন্ধতির উদ্দেশ্যে মনে মনে বললাম, হে মহিয়সী, গরবিনী, তোমার নির্ভুল সিদ্ধান্তের কাছে আমার অভিযোগ, নালিশ তোপে উড়ে যাবে। এ তুমি ভালই করেছ। আমার সংকীর্ণ সীমার মধ্যে জগতের বিশালতাকে হয়ত উপলব্ধি করতে পারতে না। তোমার আলো ঝলমল দিবস আমার শীতের আকাশে কুয়াশার অন্তরণে চাপা পড়ে যেত। তুমি হাঁপিয়ে যেতে। নিজের অস্তিত্বকে হয়ত খুঁজে পেতে না।

কিন্তু অরুন্ধতি তোমার শান্ত, স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের অন্তরালে যে কুৎসিত জঘন্য প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে রেখেছ অনির্বান দীপ্ত দীপের শিখায়, তাকে আমি মেনে নিতে রাজী নই— তার ক্ষমাও আমার কাছে নেই। হে মোর সুদূর কল্পলোকের প্রেয়সী, অন্তরের কলুষিত প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করে তার অস্তিত্বকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে যেমন করে ওই দূর দিগন্তের ভালে যে শুভ্র চন্দ্রিমা তার তরল আলোক বিচ্ছুরণে ধরণীকে করে উদ্ভাসিত, উচ্ছ্বাসিত ঠিক তেমন করে হৃদয়ের পবিত্র পুণ্য আলোক বিচ্ছুরণে আর কাউকে করো ধন্য, মুগ্ধ। সে দিনইতোমার অন্তরের বাহিরের সৌন্দর্যের সার্থকতায় বসন্ত বিতানে বনানীর কোন সুদূর শাখা-প্রশাখায় আহত বিহঙ্গ গেয়ে উঠবে গান আনন্দে। শুধু এইটুকু অনুরোধ,, কামনার আগুন জেলে কাউকে ধন্য করতে চেয়ো না, তাহলে বৈশাখী কোন্ অসত্য মধ্যাহ্ন দিনের মত তোমার জীবনও দুর্বিষহ হ'য়ে উঠবে।

পরাজয়ের কঠিন শৃঙ্খলে বন্দী আমি ব্যর্থ প্রেমিক তিমির সুকঠিন কারাকক্ষে বেদনার অশ্রু ঝরিয়ে জীবনের রাঙা প্রভাত কবে কখন আমার অলক্ষ্যে যাবে পার হ'য়ে হয়ত তার সংবাদ কেউ কখনও আমায় দেবে না। সেই স্বর্ণোজ্জ্বল রাঙা প্রভাতের কিরণসুধা হতে বঞ্চিত আমার জীবন কেটে যাবে তোমারই ধ্যান, বন্দনায়।

কারাগৃহের কঠিন জানালা ভেদ করে আমার দৃষ্টিকে ছড়িয়ে দেব নিস্তব্ধ, নিশীথের দূর-দিগন্তের ভালে যেখানে অরুন্ধতি তুমি বিরাজ করবে অম্লান কিরণে।

হে লক্ষ্যহীনা, নিরুদ্দেশা যাত্রী দুর্বার দুরন্তগতিতে দুর্গম, দুস্তর পথ-প্রান্ত ছাড়িয়ে একদিন কোন্ অচিন নগরে হবে উপনীত। প্রতিক্ষায় রত কোন্ তরুণ প্রেমিক জানাবে তোমায় সাদর আহ্বান। তার সৌন্দর্য্য আলোকে অভিভূত হয়ে পরিয়ে দেবে মিলন মণিহার। খুসীর বীণ বাজিয়ে তোমার জানাবে অভিসার।

আমি ব্যর্থ প্রেমিক, তোমার গমন-প্রত্যাগমনের পথের ধারে জীর্ণ কোন গাছের বিশীর্ণ শাখায় ফুটে থাকব অনাদরে অবহেলায়। তুমি ঘৃণা আর অবজ্ঞায় বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে নিয়ে অনর্থক গন্ধ নিতে হবে হয়ত একটু সময়ের জন্য উৎসুক। গন্ধহীন পুষ্পের না পেয়ে সৌরভ মাটির বুকে আছড়ে ফেলে দিয়ে চরণে দেবে তাকে দলে পিষে। হে প্রেয়সী সেদিন আমার কাঙাল হৃদয় তোমার চরণতলের করুণা স্পর্শে ধন্য, মুগ্ধ হয়ে অবশেষে ধরণীর রুক্ষ বিশুষ্ক ধুলায় আমার চিরসমাধি হয়ে যাবে। সেই আশা, সেই আকাংক্ষা নিয়েই থাকব মুহূর্ত্তের প্রতিক্ষায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাষা ও শিক্ষা নীতি---কেন এই প্রতিবাদ

কানাইলাল দত্ত

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন করেছেন। তার ফলে কয়েকটি বিশেষ সংরক্ষিত বিদ্যালয় ভিন্ন অন্য সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজি থাকছে না। মাধ্যমিক পর্যায়ে সংস্কৃত উঠে গেল এবং স্নাতক স্তরে ভাষা 'আবশ্যিক ঐচ্ছিক' হলো। 'আবশ্যিক ঐচ্ছিক' এই যুগ্ম শব্দের ব্যবহার নতুন। এর আক্ষরিক অর্থের দ্বারা বিষয়টি স্পষ্টরূপে বোঝা যায় না। শব্দযুগলের মর্মার্থ হলো, স্নাতক পর্যায়ের পাঠ্যসূচীতে ভাষা বিষয়টি (সাহিত্য নয়) অবশ্য পাঠ্যরূপে রেছে নিতে হবে কিন্তু তার অধ্যয়নের উৎকর্ষ অপকর্ষ পরীক্ষার ফলের উপর বর্তাবে না। সাহিত্য পাঠ সম্পূর্ণরূপে অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়েছে।

সরকার পক্ষ বলছেন এটাই শিক্ষার বিজ্ঞান সম্মত নীতি। এর দ্বারা গুণগত তথা পরিমাণগত ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটবে এবং সর্বস্তরের শিক্ষার্থীরা অপ্রয়োজনীয় ভাষা ও সাহিত্য পাঠের ভার মুক্ত হয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়ে সহজেই পারঙ্গম হয়ে উঠবে। সরকারের বাইরে যারা রয়েছেন তারা একেবারে বিপরীত কথা বলছেন। তাদের ধারণা শিক্ষার নব নির্ধারিত পাঠক্রম ও নিয়মের ফলে শ্রেণী বিভক্ত সমাজ আরও বিভক্ত হবে। পড়াশুনার মান, যা ইতিমধ্যে যথেষ্ট নীচু হয়ে গেছে, আরও নেমে যাবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা এবং জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে অচিরেই বিপর্যয়কর অবস্থার উদ্ভব হবে। এই দুই প্রান্তিক মতবাদীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অনুচ্চকণ্ঠ একটি তৃতীয় গোষ্ঠীও বিদ্যমান। তাঁরা মনে করেন সমগ্র বিষয়টিকে ঘিরে রাজনীতি এমনই প্রবলাকারে আবর্তিত এবং উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে যে, মানুষ এখন সত্য অপেক্ষা সমর্থনের প্রতি অধিকতর আগ্রহী হয়ে পড়েছে এবং সমর্থন সহযোগিতা অর্জনের চেয়ে আদায় করে নেবার ফ্যাসিস্ট ঝোঁকটা বড়ই প্রবলাকার ধারণ করেছে। এটা সুস্থ অবস্থা নয়। তাই তারা নীরব থাকাই সমীচীন মনে করেছেন।

নীরবতার দ্বারা অনেক সময় উচ্চারিত কথার চেয়ে বেশি কাজ হয়। আর, কোন দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা স্বাভাবিক অবস্থায় রাজনীতির জালে জড়িয়ে পড়তে চান না। গুরু বশিষ্ঠ, আচার্য শঙ্কর, স্বামী রামদাস কিম্বা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মত ব্যক্তিরা রাজনীতি থেকে নিজেদের দূরেই সরিয়ে রাখেন। কিন্তু মানব কল্যাণের জন্য, তাদের কর্ম ও সাধনা উভয়ই নিবেদিত হয়। আর এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যারা ক্ষমতার আসন থেকে দূরে থেকে তাদের কর্মকৃতির দ্বারা আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে প্রভাবিত করেন, সমাজকে লোক সংগ্রহের কার্যে প্রবৃত্ত করান—। ব্যাস, বাল্মীকি, তুলসীদাস, রবীন্দ্রনাথেরাই এই গোত্রীয় মানুষ। কিন্তু জাতীয় জীবনের সঙ্কট যখন গভীরতর হয়, তখন এরাই এগিয়ে আসেন সঙ্কটত্রানের পথিকৃৎ হয়ে। মহাপ্রভু যেমন প্রেমের ধর্ম প্রচার করেছিলেন, তেমনি হোসেন শা'র অত্যাচার স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। বাঙালীর অস্তিত্ব-সংকট সৃষ্টিকারী বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের প্রয়োজনে গান্ধীজিও এসে দাঁড়িয়েছিলেন রাজনীতির আঙ্গিনায়। এঁরা সঙ্কটত্রাতা। সঙ্কটের অবসানে এরা সর্বদাই স্ব-স্ব কর্মে প্রত্যাবর্তন করে থাকেন। তাই সঙ্কটকালে নীরবতা পালন সমর্থনের নামান্তর বলেই বিবেচিত হয়। এই বিচারে বর্তমান রাজ্য সরকারী শিক্ষা নীতি নিয়ে নীরব থাকা গোষ্ঠীকে সমর্থকদের মধ্যেই গণ্য করতে হয়।

বর্তমান সময়ের দুর্ভাগ্য এই যে, রাজনীতি যারা করেন তাদের হাতেই সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। শিক্ষা-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্যের মত নির্দোষ বিষয়ও এখন আর রাজনীতি বহির্ভূত নয়। আর সেই জন্যই ভাষা-সাহিত্য-শিক্ষা বিষয়ের আলোচনা পর্যালোচনার মধ্যে শান্তচিত্তের সুস্থিরতার পরিবর্তে উত্তপ্ত বিরোধ বিতর্কে সারা দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছে। এই রকম একটা অবস্থার উদ্ভব হতে পারে অনুমান করে বিনোবাজি বহু পূর্বে আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন—শিক্ষার উপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত নয়। জাতির যারা আচার্য তারাই শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করবেন; পাঠক্রম, পাঠ্য বিষয় প্রভৃতি তাদের দ্বারাই নির্ধারিত হবে। কিন্তু সরকার এর ব্যয় নির্বাহ করবেন। স্বাধীনতা সুরক্ষার জন্য বর্তমানে আদালত যে স্বতন্ত্রতা ভোগ করে, শিক্ষা সংস্কৃতির সার্থে সেই একই রকম সুবিধা ও স্বতন্ত্রতা শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রসারিত করতে হবে। কিছুকাল পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক সমাবেশে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় আক্ষেপ করে হতাশার সুরে বলেছিলেন—সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষানীতি যদি বদলাতে থাকে তবে আমাদের ভবিষ্যৎ কোথায়? কেবল সুভাষ বাবুর নয়, সমস্ত চিন্তাশীল মানুষের মনে আজ এ প্রশ্ন খুব বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। আশা করব বিনোবাজির উপরোক্ত মন্তব্যের মধ্যে এই প্রশ্নের সদুত্তর বর্তমান। শিক্ষা জগতের বর্তমান হালচাল দেখে আমার তাই মনে হয়েছে যে, আন্দোলনটা একেবারে মূলে নিয়ে যাওয়া দরকার, অর্থাৎ এটা ভাল ওটা মন্দ তা নয়, আমরা চাই স্বাধীন শিক্ষা। তা হলে আজ যে সব কারণে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক সভাগুলি বাতিল করে তাবেদারি সভায় পরিণত করার সুবিধা আছে সেটাও সঙ্কুচিত হবে।

রাজনৈতিক দলের হাতে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকলে শিক্ষা ক্ষেত্রে দলীয় বিশ্বাস অনুসারী 'মগজ ধোলাইয়ের' আয়োজন রোধ করা যাবে না। সেক্ষেত্রে শিক্ষিত নাগরিক তৈরী অপেক্ষা দক্ষ ক্যাডার তৈরীর প্রতি তারা অধিকতর মনযোগী হবেন। এ বিষয়ে কংগ্রেস-কম্যুনিষ্ট কিম্বা হিন্দু মুসলমান কোন তফাৎ ঘটবে না।

আমাদের রক্তের সঙ্গে একটা অব্যক্ত অনাসক্তি এবং অতলস্পর্শী নিস্পৃহতা মিশে আছে। এ জন্য ব্যবহারিক জীবনে অনেক বৈষয়িক ক্ষতিও আমাদের সহ্য করতে হয়। কিন্তু তার দ্বারা মনোজগতের ঋদ্ধি এবং বৃদ্ধি যে ব্যাহত হয়, সে বিষয়টি আমরা বুঝেও বুঝি না। এর একটা লাভের দিকও অবশ্য আছে, তাতেই বোধ করি ভারসাম্য রক্ষিত হয়। অনাসক্ত চিত্তে সত্য সহজে প্রতিফলিত হয়। সত্যের সেই উপলব্ধি অনেকে অপরের বোধগম্য রূপে ব্যক্ত করতে পারেন না, কিম্বা নিজেদের বোধটা অপরকে জোর করে জানানোর প্রয়োজন বোধ করেন না, আগ্রহীও হন না। অনেক ভাল জিনিসের মত মগজ ধোলাইয়ের অপচেষ্টাও উপেক্ষা উদাসীনতার হাওয়ায় কালক্রমে ভেসে যায়, সত্যানুভূতি অটুট থাকে। এইখানে আমাদের আশ্রয় ও ভরসা। এই রকম কোন ভাবনা থেকেই বোধ করি গান্ধীজি গীতা গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন—অনাসক্তি যোগ।

বিভ্রান্তি এড়াবার জন্য সুরুতেই একটা কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভাষা হলো শিক্ষার বাহন। ভাষার জ্ঞান ছাড়া কোন বিষয়ে প্রবেশ করা যায় না। ভাষাকে তাই শিক্ষার মাধ্যম বলা হয়। সেই জন্য এই আলোচনায় একটু অমনোযোগী হলেই ভাষা শিক্ষা আর শিক্ষার মাধ্যমের ভেদ রেখাটা প্রায়ই অস্পষ্ট হয়ে পড়ে।

মাতৃভাষাতিরিক্ত কোন ভাষা আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ব কি পড়ব না, পড়লে কোন্ শ্রেণী থেকে সুরু করব; মাধ্যমিক স্কুলে সংস্কৃত আরবী শিক্ষা ও স্নাতক শ্রেণীতে ভাষা এবং সাহিত্য পাঠ অপ্রয়োজনীয় কি না এবং শিক্ষায় মান কি হবে এটাই মোটামুটি বিচার্য বিষয়। সর্ব বিষয়ে এবং সর্বস্তরে মাতৃভাষাই যে পঠন-পাঠনের মাধ্যম হওয়া উচিত সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ আছে বলে মনে করি না, তা অবিতর্কিত সত্য রূপে গ্রাহ্য। তবে বর্তমানে বিশ্ব জুড়ে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিস্তার ও উন্নতি ঘটছে এবং তার ফলে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম নির্ণয়ে এই অবস্থাটা এখন আর কোন ক্রমেই উপেক্ষনীয় নয়। উচ্চতম শিক্ষা

ক্ষেত্রে বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারকে অবারিত রাখতেই হবে—তার জন্য যদি প্রয়োজন হয় সেখানে শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা-তিরিক্ত কোন ভাষাই গ্রহণ করতে দ্বিধা বা অমর্যাদার কোন কারণ থাকতে পারে না এই প্রয়োজনীয় ব্যতিক্রমটুকুর উপর নির্ভর করে অনেক অবুঝ মানুষ এবং বহু অভিসন্ধি পরায়ণ ব্যক্তি মিলে যে উচ্চকণ্ঠে তর্ক বিতর্ক বিতণ্ডা সৃষ্টি করেছেন তার দ্বারা ভাষা শিক্ষা এবং শিক্ষার মাধ্যমের মধ্যে পার্থক্যটা প্রায় লুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। আমরাও যাতে অনুরূপ ভ্রমে না পড়ি সে জন্য বিশেষ সতর্ক থাকার প্রয়োজন রয়েছে। নতুবা সত্য সিদ্ধান্ত বিঘ্নিত হতে পারে।

সব মানুষের মধ্যেই কিছু না কিছু সদ্‌গুণ বর্তমান। সুশিক্ষার দ্বারা তার বিকাশ এবং ভাষার মাধ্যমে অর্থাৎ কথাবার্তায় তার প্রকাশ ঘটে। আমাদের শাস্ত্রকারেরা শিক্ষাকে তপস্যা বলেছেন। ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ—এতো বহুশ্রুত বাক্য। এই তপস্যার ত্রিধারা হলো—কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা। গীতা বলেছেন—দেবতা ব্রাহ্মণ গুরুজন ও প্রাজ্ঞগণের পূজা এবং শৌচ সরলতা ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা—এইগুলিকে কায়িক তপস্যা বলে। অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য এবং বেদাদি শাস্ত্র পাঠকে বাচিক তপস্যা বলে। এবং, মনের প্রসন্নতা, সৌম্যভাব, বাকসংযম, মনের নিরোধ, ব্যবহার কালে ছলনারাহিত্য—এই সকলকে মানসিক তপস্যা বলে। এই ত্রিবিধ তপস্যায় যিনি যতটা সিদ্ধি লাভ করেন তাকে ততটা শিক্ষিত বলা যাবে।

চলতি শিক্ষার মধ্যে উপরোক্ত তপস্যার প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি নেই। শিক্ষাটা অনেকাংশে কিছু খবর সংগ্রহ করার ব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়েছে। খবর জানানোর মধ্যে শিক্ষার আয়োজন সীমাবদ্ধ করে তুললে সে শিক্ষা ভার হয়েই থাকে। এর দ্বারা বৈষয়িক প্রয়োজনও বোধ করি পুরো-পুরি মেটে না। জৈবিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিবিধ বিষয়ের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সুবিদিত। তাই তো অনন্ত শক্তির উৎস সূর্য আমাদের শক্তি জোগায়, কর্মে প্রবৃত্ত করে, তার উদয়ের সঙ্গে বিশ্ব জগতের ঘুম ভেঙ্গে যায়, পাখি গান ধরে, ফুল ফোটে, মানুষ কর্মে লিপ্ত হয়। কিন্তু এই সূর্য আমাদের মুগ্ধ করে না, করে চাঁদ। চাঁদ কিন্তু কোন প্রয়োজন মেটায় না। অথচ আমরা সুযোগ পেলেই চাঁদের দেশে ছুটে চলি। চিত্ত মুগ্ধ না হলে দেহ জাগলেও মনটা জাগে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে মনকে জাগাবার কাজটা করে সাহিত্য সঙ্গীত ভাস্কর্য চিত্রকলা প্রভৃতি।

সাহিত্য পাঠের দ্বারা মন জাগে আর সাহিত্যানুশীলনের জাগ্রত মনটি জীবন বিকাশ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। শিক্ষাটা তখন সত্যিকারের বিদ্যায় রূপান্তরিত হয়। সুতরাং সাহিত্য পাঠ বর্জিত শিক্ষার দ্বারা আমরা বর্ণ বা লিপিজ্ঞান সম্পন্ন হয়েও সত্যিকার শিক্ষিত মনের অধিকারী হতে পারি না। গান্ধীশিষ্য গ্রেগ সাহেবের একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন—একজন কৃষক সুন্দর শষ্য উৎপাদন করতে পারলেও তাকে আমরা অশিক্ষিত বলি। এই উৎপাদন কর্মের জন্য তাকে উদ্ভিদ বিদ্যা, মৃত্তিকা, জল-আবহাওয়া ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে অবশ্যই পারঙ্গম হতে হয় তবু তাকে কেন অশিক্ষিত বলব? এর উত্তরও তিনি দিয়েছেন। কৃষক ভাই তার বিদ্যা তথা জ্ঞানটি অপরের বোধগম্য রূপে প্রকাশ করতে অসমর্থ বলেই তাকে আমরা অশিক্ষিত বলি। কথাটার মধ্যে বিতর্কের অবকাশ নেই বললেই চলে। অতএব দেখা যাচ্ছে জ্ঞানটাই যথেষ্ট নয়, পাঁচজনকে বুঝিয়ে বলবার ক্ষমতাটাও বিশেষ প্রয়োজন। এ বিষয়ে সাহিত্যের ভূমিকা তর্কাতীত। কেননা প্রকাশটি সাহিত্য গুণান্বিত না হলে লোকগ্রাহ্য হয় না। ভারতের তথা বিশ্বের যে সব গ্রন্থাদি কালের প্রভাব অতিক্রম করে আজও টিকে আছে সেগুলির প্রত্যেকটিরই সাহিত্যগুণ অপরিমেয়। শুধু মাত্র বিষয়বস্তুর গৌরবে টিকে থাকার ঘটনা একান্তই বিরল। তাই শিক্ষা তখনই পূর্ণ শিক্ষা হবে যখন সেই শিক্ষার ফলশ্রুতি হিসাবে মানব চিত্তের উদ্বোধন ঘটিয়ে সামগ্রিক বিকাশের পথ উন্মুক্ত করবে। সাহিত্য পাঠ ও সাহিত্য প্রয়াস ভিন্ন এর দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই। শিক্ষার কোন স্তর থেকে সাহিত্যকে বিসর্জন দিলে সে শিক্ষা কখনই সম্পূর্ণ শিক্ষা হবে না।

ভাষা ও সাহিত্য অবিচ্ছেদ্য। একের কথা প্রসঙ্গে অপরটিও ছায়ার মত অনুসরণ করে। আলোচ্য বিষয়ে মাতৃভাষার জ্ঞানই যথেষ্ট বিবেচিত হবে। কিন্তু ভারতবর্ষ

বহু ভাষার দেশ। পাশের ষোলটি বিকশিত ভাষার সঙ্গে আড়াই-তিনশ অবিকশিত কিন্তু বেশ সমৃদ্ধ ভাষা রয়েছে। বহু ভাষা প্রচলিত বলে নেহাৎ প্রয়োজনে পড়েও ভারতবাসীকে একাধিক ভাষা শিখতে হয়। নিরক্ষর মানুষও ক্ষেত্র বিশেষে দু-তিনটি ভাষায় কাজ চালাবার মত কথাবার্তা বলতে পারেন। কলকাতার পথে ঘাটে দৃষ্ট পাঞ্জাবী ড্রাইভার-কনডাকটরদের অধিকাংশই নিরক্ষর। কিন্তু তারা হিন্দী, পাঞ্জাবী, উর্দু এবং বাংলা সমান দক্ষতার সঙ্গে বলতে পারেন। এমন আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ভাষা বিষয়ে ভারতবর্ষের বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করে বিনোবাজি আমাদের একটি সুন্দর পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর কথা হলো যে—কেবল মাতৃভাষা জানে তাকে আমি একাক্ষ বলি। মাতৃভাষার উপর রাষ্ট্র ভাষাও যে জানে সে দ্বিনয়ন। যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন সংস্কৃত ভাষাও জানে তকে আমি ত্রিনয়ণ বলি। যারা আমার মত ইংরেজি জানে তাদের চশমা হয়েছে এরূপ বুঝতে হবে।" চশমা হয়েছে মানে তো দৃষ্টি শক্তির প্রখরতা বেড়েছে; দূরের অস্পষ্ট জিনিস সহজে এবং সুস্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হচ্ছে। প্রকারান্তরে এ তো ইংরেজি ভাষারই সমর্থন!

ভাষা সহজাত। মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সম। এ সব কথাই সত্য। তথাপি ভাষা যে শিক্ষনীয় সে কথাও অনস্বীকার্য। উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতিরেকে মাতৃভাষাতে উৎকর্ষ লাভ করা যায় না। যথার্থ ব্যুৎপত্তির জন্য যখন শিক্ষালয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষা নিতেই হচ্ছে তখন সেই সুযোগে এবং সময়ে আরও এক-আধটি ভাষা যদি শিখে নেওয়া যায় তাতো ভালই হবার কথা। এইখানে প্রশ্ন উঠেছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষাতিরিক্ত অন্য কোন ভাষা শেখা উচিত কিনা, সম্ভব কি না? বহু ভাষাভাষী ভারতবর্ষের প্রয়োজনের পথ ধরে একদা সংস্কৃত, পরে ঐতিহাসিক কার্যকরণে ইংরেজি আমাদের দ্বিতীয় বা একমাত্র সর্ব-ভারতীয় ভাষা হয়েছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে হিন্দীকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষার স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সংবিধান চালু হবার ত্রিশ বছর পরেও প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইংরেজিই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষার কাজ করছে। তাই বিনোবা কথিত দ্বিনয়ণ পুরুষদের আজ মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরেজি শেখাটাও অপরিহার্য হয়েই রয়েছে।

ইংরেজিকে অনেকে বিদেশী ভাষা বলে থাকেন। ভাষা বিষয়ে স্বদেশী-বিদেশী আখ্যার সমীচীনতা তর্কাতীত নয়। আবার বিনোবাজির দোহাই পাড়তে হচ্ছে। তিনি গান্ধী বিচার প্রসঙ্গে, মন্তব্য করেছেন—ঐ বিচার যখন কেউ গ্রহণ করে তখন সেটা আর গান্ধী বিচার থাকে না, তার নিজের বিচার হয়ে পড়ে। এই ভাবেই তো ফুলফলাদি যাবতীয় দ্রব্য 'আমার দ্রব্যে' পরিণত হয়। তা যদি হয়, তবে ভাষার বেলায় সেটা হবে না কেন? কোন একটি ভাষা আমার অধিগত হলে সে ভাষা তো আমারই ভাষা হলো। যারা ইংরেজিকে বিদেশী ভাষা বলেন তারা যে এ সত্য অবগত নন তা মনে করি না। কেননা মোরারজী দেশাই প্রধানমন্ত্রী থাকা কালে নেপালী ভাষাকে যখন বিদেশী ভাষা বলে অভিহিত করেছিলেন তখন যারা তার সরব প্রতিবাদ করেছিলেন তাদের অনেকেই ইংরেজি ভাষাকে বিদেশী ভাষা বলছেন। এটা প্রয়োজনের যুক্তি মাত্র, সত্য যুক্তি নয়। জনসাধারণ অনাসক্ত বলে অনেক তথাকথিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এমন পরস্পর বিরোধী কথা বলতে দ্বিধা করেন না। ভারতের ফিরিঙ্গি সম্প্রদায়, নাগা রাজ্যের অধিবাসীবৃন্দ প্রভৃতি অনেকের মাতৃভাষা ইংরেজি। তাদের সংখ্যা ভারতের নেপালী ভাষাভাষী জনসংখ্যার অনেক বেশি। সুতরাং ইংরেজিকে বিদেশী ভাষা বলার এখন সত্যি সত্যিই কোন যুক্তি নেই। এর যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করলে দেখা যাবে হয়তো কেউ একদিন দাবি করে বসেছেন, বাংলাটাও বিদেশী ভাষা। বর্তমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। এবং তারাই সংখ্যাধিক।

ভারতবর্ষে প্রায় দু'শো বছর ধরে সরকারী কাজকর্মে, ব্যবসায় বাণিজ্যে তথা শিক্ষা সংস্কৃতির চর্চায় ইংরেজি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ইংরেজি তুলে দিয়ে সেই শূণ্য স্থানে কোন একটি ভারতীয় ভাষা বসানোর বাস্তব অসুবিধা বিস্তর। ইংরেজি সরিয়ে দিলে সুবিধার চেয়ে অসুবিধা বেশি হয় বলে বিভিন্ন মতাদর্শের সরকারের আন্তরিক চেষ্টা

সত্ত্বেও পশ্চিম বঙ্গের মত ক্ষুদ্র রাজ্যেও সরকারী কাজকর্মে বাংলার ব্যবহার প্রবর্তন করা সম্ভবপর হয় নি। অথচ বাংলা একটি অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা। বঙ্গের বিচ্ছিন্ন অঙ্গে বিনা প্রতিবন্ধকতায় বাংলাই রাষ্ট্রভাষায় স্থান দখল করে নিতে পেরেছে। সে দেশের বাঙালীর মানসিকতা আমাদের চেয়ে ভিন্নতর এমন কোন যুক্তিসিদ্ধ নজীর বা ঘটনা নেই। দু দেশের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য তা হলো পশ্চিম বঙ্গে আরও কয়েকটি ভাষা বর্তমান অপর দিকে বাংলাদেশে বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষা এখন নেই। অন্য ভাষাভাষী-দের দাবি যে কারণেই হোক পশ্চিম বঙ্গে উপেক্ষা করা সম্ভবপর হয় নি। আমরা উত্তর খণ্ডে নেপালী ভাষার অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে। সেখানে নেপালী ভাষা-ভাষী জনতা ভাষা বিষয়ে ইদানিং খুবই স্পর্শকাতর হয়ে পড়েছেন চলতি পৌরসভা নির্বাচনে মনোনয়ন পত্রের ফরম নেপালী ভাষায় মুদ্রিত হয় নি বলে নেপালী ভাষাভাষী অধ্যুসিত এলাকায় কেউ মনোনয়ন পত্রই দাখিল করেন নি। পশ্চিমাঞ্চলের সাঁওতালী ভাষার দাবি মেনে নেবার প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হয়েছে। উর্দু ইতিমধ্যে সুবিধাজনক জায়গায় এসে পড়েছে। পশ্চিম বঙ্গের স্থায়ী অধিবাসিদের মধ্যে ইংরেজি ও অন্যান্য বহু ভারতীয় ভাষাভাষীর সংখ্যা নগন্য নয়। অতএব ইচ্ছে করলেই ইংরেজি বিসর্জন দেওয়া যাচ্ছে না। ইংরেজির পরিবর্তে বাংলাকে সরকারী ভাষা করবার প্রস্তাব থেকেই উত্তরখণ্ডের পৌরসভা নির্বাচনে ফরমের ভাষা নিয়ে মূল নির্বাচন ব্যাপারে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তার চেয়ে দুঃখজনক অবস্থার উদ্ভব হতে পারে সারা দেশ জুড়ে যখন বাংলা একমাত্র সরকারী ভাষা হবে। যে সব অপ্রতিরোধ্য কারণে পশ্চিম বাংলায় ইংরেজি চলছে ঠিক সেই সব কারণেই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এবং কেন্দ্রীয় সরকারী পর্যায়েও ইংরেজি ব্যবহৃত হচ্ছে।

হিন্দী স্বেচ্ছায় ইংরেজিকে স্থান ছেড়ে দেয় নি। হিন্দী ভাষাভাষী বহু প্রভাবশালী নেতা এক সময় কেন্দ্রীয় সরকারী স্তরে ইংরেজি সরিয়ে দেবনাগরী লিপিতে লিখিত হিন্দী বসাতে তৎপর হয়েছিলেন। দেবনাগরী সংস্কৃত ভাষার লিপি। সংস্কৃত এক সময় সারা ভারতের বিদ্বজ্জনের ভাষা ছিল। সেই ঐতিহ্যের সূত্র ধরে লিপি-টির সর্বভারতীয় আবেদন আছে। তা ছাড়া ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে দেবনাগরী লিপি প্রবর্তনের একটা প্রয়াস নানা সময়ে হয়েছিল। বিনোবাজি মনে করেন ভারতের প্রত্যেকটি ভাষার মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ-ষাটটি সংস্কৃত শব্দ আছে। তাই সব ভাষাগুলিকে যদি দেবনাগরী লিপিতে লেখা যায় তা হলে সকলেই সব ভাষা পড়তে পারবে এবং অনায়াসে কাজ চালাবার মত বুঝতেও পারবে। একে তিনি ঐক্য বিধায়ক কর্ম বলে অভিহিত করেন। কিন্তু এ পরামর্শ এখনও সাধারণের নিকট গ্রহণীয় বিবেচিত হয় নি। বিনোবাজির পূর্বে দেখতে পাই বাংলার সারদাচরণ মিত্র মহাশয় 'লিপি বিস্তার পরিষদ' স্থাপন করে একই কাজে ব্রতী হয়েছেন। "দেবনগরী" নামক একটি সাময়িক পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। তার আকাঙ্ক্ষা ছিল "ভাব জগতে একটি মিল থাকা সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষার জন্য এক প্রদেশের বিচার বিবেচনায় অন্য প্রদেশবাসীর লাভ কিছুই হয় না। আমাদের এমন একটি বৃক্ষ রোপন করা উচিত যাতে এক ভাষারূপী সর্বপ্রিয় ফল ফলতে পারে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা একই লিপিতে লেখাই এই আশানুরূপ ফলদায়ক বৃক্ষের অঙ্কুর।"

এত সব সত্ত্বেও দেবনাগরীর আবরণে মোড়া হিন্দী সরকারী সাংবিধানিক অধিকার এবং উদার প্রশাসনিক ও আর্থিক আনুকূল্য সত্ত্বেও ভারতবাসীর নিকট গ্রাহ্য বিবেচিত হয় নি। কেন অর্থাৎ কোন্ দোষগুণে এমন একটা বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা আমাদের ভেবে দেখা দরকার। একটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার কথা মনে পড়ছে। স্মৃতি থেকে লিখছি। সুতরাং সামান্য ইতর বিশেষ হলেও হতে পারে। তবে আশা করি মূল বিষয়ে ঠিক থাকবে।

কেন্দ্রে হিন্দী প্রবর্তনের উপায় ও কার্যক্রম নির্ধারণের জন্য পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনের নেতৃত্বে পার্লামেন্টারি কমিটি অব অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ কমিটি গঠিত হয়। ট্যাণ্ডনজি হিন্দীকে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বাধিক

কাজকর্মের ভাষা করে তুলতে একান্ত আগ্রহী ছিলেন। কেন্দ্রে হিন্দী গ্রাহ্য হলে রাজ্যগুলিতেও আঞ্চলিক ভাষার দাবি স্বীকার করে নিতে হয়। অনেকগুলি রাজ্যে একাধিক ভাষার প্রচলন থাকায় সেখানেও সমস্যা দেখা দেয়। পশ্চিম বঙ্গের সমস্যাটি আমরা ইতিপূর্বে সামান্য আলোচনা করেছি। কয়েকটি রাজ্য বাদ দিলে এটাই মরা ভারতের চেহারা। একাধিক ভাষার স্বীকৃতি দিলেও সমস্যা যে আরও গুরুতর হতে পারে তার সর্বশেষ নজীর বিহার। সেখানে উর্দুকে দ্বিতীয় রাজ্যভাষা করা হলে বিস্তর দুঃখ-জনক ঘটনা ইতিমধ্যেই ঘটে গিয়েছে। এ সত্ত্বেও কেন্দ্রে হিন্দী এবং রাজ্যস্তরে কোন একটি আঞ্চলিক ভাষা মেনে নেওয়া হলে চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভাষাভাষীদের জন্য সুরক্ষা অর্থ কোটা নির্ধারণের দাবি অস্বীকার করার কোন যুক্তি থাকে না। এটাও নাকি ট্যান্ডনজি মেনে নিতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু অহিন্দী ভাষাভাষী রাজ্যগুলি থেকে তখন বলা হয়েছিল যে, বিষয়টিকে এমন একটি সংবিধান স্বীকৃতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যাতে সংশ্লিষ্ট পক্ষের অনুমোদন ছাড়া ভিন্নতর কোন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুযোগ না থাকে। এই দাবির যুক্তিসিদ্ধ পরিণতি কি হতে পারে খতিয়ে দেখতে গিয়ে পৃথক নির্বাচন পর্যন্ত আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম। ইংরেজ প্রবর্তিত পৃথক নির্বাচনের রাজপথ ধরেই তো দেশটা হিন্দুস্থান-পাকিস্থানে ভাগ হয়ে গেল। সে বেদনা তখনও পুরোপুরি ম্লান হয়ে যায় নি। তাই হিন্দীকে পাটরাণী করতে গিয়ে আর একবার দেশ বিভাগের পথটাকে প্রশস্ত করবার ঝুঁকি নেবার মত অনুকূল পরিস্থিতি তখন ছিল না। তাই বিষয়টি তখনকার মত পরিত্যক্ত হয়েছিল।

ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশন কাউনসিল এবং রাধাকৃষ্ণণ কমিশন (শিক্ষা) উভয়েই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উচ্চমানের ইংরেজি এবং হিন্দী শিখবার সুপারিশ করেছেন। ইংরেজির ভালরকম জ্ঞান ছাড়া আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে সুশিক্ষিত ছাত্রছাত্রী-রাও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে (আন্তর্জাতিক তো বটেই) অপাঙক্তেয় হয়ে পড়বে। ভারতবর্ষে এখনও বহু মানুষ আছেন যারা মনে করেন হিন্দী একদিন কালক্রমে ইংরেজির স্থলাভিষিক্ত হবে। হিন্দী ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত রাষ্ট্রভাষা।—কমিশন বা কাউনসিল কারো পক্ষেই কোন সুপারিশ পেশ করার সময় এ তথ্য বিস্মৃত হওয়া সম্ভবপর হয় না। তাই ইংরেজির সঙ্গে হিন্দীর কথাও এসেছে। আমার এই বক্তব্যের সমর্থনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আয়োজিত একটি ওয়ার্কশপের সুপারিশের কথা মাত্র উল্লেখ করব।

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ইংরেজি পঠন-পাঠনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বিবেচনার জন্য উক্ত ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। এর অন্যতম সুপারিশ ছিল—বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য ইংরেজি টেস্ট নেবার ব্যবস্থা করা হোক। অর্থাৎ যারা উপযুক্ত ইংরেজি জ্ঞানের অধিকারী নন তারা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাবেন না। এই ওয়ার্কশপ থেকে আরও বলা হয়েছিল যে, বি, এ, বি, কম এবং বি,এসসিতে ইংরেজি আবশ্যিক বিষয় হিসাবেই পড়ানো হোক। ইংরেজি, আমরা জানি, কাজের ভাষা জ্ঞানের ভাষা এবং এই ভাষা জ্ঞানের দ্বারা সুযোগ-সুবিধার সিংহদ্বার উন্মুক্ত হয়। এ ছাড়া কার্যকারণে এমন অবস্থায় উপনীত হতে চলেছি যেখানে কেবল মাত্র ভাল ইংরেজি জ্ঞানের অভাবে উচ্চ শিক্ষার দ্বার অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর নিকট রুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা উচ্চ শিক্ষা থেকে ইংরেজি বর্জন করা কোন দিনই সম্ভবপর হবে না। রাশিয়া জাপান চীন প্রভৃতি দেশের নজীর টেনে বলা হয়ে থাকে সে সব দেশে যদি তাদের মাতৃভাষায় উচ্চতম শিক্ষা সম্ভব হয় তা হলে আমাদের দেশে তা হতে পারবে না কেন? ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক দেড়'শ বছর ধরে যে কাঠামোটা আমাদের দেশে গড়ে উঠেছে, তাকে ভেঙে ফেলে নতুন কিছু করার সামর্থ এবং সময় নেই। আজকের পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিত্য নতুন আবিষ্কার এবং প্রয়োগ এত দ্রুততার সঙ্গে ঘটছে যে চোখের পলক ফেলতে ফেলতে নতুনতর ক্ষেত্রে আমরা উপনীত হচ্ছি। টফলারের 'ফিউচার শক' গ্রন্থে এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিম বঙ্গ সরকার বিদ্যালয় এবং কলেজ স্তরে ইংরেজি পঠন-পাঠনের গুরুত্ব হ্রাস করলেও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র

থেকে ইংরেজি সরিয়ে নেন নি। তেমন কোন পরিকল্পনা তাদের আছে বলেও শুনিনি। তা ছাড়া উচ্চ শিক্ষাটির একটা সর্বভারতীয় চরিত্র এবং আন্তর্জাতিক মান রক্ষা করতেই হয়। সে ক্ষেত্রে একক ভাবে রাজ্য সরকার ইংরেজি বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ হবেন না। তাই প্রস্তুতি পর্বের শিক্ষায় ইংরেজির গুরুত্ব হ্রাস পেলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে, সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাবে। উচ্চ শিক্ষায় তাদেরই এক-চেটিয়া অধিকার বর্তাবে যারা অভিভাবকদের অর্থের জোরে ব্যয়বহুল ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়াশুনা করতে সমর্থ হবে। আর এ কথা বোধ হয় বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই ইংরেজি জ্ঞানের দৌলতে সর্বভারতীয় বড় বড় চাকরি-বাকরি গুলিতে এদের একচেটিয়া অধিকার বর্তাবে। এর চেয়ে অধিকতর অনভিপ্রেত অবস্থা আর কিছু হতে পারে বলেও তো অনুমানও করতে পারি না।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার হিন্দী সমর্থন করেন এমন কথা স্পষ্ট করে বলেন নি, যদিও কার্যকারণে সেটাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তবু যেহেতু স্পষ্ট করে বলেন নি এবং বাঙালী সাধারণভাবে হিন্দীর সপক্ষে নয়, সে হেতু ধরে নিচ্ছি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরেজিই সমর্থন করেন। তা যদি হয় তা হলে ভাল করে ইংরেজি শেখা তো আবশ্যিকই হয়ে পড়ে। এখন প্রশ্ন হলো শিক্ষার নতুন নিয়মে অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ইংরেজি শেখা সুরু করে কি সত্যি সত্যি ভাল ইংরেজি শেখা যাবে? সরকার যাই বলুন না কেন আমরা আশঙ্কা করি ষষ্ঠ শ্রেণীতে অর্থাৎ বার বৎসর বয়সে বর্ণমালা শিখতে হলে সে পাঠ কয়েকটি শব্দার্থ জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার সম্ভবনাই বেশি। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে যে, দীর্ঘকাল ধরে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকেই সংস্কৃত শেখাবার ব্যবস্থা রয়েছে। যে ব্যবস্থার দ্বারা শিক্ষার্থীরা কি যথেষ্ট পরিমাণে সংস্কৃত শিখতে পারছেন? মাধ্যমিক পরীক্ষায় বেশ ভাল নম্বর পেয়ে পাশ করে এসেও যথার্থভাবে সংস্কৃত বই পড়তে পারেন বা পড়ে মানে বুঝতে পারেন এমন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা নগন্য। তবে সংস্কৃত যেহেতু জীবিকার ভাষা নয়, দৈনন্দিন প্রয়োজনের ভাষা নয়, যেহেতু অবসর সময়ে ধীরেসুস্থে আগ্রহী জনেরা সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষার ঐ দুর্বল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েও নিজেদের কিছুটা মজবুত করে নিতে পারেন। কিন্তু ইংরেজির ক্ষেত্রে সে সুবিধা নেই। কেননা সেখানে তো প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সময়ও যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং ইংরেজি ভাল করে শিখতে হলে কখন থেকে অর্থাৎ কোন শ্রেণী থেকে এর পঠন পাঠন সুরু হওয়া প্রয়োজন তা বিশেষ যত্নসহকারে নির্ধারিণ করতে হবে। সামান্য ভুল ত্রুটিতে বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে।

পশ্চিম বঙ্গ সরকার একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে বোঝাতে চেয়েছেন ইংরেজিতে অগ্রসর বলে পরিচিত রাজ্য গুলিতেও একেবারে গোড়া থেকে ইংরেজি পড়ানো হয় না। এর যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলব না, যদিও ৩০শে মার্চের গণদাবী পত্রিকায় লেখা হয়েছে "আমাদের দেশে ৯টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল সহ ৩০টি রাজ্যের মধ্যে ২৩টি রাজ্যে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা সহ ইংরেজি ভাষা অবশ্য পাঠ্য হিসাবে শিখানো হয়।" কারণ এটা বাহ্য ব্যাপার। কেননা তথাকথিত ইংরেজিতে অগ্রসর বলে চিহ্নিত রাজ্যগুলিতে শত শত ইংরেজি মাধ্যম সাধারণ ও মিশনারী স্কুল রয়েছে। সে সব স্কুলে সুরু থেকেই ইংরেজি পড়ানো হয় আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলা দরকার। সর্ব-ভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক চাকরি ও বৃত্তির একটা বড় অংশ ঐ সব স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ভাগ্যেই জোটে। সমাজ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাদের কৃতিত্বে উজ্জ্বল। এই সব দেখে শুনে হিন্দী এলাকাতেও এখন ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের সংখ্যা দ্রুত হারে বাড়ছে। সে স্কুলের অনেক-গুলিই হয়তো ব্যবসায়িক বুদ্ধি ও উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত হয়। তা সত্ত্বেও সেখানে তো উপচে পড়া ভিড় হচ্ছে। শ্লেষাত্মক কথা দিয়ে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি এই আগ্রহ উপেক্ষা করার মধ্যে সদ্বিবেচনা কিম্বা সুবুদ্ধি নেই। বিপদের মুখে ক্লান্ত হরিণের চোখ বন্ধ করে বাঁচবার ব্যর্থ প্রয়াসের সঙ্গেই মাত্র এর তুলনা হতে পারে। চলতি স্কুলগুলিতে ভাল করে ইংরেজি পড়ানোর ব্যবস্থা

করাই হলো এর একমাত্র প্রতিকার। সেটা হলে লেখা-পড়াও ভাল হবে, প্রতারকেরা মুনাফা কুড়োবার বেশি সুযোগ পাবে না এবং জনসাধারণও প্রতারিত হবেন না।

শৈশবে মাতৃভাষা ছাড়াও দ্বিতীয় একটি ভাষা শিক্ষার চাপে আসল বিদ্যাটাই বিঘ্নিত হয়—পশ্চিম বঙ্গ সরকার প্রধানতঃ এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ইংরেজি প্রত্যাহার করে নেবার ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হয়েছেন। শিক্ষা বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে একমত নন। শিশুকালটা নতুন কিছু আয়ত্ত কররার সর্বোত্তম সময় এ কথাটা সকলেই স্বীকার করেন। তবে কেউ কেউ এর সঙ্গে একটি শর্ত জুড়ে দিয়ে বলেন যে, শিশুর পরিচিত পরিবেশের মধ্যে যা থাকে সেটাই মাত্র সে সহজে শিখতে পারে। কানে শুনে শেখার বেলায় এটা সত্য হলেও বই পড়ে শেখার ক্ষেত্রে তা পুরোপুরি গ্রাহ্য হবে কেন? বিড়ালকে যে অঞ্চলে মেউর বলা হয় সেখানকার ছেলেমেয়েদের তো বই পড়তেই বিড়াল আরম্ভ করতে হয়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেরই ছেলেমেয়েদের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য একটি ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা আছে। সোভিয়েট রাশিয়ার যে সব রিপাবলিকের ভাষা রাশিয়ান নয় সেখানকার ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক স্তর থেকেই রাশিয়ান আবশ্যিক পাঠ্য। চীনেও শুনেছি প্রাথমিক স্তরেই একটি বিদেশী ভাষা শেখানো হয়। আমাদের রাজ্য সরকার ঐ সব দেশের বিধি ব্যবস্থার সমর্থক ও অনুরাগী বলেই দুটো সমাজ-তান্ত্রিক দেশের কথাই মাত্র উল্লেখ করলাম। প্রাচীন ভারতবর্ষে মাতৃভাষার সঙ্গে সংস্কৃত পড়ানো হতো।

অন্যান্য বিষয় শিক্ষা থেকে ভাষা শিক্ষাকে পৃথক করে দেখতে হবে। কারণ পূর্বেই বলেছি ভাষা জ্ঞানের উপর অন্যান্য বিষয় শিক্ষা নির্ভর করে। এই জন্য পঠন পাঠনের সময়টার বেশির ভাগ ভাষা শিখবার জন্য নির্দিষ্ট থাকে। ইংরেজি বা মাতৃভাষা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা অন্তর্হিত হলে এই ব্যবস্থার তারতম্য ঘটানো যাবে না। শিক্ষার্থীরা তাদের মেধা অনুসারে প্রায় একটা গড়পড়তা নম্বর পেয়ে থাকে। ভাষায় যারা দশ-পনের পায় তারা অন্যান্য বিষয়েও যে খুব ভাল করে না তা তো আমাদের নিত্যকার অভিজ্ঞতা। ভাষাটা একবার রপ্ত হয়ে গেলে তখন বিষয় শিক্ষাও সহজ হয়ে যায়। সেই জন্য শিক্ষার সুরুতে ভাষার উপর অধিক গুরুত্ব এবং মনোযোগ দিতে হয় এবং শেষের ধাপে সাহিত্য এবং বিষয়ে। তাই ভাষা শেখা কঠিন এবং অঙ্ক কিংবা ইতিহাস শেখা সহজ এমন কথার কোন যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তি নেই। কঠিনতার দোহাই দিয়ে ইংরেজি শিক্ষার ইতি ঘটানোর মধ্যেও তাই কোন সত্য নেই।

শিক্ষার ত্রিধারার মত অঙ্গও তিনটি। শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং শিক্ষনীয় বিষয়। শিক্ষনীয় বিষয়টি যদি শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহের সঞ্চার করে তা হলে শেখাটার দুরূহতা কমে যায়। শিক্ষার্থী পরিশ্রমশীল হলে মেধার তারতম্য সত্ত্বেও শিক্ষাটা দ্রুত এবং গভীর হয়। সর্বোপরি শিক্ষক হৃদয়বান এবং অভিজ্ঞ হলে শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করে। আদর্শ শিক্ষক হতে হলে বড় বড় ডিগ্রীটাই সব নয়। সবরমতী আশ্রমে গান্ধীজি একবার ডিগ্রীহীন গঙ্গাবেনকে ইতিহাসের শিক্ষিকা নিযুক্ত করেন। গঙ্গাবেন সঙ্কোচ প্রকাশ করলে গান্ধীজি বলেছিলেন—ইতিহাস কি? পূর্বজন্মের নরনারীর অভিজ্ঞতাটাই এই প্রজন্মের মানুষের নিকট ইতিহাস। অভিজ্ঞতা উপলব্ধির ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তার ভিত্তিটি যদি সত্য হয় উদ্দেশ্যটা যদি সেরা হয় তা হলে সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি অতিক্রম করে সর্বিক কল্যাণে সুনিশ্চিত উত্তরণ ঘটে।

শিক্ষার এই তিন অঙ্গের কোনটি শিথিল বা রুগ্ন হলে সমগ্র শিক্ষা ব্যাপারটা যাতে বিপর্যস্ত না হয়ে পড়ে সে জন্যই শিক্ষার ক্ষেত্রে সেবা এবং সত্যের আশ্রয়ের প্রয়োজন সর্বাধিক। সযত্ন প্রয়াস সত্ত্বেও বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্রের পূর্ণতা সম্পাদন করার অন্তরায় অনেক। বিদ্যালয়ে যা কিছু ঘাটতি পড়ে গৃহজীবন থেকে তা পূর্ণ করে নিতে হয়। তাই অনুকূল গৃহজীবনই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার অন্যতম শর্ত। যে গৃহজীবনে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশের অভাব থাকে সেখানকার ছেলেমেয়েদের বিঘ্ন ঘটবেই। এই বিঘ্ন স্বীকার করেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ইংরেজি প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। বিঘ্নটা যদি ভাষা

সম্পর্কে সত্য মানি তবে অন্য বিষয় সম্পর্কে তাকে অসত্য বলি কোন যুক্তিতে? ভাষা সমেত সর্ব বিষয়ের শিক্ষা ব্যাপারে গৃহজীবনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই কেবল-মাত্র ইংরেজি পরিহার করলে নিরক্ষর দারিদ্র্য বাঞ্ছিত পল্লী-গৃহের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষার পথ সুগম করে দেওয়া যাবে এ যুক্তির কোন সত্য ভিত্তি থাকতে পারে না।

আর একটা কথাও এই প্রসঙ্গে সভায় নিবেদন করতে চাই। অনুকূল গৃহজীবন বলতে কেবল সচ্ছল ও শিক্ষিত পরিবারই বোঝায় না। সে গৃহের মাতাকে হতে হবে ভক্ত, পিতা যোগী। কথাটা শুনে অনেকে শিউরে উঠবেন, কেউবা মুচকি হাসবেন তা অনুমান করতে পারি। তাদের নিকট আমি গীতার ভক্ত লক্ষণটি (দ্বাদশ অধ্যায়) পড়ে দেখবার প্রার্থনা করব। আর যোগী? গীতাই বলেছেন যোগঃ কর্মসু কৌশলম্। কঠিন কিছু ব্যাপার বলে মনে করার কারণ নেই। শ্রদ্ধাময়োয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ। মানুষ শ্রদ্ধাময়, কারণ যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত তিনি সেইরূপই হন। আর যোগ থেকে ভ্রষ্ট হলেও শুচিনাং শ্রীমতাং সেহে...জান হবে। এই হচ্ছে একমাত্র পথ যে পথে চললে সকলেই আদর্শ সন্তানের আনন্দময় পিতা মাতা হতে পারবেন এবং সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা তখন আর তেমন কোন জটিল সমস্যা বলে বিবেচিত হবে না।

সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ইংরেজি লুপ্ত হলেও কয়েক শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ইংরেজি থাকছে। দু রকম ব্যবস্থার কুফল অনেক। তার সামান্য একটু উচ্চশিক্ষা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। পূর্ণ আলোচনার অবকাশ নেই এই প্রবন্ধে। ইংরেজি যারা গোড়া থেকেই পড়বে অন্যেরা অর্থাৎ যারা পড়বে না তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কিছুতেই পেরে উঠবে না। কিছুকাল পূর্বে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজি রেখে কেবল মাত্র বুনিয়াদি বিদ্যালয়গুলি থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়া হয়েছিল। ঐ সময়কার ইংরেজি বর্জিত বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ ইংরেজি পড়া ছাত্রছাত্রীদের সম্মান নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। পর্যন্ত ইংরেজি জ্ঞানের অভাবে বহুজনের পড়াশুনা মধ্য পথে থেমে গিয়েছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে পরিস্থিতি এমনই বিপর্যয়কর হয়েছিল যে, সরকার ইংরেজি বর্জন নীতি থেকে সরে আসতে বাধ্য হন এবং বুনিয়াদি বিদ্যালয়গুলিতে আবার ইংরেজি পঠন-পাঠনের নির্দেশ জারি করা হয়। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা চোখের সামনে থাকতে সরকার আবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একাংশ থেকে ইংরেজি তুলে দিতে কেন বদ্ধপরিকর তা আমরা অনুমান করতেও পারি না।

ইংরেজিতে ফেলের সংখ্যা বেশি। তার কারণ অনুসন্ধান এবং প্রতিকার অবশ্যই প্রয়োজন। তা না করে পড়াটা বন্ধ করে দেওয়া কিম্বা পাশের নম্বর হ্রাস করে শিক্ষার মান নীচু করা প্রভৃতি ব্যবস্থার ধারাটা আসল শিক্ষাটাকেই বিকলাঙ্গ করে তোলা হয়। তখন সেই শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ যথার্থ শিক্ষিত বলে বিবেচিত হন না। অপর দিকে খুব সহজে প্রায় পড়াশুনা না করে পাস করে আসার ফলে বাস্তব জীবনের কঠিনতার সামনে পড়ে সেই সব পাস করা ছেলেরা হাবুডুবু খায়। সমাজে অর্ধশিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সেই লিটল লার্নিংয়ের ডেঞ্জারাস থিংগসে সমাজ ভরে ওঠে। তাদের প্রভাবে 'শুষ্কং কাষ্ঠং' আর 'নীরস তরুবরে' রূপান্তরের অবকাশ পায় না। ভাষার প্রসাদগুণ, শব্দের মাধুর্য এমন শুদ্ধ বানান পর্যন্ত এমনি করেই অতীতের স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়। আমার এই উক্তির যথার্থতা প্রতিপাদনের জন্য মহাকবি গ্যেটের একটি সুপ্রসিদ্ধ উক্তির মর্ম নিবেদন করলে অন্যকোন কথা বলার প্রয়োজন হবে না। তিনি বলেছেন—সাহিত্যের অবনতি মানেই জাতির অবনমন। এই নিম্ন গতির ক্ষেত্রে দুটোই বেগের সমতা রক্ষা করে চলে।

নিকট অতীতের একটি স্বদেশীয় ঘটনাও এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হবে। ইয়ং বেঙ্গলের যুগে কলকাতায় এই লোক-বিশ্বাস এত প্রবল ছিল যে, হিন্দু কলেজের ছেলেরা আর যাই করুন না কেন মিথ্যাচারী নন। ছেলেদের সকলেই রামতনু লাহিড়ী ছিলেন না। কলকাতার সমাজ তখন বানিয়া বেনিয়ানদের করতলগত। সত্য সেখানে যথেষ্ট সমাদৃত ছিল এ কথা বলা চলে না। সেই অবস্থায় কলেজের ছেলেরা সত্যাশ্রয়ী হবার দুর্লভ গুণ কোথা থেকে পেয়েছিলেন? সাহিত্য, বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্য

দর্শনের গভীর ও মননশীল অধ্যয়নের এবং অনুধ্যানের ফলে এই গুণটি তাদের জীবনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সাহিত্য কেবল নান্দনিক বিষয় মাত্র নয়, জীবনের বিবিধ সদগুণ অর্জনের মুখ্য শক্তিও বটে। জীবনের পরিমিততা, সাম্য দশা, শুভ দৃষ্টি এ সব কল্যাণকর বৃত্তির জননী সৎ সাহিত্য।। সুতরাং সাহিত্য অধ্যয়ন লুপ্ত হলে অনেক সহজ সদগুণ এবং কল্যাণকর বৃত্তি থেকে আমরা বঞ্চিত থেকে যাব বলেই আশঙ্কা করি। আর তার ফলে সমাজ জীবনে নানা দুর্দৈবের অবাধ বিচরণ যে সহজ হবে তা তো বলাই বাহুল্য।

উপরের আলোচনায় যে সব প্রসঙ্গ এসেছে তার অনেক-গুলি সংস্কৃত সম্পর্কেও প্রযোজ্য। সে সবের পুনরাবৃত্তি করব না। একটু সংস্কৃত না শিখলে গীতা বুঝব না, রামায়ণ মহাভারত চণ্ডী পড়তে পারব না, মন্ত্রের অর্থবোধ হবে না। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির প্রসাদ থেকে এমনি ভাবে বঞ্চিত হলে জাতির গৌরব ক্ষুণ্ণ হবে, মানুষের মর্যাদায় বেঁচে থাকবার আরতো কোন অবলম্বন থাকবে না। অনুবাদ দিয়ে এ কাজটি হয় না। তা যদি হতো তা হলে আমাদের ধ্যান জপ বিবাহ শ্রাদ্ধাদির মন্ত্র এতদিনে তর্জমার মাধ্যমে অবশ্যই প্রচলিত হতো। পরন্তু নতুন যে সব মন্ত্র তৈরি হচ্ছে সে গুলিও সংস্কৃত ভাষায় রচিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রামকৃষ্ণ পূজা ও প্রণাম মন্ত্রাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। যারা মন্ত্রগুলির অর্থ বুঝবার মত সংস্কৃত শেখেননি তারাও জপ-তপ করতে করতে 'অনুভূতি-উপলব্ধির দ্বারা নিজের কাজ চালাবার মত একটা অর্থ বুঝে নিতে পারেন। এটাই আমাদের ভক্ত ও যোগী হতে সাহায্য করে। কঠিন বলে বর্জন করতে হবে এ কথা অশ্রদ্ধেয়। নাটোরে প্রাদেশিক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষণ শুনে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন—রবিবাবু, চমৎকার আপনার বাংলা। কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে আপনার চাষাভুষোরা আমাদের ইংরেজির চেয়ে আপনার ঐ ধ্বনি-মাধুর্যমণ্ডিত বাংলা বেশি বোঝেন? রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষ যে ভাষায় বাক্যালাপ করে সে ভাষায় বক্তৃতা করেন নি। সাহিত্য-রস ও মাধুর্য ক্ষুণ্ণ করে ভাষাকে নামিয়ে আনার প্রয়োজনও স্বীকার্য নয়। আজকের বাংলা ভাষা সাহিত্যের ভাষার যে উৎকর্ষ তার পেছনে এই কাঠিন্যের সাধনার অবদান অনস্বীকার্য। তাই সংস্কৃত কঠিন কিম্বা বৈষয়িক প্রয়োজন বহির্ভূত বলে শিক্ষার যে সামান্য সুযোগ ছিল তা কেড়ে নেওয়া ঠিক হবে না। এই সুযোগটুকু সঙ্কোচনের ফলে মহা দুর্দৈব ঘটতে পারে। সংস্কৃত কেবল হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের ভাষা বলে চিহ্নিত করাও সদ্বিবেচনা প্রসূত কিম্বা শুভবুদ্ধি সহজাত নয়। ধর্মগ্রন্থের বাইরে কালিদাস ভবভূতি ভারবি প্রভৃতি বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম প্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সম্পদ তো সংস্কৃত ভাষাতেই বর্তমান। তা ছাড়া ভারতে হিন্দু হওয়া কি এতই অপরাধ যে তার ধর্মশাস্ত্রের ভাষা, তার পূজা-পার্বন, বিবাহ-তর্পণ শ্রাদ্ধের মন্ত্রের ভাষাটুকু স্কুলের পাঠক্রমে স্থান পাবে না। এই অবিবেচনা এবং অসহিষ্ণুতা প্রসূত ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত অচিরকাল মধ্যে সামগ্রিক ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষার নব প্রবর্তিত নিয়মের দ্বারা চলতি কোন সমস্যার সমাধান হয়নি। পরন্তু বহুতর নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। ব্যবস্থাটার মধ্যে জাতির ভিত্তিমূলে আঘাত হানবার যাবতীয় উপাদান বর্তমান। সমাধান আমরা তাকেই বলি যা নতুন কোন সমস্যা সৃষ্টি না করে চলতি সমস্যা মিটিয়ে ফেলে। এই বিচারে সরকারী শিক্ষা এবং ভাষা সাহিত্য অধ্যয়নের নব-প্রবর্তিত নিয়ম সমাধানকারী নয়, সঙ্কট সৃষ্টিকারী, তাই এই বিনম্র প্রতিবাদ।

বেশি লোক যেটা বলেন সেটাই ভাল কিম্বা কল্যাণকর এমন বিশ্বাস অনেক সময় মূঢ়তার নামান্তর মাত্র। সজ্জন মানুষের কথাই সর্বদা গ্রাহ্য হওয়া উচিত। ঋষি ও আচার্যেরাই সজ্জন। নির্বের নিষ্পক্ষ মানুষও সজ্জন বলে স্বীকৃত। অবশিষ্ট মানুষ হয় কোন দলভুক্ত কিম্বা নিস্পৃহ। সচেতন নিস্পৃহতা একদিন অনাসক্তিতে পরিণত হয়ে শক্তির আধার হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু অজ্ঞতা প্রসূত ঔদাসীন্য কিম্বা নির্বোধ সমর্থনের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। দল বা পক্ষভুক্ত মানুষের কাজ

হচ্ছে আদর্শ নামক ইউটোপিয়ার টোপ দিয়ে দল বাড়ানো। এটা দাসত্বের নামান্তর মাত্র। চিরকালই দেখা গিয়েছে যে, দাস মানুষের সম্মতি ছাড়া দাসত্ব কখন স্থায়ী হতে পারে না। আজ তাই অবিশ্বাস্য মনে হলেও এ কথা সত্য বলে মানতে হবে যে, অধিকাংশ মানুষের সম্মতিতে (বিধান-সভায় সরকার পক্ষে অধিকাংশ সদস্য এই হিসাবে বললাম) পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি এবং জীবিকার ক্ষেত্রে এক বিপর্যয়কর নীতি প্রবর্তিত হতে চলেছে। ইতিহাসের যে গতিপথ ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষানীতির ক্ষতিকর পরিবর্তন করেছেন সেই ইতিহাসের আর এক পথ ধরে সজ্জন শক্তির দ্বারা জাতি মঙ্গললোকে উত্তরিত হবেই বলে বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাস আমাকে আতঙ্কমুক্ত রেখেছে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি—

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব
যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব।

হে দেব হে প্রকাশ স্বরূপ বিশ্বের অকল্যাণ দূর করুন। যা কল্যাণময় তাই প্রেরণ করুন।

দীক্ষা

১ ও ১৬ পৌষ

একদিন যাঁর চেতনা বিলাসের আরামশয্যা থেকে হঠাৎ জেগে উঠেছিল—এই ৭ই পৌষের দিনটি সেই দেবেন্দ্রনাথের দিন। এই দিনটিকে তিনি আমাদের জন্য দান করে গিয়েছেন। রত্ন যেমন করে দান করতে হয় তেমনি করে দান করেছেন।...এই ৭ই পৌষের দিনে ভক্ত তাঁর দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন—সেই দীক্ষার যে কত বড় অর্থ আজকের দিন কি সে কথা আমাদের কাছে কিছু বলছে? ...সেই যেদিন তাঁর জীবনে এই ৭ই পৌষের সূর্য একদিন উদিত হয়েছিল সেই দিনে আলোও জ্বলেনি, জনসমাগমও হয়নি—সেই শীতের নির্মল দিনটি শান্ত ছিল স্তব্ধ ছিল। সেই দিনে কী ঘটেছে তা তিনি নিজেও সম্পূর্ণ জানেন নি, কেবল অন্তর্যামী বিধাতাপুরুষ জানছিলেন।...সেই যে দীক্ষা সেদিন তিনি গ্রহণ করেছিলেন সেটি সহজ ব্যাপার নয়। সে শুধু শান্তির দীক্ষা নয়, সে অগ্নির দীক্ষা। তাঁর প্রভু সেদিন তাঁকে বলেছিলেন, এই যে জিনিষটি তুমি আজ আমার হাত থেকে নিলে এটি যে সত্য,—এর ভার যখন নিয়েছ, তখন তোমার আর আরাম নেই, তোমাকে রাত্রিদিন জাগ্রত থাকতে হবে। এই সত্যকে রক্ষা করতে তোমার যদি সমস্তই যায় তো সমস্তই যাক্। কিন্তু সাবধান, তোমার হাতে আমার সত্যের অসম্মান না ঘটে। তাঁর প্রভুর কাছ থেকে সত্যের দান নিয়ে তার পরে তো আর তিনি ঘুমতে পারেন নি। তাঁর আত্মীয় গেল, ঘর গেল, সমাজ গেল, নিন্দায় দেশ ছেয়ে গেল, এত বড় বৃহৎ সংসার, এত মানী বন্ধু, এত ধনী আত্মীয়—সে তাঁর সহায়—সমস্তের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে গেল এমন দীক্ষা তিনি নিয়েছিলেন। জগতের সমস্ত আনুকূল্যকে বিমুখ করে দিয়ে এই সত্যটি নিয়ে তিনি দেশে দেশে অরণ্যে পর্বতে ভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন। এ যে প্রভুর সত্য! এই অগ্নিরক্ষার ভার নিয়ে আর আরাম নেই আর নিদ্রা নেই!... গুরুর হাতহতে সেই যে বজ্রমুদ্যত তিনি গ্রহণ করেছিলেন ...৭ই পৌষের মর্মস্থানে সেই বজ্রতেজ রয়েছে। কিন্তু শুধু বজ্র নয়, শুধু পরীক্ষা নয়, সেই দীক্ষার মধ্যে যে কী বরাভয় আছে তাও দেখে যেতে হবে।...৭ই পৌষের মাঝখানে তাঁর সেই সত্য দীক্ষার রুদ্র দীপ্তি এবং বরাভয়রূপ দুই রয়েছে—সেটি যদি আমরা দেখতে পাই এবং লেশমাত্র গ্রহণ করতে পারি তবে ধন্য হব।...সেই সত্যকে সমস্ত দুঃখ নিপীড়নের মধ্যে স্বীকার করে নিলে তার পরে একেবারে নির্ভয়—ধূলিঘর ভেঙে দিয়ে একেবারে পিতৃভবনের অধিকার লাভ—চিরজীবনের যে গম্যস্থান যে অমৃত-নিকেতন সেই পথের যিনি একমাত্র বন্ধু তাঁরই আশ্রয়প্রাপ্তি, সত্য দীক্ষার এই অর্থ।...এই দিনটিকে যেন আমাদের অন্যমনস্ক জীবনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়ে না রাখি—এঁকে ভক্তিপূর্বক সমাদর করে ভিতরে ডেকে নাও —আমাদের তুচ্ছ জীবনের প্রতিদিনের যে দৈন্য তাকে সম্পদে পূর্ণ কর।

হে দীক্ষাদাতা, হে গুরু, এখনো যদি প্রস্তুত না হয়ে থাকি তো প্রস্তুত কর—আঘাত কর—চেতনাকে সর্বত্র উদ্যত কর—ফিরিয়ে দিওনা—দুর্বল বলে তোমার সভাসদদের সকলের পশ্চাতে ঠেলে রেখো না। এই জীবনে

সত্যকে গ্রহণ করতেই হবে—নির্ভয়ে এবং অসংকোচে। অসত্যের স্তূপাকার আবর্জনার মধ্যে ব্যর্থ জীবনকে নিক্ষেপ করব না। দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে—তুমি শক্তি দাও।

তত্ত্বকৌমুদী—রবীন্দ্রনাথ

শিশুদের একটি নতুন প্রতিষ্ঠান

শিশুদের সুপ্ত মানসিক বৃত্তিগুলোকে জাগিয়ে সেগুলোকে সুষ্ঠু পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা এবং সাধারণ শরীর চর্চার প্রতি তাদের আকৃষ্ট করে তুলে সুস্থ দেহ গঠনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ক'জন শিক্ষিকা সম্প্রতি করিমগঞ্জে 'খেলাঘরে'র পত্তন করেছেন। আশা করা যায় তাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সাধারণের সাহায্যে ও আনুকূল্যে একদিন একটি মহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

এম, এম, এম, সি গার্লস হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে প্রতি বুধ, শনি ও রবিবার বিকাল ৪৷৷০ টায় এই খেলাঘরের আসর বসে। সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, খেলাধূলা প্রভৃতি শিক্ষাদান ও চর্চার ব্যবস্থা সেখানে রয়েছে। শ্রীমতী পদ্মা মজুমদার, শ্রীমতী নিবেদিতা দে, শ্রীমতী সাবিত্রী চক্রবর্তী ও শ্রীমতী লোপামুদ্রা চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে এই আসরগুলো পরিচালিত হচ্ছে।

—ষ্টাফ রিপোর্টার, যুগশক্তি

দিলীপ কুমার রায়ঃ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একমাত্র পুত্র বিখ্যাত গায়ক, সঙ্গীতজ্ঞ, মনীষী বহুমুখী প্রতিভাবান্ লেখক পরম শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার ৬ই জানুয়ারী তারিখে ৮৩ বৎসর বয়সে মহাপ্রয়াণ করেছেন। ১৮৯৭ সালের ২২শে জানুয়ারী তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৩ সালে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ ক'রে উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র হন। ১৯১৮ সালে বি, এস-সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স নিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়তে যান। কিন্তু সেখানে ট্রাইপস্ ও এল-এল-বি পরীক্ষার প্রথমার্ধ পর্যন্ত পড়ে তিনি বিশেষ ভাবে সঙ্গীতচর্চায় মনোনিবেশ করেন এবং ফরাসি, জার্মান, ইতালীয়, রুশ প্রভৃতি বিদেশী ভাষায় সঙ্গীত আয়ত্ত করেন। ১৯২২ সালে স্বদেশে ফিরে তিনি সমগ্র ভারতের সাঙ্গীতিক পরিক্রমা সমাপ্ত ক'রে ভ্রমামাণের দিনপঞ্জিকা নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন তা সঙ্গীতোৎসাহী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯২৭ সালে তিনি দ্বিতীয়বার ইউরোপে যান এবং টমাস আলভা এডিসনের আমন্ত্রণে রেকর্ড করার জন্য তাঁর আমেরিকা যাওয়া স্থির হয়। ইতিমধ্যে রোমাঁ্যা রোলাঁ, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত মনীষী ও দেশনায়কদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম বা 'রোনাল্ড নিক্‌সনের অনুরোধে তিনি শ্রীঅরবিন্দের সান্নিধ্যে এসে তাঁকে গুরুবরণ ক'রে ১৯২৮ সালে স্থায়ী-ভাবে আশ্রম-জীবন বরণ করেন। ১৯৩৭ সালে বালপ্রতিভা উমা বসুর সঙ্গে সঙ্গীত গুরুরূপে তাঁর পরিচয় হয়। গুরু-শিষ্যার গান এদেশের সঙ্গীত জগতে যুগান্তর আনে। অতুলপ্রসাদের গান ও নজরুলগীতি প্রচারে দিলীপকুমারের দান অসামান্য। ১৯৪২ সালে উমা দেবীর মৃত্যুর পর দিলীপকুমার ধর্মজীবনে বিশেষভাবে মগ্ন হন। ১৯৫০ সালে শ্রীঅরবিন্দের লোকান্তরের পর আশ্রমত্যাগ ক'রে তিনি পুনায় হরিকৃষ্ণ মন্দির স্থাপন করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ ক'রে অসামান্য যশস্বী হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি লিট উপাধি দান করেন। ভারত সরকার তাঁকে সাংস্কৃতিক দূতরূপে নিয়োগ করেন ও সঙ্গীত-নাটক আকাদেমির সদস্যরূপে নির্বাচিত করেন। তিনি প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন, পঞ্চাশখানিরও বেশী গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশ করেন। রূপ, ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও সুষমার এমন সমন্বয় এ যুগে আর দেখা যায় নি। তিনি প্রবর্তক পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং সংঘসভাপতি অরুণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে

ঘনিষ্ঠ প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁর দেহান্তর সমগ্র জাতি ও মানব-সমাজের পক্ষে গভীর শোকের বিষয়।

"প্রবর্তক"

তত্ত্ব-বোধিনী সভা

১৮৩৯ খ্রীঃ থেকে ১৮৪২ পর্যন্ত তত্ত্ববোধিনী সভা দেবেন্দ্রনাথের পরিচালনার একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ চালালেও ১৮৪০ খ্রীঃ থেকে 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের' সঙ্গে এর যোগ হয়, এবং উভয় প্রতিষ্ঠান একই পরিচালনার চলতে থাকে। এই প্রথম চার পাঁচ বছরের মধ্যে যাঁরা সদস্য হন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের পরিচয় আলোচনা বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ॥ ইনি ১৮৩৯ খ্রীঃ তত্ত্ববোধিনী সভার যোগদান করেন। গুপ্ত-কবি নামে পরিচিত ছিলেন। পিতা হরিনারায়ণ গুপ্ত। আদি বাড়ী ২৪ পরগণা জেলার কাঁচড়াপাড়ায়। বাল্যকাল থেকে কবিতা ও গান রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। জন্ম ১৮১২ খ্রীঃ মার্চ মাসে। দশ বছর বয়সে কলকাতায় আসেন এবং ব্যঙ্গাত্মক রচনায় তাঁর খ্যাতি হয়। ১৮৩১ খ্রীঃ থেকে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক হন। বহু সভাকবি ও পাঁচালীকারের রচনা তিনি সংগ্রহ করে সংকলিত করেন। প্রথম জীবনে রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন হলেও পরে প্রগতিশীল দলের সমর্থক হন। ১৮৫৯ খ্রীঃ ২৩শে জানুয়ারী তাঁর মৃত্যু হয়।

অক্ষয়কুমার দত্ত ॥ জন্মেছিলেন ১৮২০ খ্রীঃ ১৫ই জুলাই বর্ধমান জেলার চুপী গ্রামে। পিতা পীতাম্বর দত্ত। বিদ্যালয়ের পাঠগ্রহণ বেশীদূর হয়নি কিন্তু সারা জীবনই তিনি পড়াশুনা করে গেছেন। কিশোর বয়সেই সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় এবং হিন্দুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়েছিলেন। ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি বিদেশী ভাষাও আয়ত্ত করেন। ১৮৩৯ খ্রীঃ তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হন এবং কিছুদিন ওই সভার সহ-সম্পাদক ছিলেন। ১৮৪০ খ্রীঃ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন এবং পরের বছর তত্ত্ববোধিনী সভা তাঁর রচিত বাংলা ভূগোল প্রকাশ করেন। ১৮৪২ খ্রীঃ টাকীর প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৬.৮ ১৮৪৩ খ্রীঃ অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' আত্মপ্রকাশ করে। রচনাসম্ভারে ও পরিচালনার গুণে পত্রিকাটি শ্রেষ্ঠ বাংলা সাময়িক পত্রে পরিণত হয়। তিনি বারো বৎসর (১৮৪৩-৫৫) পর্যন্ত অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পরিচালনা করেন। ১৮৪৩ খ্রীঃ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির সঙ্গে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি, তাঁর অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: ধর্মনীতি', 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার', 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার', 'চারুপাঠ' এবং 'বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ'। অক্ষয়কুমার প্রখর যুক্তিবাদী ছিলেন এবং তাঁর সময়েই ব্রাহ্মসমাজ বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস-পরিত্যাগ করেন। ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরোপাসনায় সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষার তিনিই প্রথম প্রচলন করেন।

আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ অধিক পরিচিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ নামে। ১৮১৯ খ্রীঃ জন্ম চব্বিশ পরগণার কোদালিয়া গ্রামে। পিতা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত গৌরহরি চূড়ামণি। পিতার চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষার শুরু। তত্ত্ববোধিনী সভার আনুকূল্যে ১৮৪৪-৪৭ খ্রীঃ পর্যন্ত কাশীতে অথর্ববেদ ও বেদান্তচর্চা করেন। তত্ত্ববোধিনী সভার সহ-সম্পাদক এবং কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য নিযুক্ত হন। ১৮৬৯ খ্রীঃ তত্ত্ববোধিনী সভা উঠে গেলে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহ-সম্পাদক এবং আচার্যরূপে কাজ করতে থাকেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যেমন—'ব্রাহ্মবিবাহ ধর্মশাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ কিনা'? 'বৃহৎকথা' (২ খণ্ড), 'দশোপদেশ', সানুবাদ সংস্কৃত গ্রন্থ 'বেদান্তসার', মহাভারতীয় 'শকুন্তলোপাখ্যান',

'বেদান্তদর্শন', 'বেদান্তদর্শন-অধিকরণমালা' প্রভৃতি। ১৮৭৫ খ্রীঃ ১৬ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় পরলোক গমন করেন।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ॥ ইনি তত্ত্ববোধিনী সভা তথা ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য। ১৭৮৬ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত আভিধানিক ও স্মার্তপণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণের পুত্র। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী রামমোহন রায়ের সন্ন্যাসী-বন্ধু ছিলেন। রামচন্দ্র স্মৃতিশাস্ত্র, উপনিষদ এবং বেদান্ত ও সংস্কৃতে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করে কিছুদিন রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৪. ৫. ১৮২৭ খ্রীঃ সরকার কর্তৃক সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে ১৮৩৭ খ্রীঃ অন্যায়ভাবে পদচ্যুত হন। ১৮৪২ খ্রীঃ সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ লাভ করেন। ১৮১৮ খ্রীঃ বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান সংকলন করেন। অন্যান্য রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'জ্যোতিষ সংগ্রহসার', বাচস্পতি মিশ্রের 'বিবাদ-চিন্তামণি', 'বর্ণমালা', 'নীতিদর্শন', 'শিশুসেবধি'। রামমোহনের বিলাত যাওয়ার পর এক দশকের বেশি সময় ধরে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের কাজ করেছিলেন এবং তিনিই প্রথম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ ২১ জনকে 'ব্রাহ্মধর্ম' মতে দীক্ষা দান করেন। ১৮৪৫ খ্রীঃ ২রা মার্চ কাশী যাওয়ার পথে মুরশিদাবাদে প্রয়াত হন। দরিদ্র অধ্যাপক সঞ্চিত পাঁচশ' টাকা মৃত্যুকালে ব্রাহ্মসমাজকে দান করে যান।

রমাপ্রসাদ রায় ॥ ১৮১৭ খ্রীঃ জুলাই মাসে জন্ম। রাজা রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র। পৈতৃক নিবাস রাধানগর, কিন্তু কলকাতায় জাত। রমাপ্রসাদ অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল, প্যারেন্টল অ্যাকাডেমী ও হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন। পিতার মতই সংস্কৃত ও ফারসীতে জ্ঞান ছিল। ১৮৩৮ খ্রীঃ ডেপুটি কালেকটারের চাকরী পান এবং ১৮৪৫ খ্রীঃ সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করার জন্য পদত্যাগ করেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর অবসর গ্রহণ করলে তাঁর স্থলে ১৮৫০ খ্রীঃ রমাপ্রসাদ সরকারী উকিল হন। ১৮৬১ খ্রীঃ লিগ্যাল রিমেম্ব্রেন্সার ও ১৮৬২ খ্রীঃ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন এবং ঐ বছরই হাইকোর্টে প্রথম ভারতীয় বিচারকের পদ লাভ করেন। কিন্তু কর্মভার গ্রহণ করার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়; ফলে প্রথম ভারতীয় বিচারক হন পরবর্তীকালে শম্ভুনাথ পণ্ডিত। সর্বতত্ত্বদীপিকা সভার সভাপতি ও তত্ত্ববোধিনী সভার সক্রিয় সদস্যরূপে বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর ছিলেন রমাপ্রসাদ। নারীশিক্ষায় অগ্রণী হিসেবে বেথুন সোসাইটির দেশীয় স্ত্রীশিক্ষা-শাখার সভাপতি হন। বিধবা-বিবাহ ও বহুবিবাহ-বিরোধী আন্দোলনে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। তাছাড়া ১৮৫৭ খ্রীঃ তিনি বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের নিকট আবেদন পত্র পেশ করেছিলেন। ১৮৬২ খ্রীঃ ১লা আগস্ট পরলোক গমন করেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ॥ ১৮২২ খ্রীঃ ১৬ই ফেব্রুয়ারী ২৪ পরগণা জেলার শুড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জন্মেঞ্জয় মিত্র। রাজেন্দ্রলাল মিত্র আমাদের দেশে বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস চর্চার পথিকৃৎ, পুরাতত্ত্ববিৎ, সমালোচক ও প্রাবন্ধিক। কলকাতার হিন্দু ফ্রি স্কুল, মেডিকেল কলেজ প্রভৃতি বিদ্যায়তনে শিক্ষালাভ করে তিনি আইন পাঠ করেন এবং হিন্দী, ফারসী, সংস্কৃত, উর্দু ভাষায় প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেন। ১৮৪৬ খ্রীঃ এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন; তারপর কখনো সহসভাপতি, কখনো সম্পাদক এবং শেষে সভাপতি-রূপে (১৮৮৫) এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৪৩ খ্রীঃ রাজেন্দ্রলাল তত্ত্ববোধিনী সভার একজন বিশিষ্ট সভ্য এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিষয়-নির্বাচনী কমিটির সদস্য। বাস্তবিক পক্ষে রাজা রাজেন্দ্রলাল সে-যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের মধ্যে একজন এবং সংক্ষেপে তাঁর পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' এবং 'রহস্য-সন্দর্ভ' পত্রিকা তাঁর অনবদ্য কীর্তি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। ...তিনি একাই একটা সভা।" ১৮৯১ খ্রীঃ ২৬শে জুলাই পরলোকগত হন।

রামতনু লাহিড়ী ।। নদীয়া জেলার বারুইহুদা গ্রামে ১৮১৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পূতচরিত্র এই ব্যক্তির কথা আমাদের মনে গাঁথা হয়ে আছে শিবনাথ শাস্ত্রীর অনবদ্য রচনা—'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে। হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর ছাত্র। কর্মজীবনে সরকারী শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করে প্রথমে হিন্দু কলেজ, পরে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল, বর্ধমান স্কুল, উত্তরপাড়া স্কুল বারাসত স্কুল এবং বরিশাল জেলা স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করেন। সামাজিক ব্যাপারে রামতনু বিশেষ প্রগতিশীল ছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে তিনিই প্রথম উপবীত ত্যাগ করেন। ১৮৯৮ খ্রীঃ ১৮ই আগষ্ট তাঁর মৃত্যু হয়।

রাজনারায়ণ বসু ।। রামমোহনের বন্ধু নন্দকিশোর বসুর পুত্র রাজনারায়ণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম স্মরণীয় চরিত্র। ১৮২৬ খ্রীঃ ৭ই সেপ্টেম্বর চব্বিশ পরগণার বোড়ালে জন্মগ্রহণ করেন। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজের খ্যাতনামা ছাত্র। অসবাস্থ্যের জন্য কলেজ ত্যাগ করে উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদকরূপে তত্ত্ববোধিনী সভায় ১৮৪৬—৪৯ খ্রীঃ কাজ করেন। ১৮৪৯ খ্রীঃ সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শিক্ষক এবং ১৮৫১ খ্রীঃ মেদিনীপুরে জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন এবং ১৮৬৮ খ্রীঃ সরকারী কর্ম থেকে অবসর নেন। স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদের তিনি একজন প্রধান প্রবক্তা ছিলেন এবং তাঁকে Father of Indian Nationalism বলা হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে—'আত্মচরিত', 'সেকাল আর একাল', 'হিন্দু বা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।' তিনি ইংরেজীতে আদি ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ক অনেক গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ ১৮ই সেপ্টেম্বর তিনি পরলোকগত হন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন রাজনারায়ণ বসু।

চন্দ্রশেখর দেব ।। ইনি রামমোহন রায়ের আদি শিষ্যমণ্ডলীর অন্যতম। জন্ম ১৮১০, হুগলী জেলার কোন্নগরে। হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং সরকারী ডেপুটি কালেক্টার ছিলেন। ১৮২৮ খ্রীঃ আগষ্ট ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনায় তিনি রামমোহনের বিশেষ সহযোগী ছিলেন। পৌত্তলিকতা বিরোধী এবং স্ত্রীজাতির মুক্তিকামী চন্দ্রশেখর শিক্ষাবিস্তারেও বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। Hindoo Benevolent Institution এ তিনি বহু অর্থ দান করেন। খ্রীস্টান মিশনারীদের প্রভাব এড়ানোর জন্য তিনি রাধাকান্ত দেবেরও সাহায্য নন। Hindu Charitable Institution-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। চন্দ্রশেখর রাজনীতি সচেতন ছিলেন এবং ১৮৪৩ খ্রীঃ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপনে রামগোপাল ঘোষ এবং জর্জ টমসনের সঙ্গে একত্রে উদ্যোগী হন। ১৮৫১ খ্রীঃ 'জ্ঞানোদয়' সংবাদপত্র সম্পাদনা করেন। 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র ইনি অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৮৯ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যু হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ।। ঊনিশ শতকের এই হিউম্যানিষ্ট পণ্ডিতকে দু-চার কথায় বর্ণনা করা বা তাঁর জীবন কথা বলা সম্ভব নয়। মাইকেল মধুসূদন বলেছিলেন 'The ganius and wisdom of an ancient Indian sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother.' জন্ম মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ১৮২০ খ্রীঃ ২৬ সেপ্টেম্বর, মৃত্যু ১৮৯১ খ্রীঃ ২৯ জুলাই। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্রের প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।' ধর্ম বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র উদার ভাবাপন্ন ছিলেন এবং সমাজ-সংস্কার আন্দোলন তাঁর জীবনের মুখ্য কর্ম ছিল। তত্ত্ববোধিনী সভা এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও তার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ যখন তত্ত্ববোধিনী সভা উঠে যায় তখন এর সম্পাদক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন ও স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন এবং বহুবিবাহ-রোধ এই তিন কর্ম তাঁর ঈপ্সিত ছিল। বোধোদয়, কথাপরিচয়, সীতার বনবাস, শকুন্তলা, বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। সর্ববিষয়ে বিদ্যাসাগর যে উদারচেতা ও প্রগতিশীল ছিলেন তা সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি শিক্ষার

প্রবর্তন, গণিতে ইংরেজি ব্যবহার, দর্শনে পাশ্চাত্য যুক্তি-বিদ্যার প্রবর্তন, সংস্কৃত কলেজে অ-ব্রাহ্মণ ছাত্রদের প্রবেশাধিকার দান, বেদান্ত ও সাংখ্যকে ভ্রান্ত দর্শন বলা প্রভৃতির মধ্যে সহজেই বোঝা যায়।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়॥ ১৮২৭ খ্রীঃ ২২শে ফেব্রুয়ারী জন্ম। পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও লেখক। সংস্কৃত কলেজ এবং হিন্দু কলেজের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ কলকাতা সরকারী শিক্ষা-বিভাগে যোগদান করার পর ধীরে ধীরে রীতিমত উন্নতি করেন এবং ১৮৮৩ খ্রীঃ হাণ্টার কমিশনের সদস্য থাকাকালীন অবসর গ্রহণ করেন। শিক্ষাদর্পণ এবং এডুকেশন গেজেট নামক দুইটি শিক্ষা বিষয়ক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থ এবং বহু পাঠ্যপুস্তক তিনি রচনা করেন। বাংলা ভাষায় ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থও তিনি লিখেছেন। যদিও ভূদেব গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, তবু তিনি সংস্কার পছন্দ করতেন এবং উন্নতিশীল হিন্দুধর্ম তাঁর কাম্য ছিল। ভূদেব তত্ত্ববোধিনী সভার একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। তাঁর বাংলার ইতিহাসে তিনি এই সভার বিশেষ প্রশংসা করেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ ১৫ই মে তাঁর মৃত্যু হয়।

কিশোরীচাঁদ মিত্র॥ ১৮২২ খ্রীঃ ২২শে মে কলকাতায় জন্ম। পিতা রামনারায়ণ মিত্র। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র। ইয়ংবেঙ্গল দলের সভ্য। সরকারী কর্মচারী ছিলেন, পরে কালাকানুনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করায় কর্মচ্যুত হন। নানা জনহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রথমে 'ইণ্ডিয়ান' কিন্তু, পরে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'হিন্দু-থিও-ফিলানথ্রপিক সোসাইটি' ও 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বঙ্গের ভূম্যধিকারী পরিবারবর্গের ইতিবৃত্ত বিষয়ে বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধও লেখেন। তাঁর রচনা-নৈপুণ্যের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় 'ক্যালকাটা রিভিও' পত্রিকার 'রামমোহন' বিষয়ক প্রবন্ধে। স্বাজাত্যবোধের পরিচয় দেন রাজনীতিতে নানা সময়ে। কিছুদিন এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'মেমোয়ার অফ দ্বারকানাথ ঠাকুর' তাঁর অপর বিখ্যাত গ্রন্থ। সামাজিক সংস্কার এবং ধর্ম-সংস্কার বিষয়ে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ ৬ই আগস্ট প্রয়াত হন।

প্যারীচাঁদ মিত্র॥ ইনি উনিশ শতকের কলকাতার এক বিশিষ্ট ব্যক্তি। ১৮১৪ খ্রীঃ ২২শে জুলাই জন্ম কলকাতায় এবং মৃত্যু ১৮৮৩ খ্রীঃ ২৩ নভেম্বর। পিতা রামনারায়ণ মিত্র। ডিরোজিও শিষ্যমণ্ডলীর অন্যতম। কর্মজীবনে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর (যা পরে ইম্পিরিয়াল ও কালক্রমে আজকালকার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে পরিণত হয়েছে) গ্রন্থাগারিক। বাংলা, ফারসী ও ইংরেজি ভাষায় তাঁর সমান দক্ষতা ছিল এবং বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই তিনি রচনার জন্য খ্যাত ছিলেন। তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় মহিলাদের হিতকরী 'মাসিক পত্রিকা' সম্পাদন। 'আলালের ঘরের দুলাল' তাঁর বিখ্যাত রচনা। আরও বহু গ্রন্থের রচয়িতা। কৃষক শ্রেণীকে শোষণের বিরুদ্ধে এবং পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ উল্লেখযোগ্য। ধর্ম-বিশ্বাসে প্রথম জীবনে ব্রাহ্মভাবাপন্ন, পরে থিয়োসফি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। পাদ্রী জেমস্ লঙ্ তাঁকে 'চার্লস ডিকেন্স্ অফ বেঙ্গল' বলতেন। সারা জীবন বহু সভাসমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শিবচন্দ্র দেব তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং উভয়ে প্রেততত্ত্ব বিষয়ে বহু আলোচনা করেন এবং গ্রন্থ লেখেন।

তারাচাঁদ চক্রবর্তী॥ (১৮০৬-১৮৫৭) ডেভিড হেয়ার স্কুল থেকে ফ্রী স্কলার হয়ে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। অর্থাভাবে পড়াশুনা শেষ করতে না পারলেও, হিন্দু কলেজে প্রথম ছাত্রদলের অন্যতম এবং ডিরোজিয়ান দলের নেতৃস্থানীয়। তাঁর বন্ধুদের নিয়ে ডিরোজিয়নদের গোষ্ঠীকে বলা হত চক্রবর্তী ফ্যাকশন। কর্মজীবনে প্রথমে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদে ভারততত্ত্ববিদ্ হোরেস হেম্যান উইলসনকে সাহায্য করেন। পরে ইংরেজ ব্যারিস্টারদের কেরানী, হেয়ার স্কুলের হেডমাস্টার ও

লার মুন্সেফ হন। ১৮৩৭ খ্রীঃ প্যারীচাঁদ ব্যবসা শুরু করেন। তাঁরাচাঁদ স্বাধীনচেতা ন, ফলে ইংরেজদের বিরাগভাজন হন। পরে নের রাজার অধীনে কর্ম করেন। ইংরেজি, ফারসী, হিন্দুস্থানী, সংস্কৃত ও আইন বিষয়ে র জ্ঞান ছিল। রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী, ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক এবং সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার স্থায়ী সভাপতি ছিলেন। ১৮২৭ খ্রীঃ ইংরেজি-বাংলা অভিধান রচনা তাঁর প্রধান কীর্তি। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণের সহযোগিতায় তিনি 'মনুসংহিতা'র সটীকা অনুবাদ চারখণ্ডে প্রকাশ করেন। "তত্ত্ব-কৌমুদী"

না

হরিশ্চন্দ্র দাস

খের সামনে হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল বুঝতে না সৌরেন। কেবল তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে াগলো। কিছুক্ষণ পরে ভীড় কমে যেতে তার া তাজা রক্তভেজা কিছুটা মাটি দেখে। পড়ন্ত জ্ঞতা নিয়ে ঘরে ফিরলো সৌরেন।

পাঁচটা বছর সাধ্যসাধনা করে জগমোহন তার ন্যে একটা চাকরী করে এনেছে। আজ হাতে য়োগপত্র পেয়েছে সে। অবসর নিতে তার বাকি হর, আরো দু-ছেলে আছে। তাদের জন্যে রতে হবে। সে সৌরেন করবে নিশ্চয়। তবু তার শেষ নেই। পর পর হবে সব। একটু াদ পাবে বৈ তো নয়। সাত-আটজনের সংসারের তে পারবে দুজন। তাছাড়া, এটাই যথেষ্ট। সৌরেনের পড়াশুনা কম। দুরন্ত, অনেক কিছুই ে করেছে। তবে জেল খাটে নি বা হাজতবাস করুণ দৃশ্যের দ্রষ্টা সে, নায়ক নয়। কে এক জন্যে দু-একবার সে ঘরছাড়া হয়েছে। কিন্তু অশ্রুজল তাকে ফিরিয়ে এনেছে। সৌরেন তাদের ছেলেদের দলপতি। রাত্রে খাওয়ার সময় তার দেখা যায়। এ রকম ছেলের চাকরী পাওয়া বহু ভাগ্যের এবং পাঁচটা বছরের সাধনায় হয়েছে। জগমোহন া ত্র নিয়ে ঘরে ফিরলো সন্ধ্যায়।

থমকে দাঁড়ালো সৌরেনকে আজ সন্ধ্যায় ঘরে দেখে। তবু আনন্দের খবরটা তাকে আগে দিতে হয় যে। একগাল হাসিভরা মুখে সৌরেনকে কাছে ডাকলো। সৌরেন নিরুত্তর। বার কয়েক ডাকলো জগমোহন, সৌরেন, তোমার চাকরী হয়েছে। পরশু তোমাকে কাজে যোগ দিতে হবে। একজোড়া জলভরা চোখ নিয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকলো সৌরেন। জগমোহন এর বিশেষ কোন গুরুত্ব না দিয়ে পোষাক না খুলেই বাজার করতে বেরিয়ে গেল। সামনে বাজার। আজ অনেক বাজার করতে হবে।

পেছনে পেছনে বেরিয়ে গেল সৌরেন। উত্তর দিয়ে গেল—না। চাকরী আমি..... কান্নায় ভেঙে পড়লো, বেশী কিছু বলতে পারে নি। জগমোহন এতটা খেয়াল করে নি। বন্ধু-বিচ্ছেদে সৌরেন এমন অনেকবার কেঁদেছে। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরলো জগমোহন। আনন্দের দিন, দু-তিনটা আইটেম আজ বেশী। কিন্তু সৌরেন?

রাত দশটায় সৌরেন বাড়ী ফিরলো, তেমনি নিস্তব্ধ এবং অশ্রু ভারাক্রান্ত। জগমোহন দু-একবার প্রশ্ন করেও কোন উত্তর পায় নি। অবশেষে আনন্দের খবরটা দিয়ে জগমোহন উত্তরের প্রতীক্ষায় ছিল। সৌরেন দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিল, সে চাকরী করবে না—না। জগমোহন বিস্মিত। ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে জগমোহন শক্ত বিছানায়। সৌরেন দেরী করেই যায়।

পরদিন সকাল সাতটা থেকে জগমোহনের ডিউটি, সাড়ে ছটায় বেরিয়ে গেল। অফিসে গিয়েই আঁৎকে উঠলো সে। দীনু! দীনুর রক্তাক্ত বিকৃত দেহটার দিকে তাকিয়ে থাকলো জগমোহন—গত সন্ধ্যায় তাকে কর্তব্যরত অবস্থায় দেখেছে সে, আজ .....নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না যেন।

জগমোহনের সং পুরানো বন্ধু দীনু। দুজনের বাসার মধ্যে ব্যবধান অনেকটা। কিন্তু অফিসে প্রত্যেকদিন সাক্ষাৎ এদের। সুখ-দুঃখের কত কথা হতো। দীনুর একমাত্র পাঁচ বছরের ছোট ছেলেটার মুখ ভেসে উঠলো জগমোহনের চোখের সামনে। ফিরে দেখতে পারলো না দীনুর লাশটা। মধ্যবয়সী, চোখে তার তখনো প্রত্যাশা। জগমোহনের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়লো কয়েক ফোঁটা জল, সৌরেনকে কী ভাবে খবরটা দেবে? সৌরেনের আদুরে কাকু দীনু।

ভর দুপুরে ভারাক্রান্ত মনটাকে নিয়ে বাড়ী ফিরলে জগমোহন। সৌরনের মতো সেও অশ্রুসিক্ত, নিস্তব্ধ। আনন্দের মধ্যে বিষাদের কালো মেঘ। দীনু আজ নেই। অথচ কত কথা তার মনে পড়ছে আজ। দীনুই জগমোহনের চাকরী করে দিয়েছে। সৌরেনের চাকরীটাও দীনুর দ্বারা হয়েছে। অথচ তাকে খবরটা দিতে পারলো না। ট্রাফিক পুলিশ হিসাবে অনেক কৃতিত্ব সে দেখিয়েছে। বড়বাবুদের একান্ত বিশ্বস্ত। আজ দেখলো তার মৃত্যু হিম রক্তাক্ত দেহটা অযত্ন অবস্থায় অপরিচ্ছন্ন জায়গায় পড়ে আছে। পরে সৎকার হবে। কেউ তাকে অভ্যর্থনা জানায় নি, ফুলের মালা কেউ দেয় নি। বিউগল্ বাজবে না। তোপধ্বনি নয়। বিধবা পত্নীর হাতে তাকে তুলে দেওয়া হবে সৎকারের জন্যে। অনেককে রক্ষা করেছে, আজ তাকে কেউ রক্ষা করতে এগিয়ে এলো না। জগমোহনের চাকরী জীবনের ওপর একটা বিতৃষ্ণা, ভয় এসে গেল। চাকরীর মোহ তার কেটে গেছে। কিন্তু নিঃসম্বল সংসারের এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তাই আজকের দিনের জীবনযাত্রা ও ট্রাফিক পুলিশের জীবনের নিরাপত্তার অভাবের কথা চিন্তা করতে করতে নিজেকে ফেললো এক অনিশ্চিত আশংকায়। তাকে মতো হতে হয়। তবু ভাবলো, বাঁচতে হ অবসরের পর কী হবে? অনেক হত্যাকাণ্ড তার চোখের সামনে। দেখেছে তাজা যৌবনে অবস্থা। সৌরেনের নিয়োগের কথা চিন্তা ক সব যেন গুলিয়ে গেল। ভাবী অজানা আশংক উঠলো সে। সেও পিতা.....

ঘিরে ফিরেছে সৌরেন। ফোলা ফোলা চোখ অবিশ্বাসের ছাপ। জগমোহন অতি সংকোচে, কণ্ঠে বললো, আগামীকাল তোমার চাকরীতে যে কথা। ট্রাফিক পুলিশের চাকরী। অন্তর তার উঠলো, তাকিয়ে থাকলো সৌরেনের দিকে, দীনুর তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো—রক্তাপ্লুত সৌরেন আবার বললে, কণ্ঠে তার কান্না, না ট্রাফিক পুলিশ?

—দীনু, তোমার কাকু—

—আমি তার জলজ্যান্ত সাক্ষী। আমার স বলছে কাকু, এমন সময় ছোরা বসালো তার পেটে। লুটিয়ে পড়লো তার শরীরটা, বলে উঠলো সোরে তারপর শেষ। জনতা দেখেই চলে যাচ্ছে, যেন তা জানে না। কাকুর সহকর্মীটা আত্মরক্ষার পালালো।—না কেঁদে উঠলো সৌরেন। জগ এরপর অন্য কোন জীবন নেই? পিতাকে জড়িয়ে সৌরেন।

পরদিন অফিসে জগমোহন সমস্ত পোষাক জমা বড়বাবুকে বললো—আমাকে বিদায় দেন, আর চা করবো না। না। চোখ দুটো ছল ছল করে উঠ দীনুর রক্ত সেখানে লেগে নেই তো?

—না? কেন?

—না। সকলকে প্রণাম করে বেরিয়ে গেল জগ পরের মাসের প্রথম সপ্তাহে যখন বেতনের টা ঠিকানায় গেল তখন দেখা গেল জগমোহনের নামে কোন লোক নেই।